আবু বক্কর সিদ্দিক (রাঃ) এর জীবনী

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية يؤدي إلى راحة البال

আবু বক্কর সিদ্দিক (রাঃ) এর জীবনী

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

আবু বক্কর সিদ্দিক (রাঃ) এর জীবনী

দ্বিতীয় সংস্করণ। মার্চ 17, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মহান সাহাবী, ইসলামের প্রথম সঠিকভাবে নির্দেশিত খলিফা, আবু বক্কর সিদ্দিক (রাঃ) এর জীবন থেকে কিছু পাঠ নিয়ে আলোচনা করে।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

আবু বক্কর সিদ্দিক (রাঃ) এর জীবনী

ইসলাম গ্রহণের আগে মক্কায় জীবন

একজন সৎ ব্যবসায়ী

প্রাক-ইসলামী যুগে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন সফল বণিক ছিলেন যিনি নিয়মিত ব্যবসায়িক সফরে বিদেশে যেতেন। ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার জন্য তার সুনাম ছিল। অন্যান্য বণিকরা তার সাথে ব্যবসা করতে আগ্রহী হবে কারণ সে কখনো কাউকে প্রতারণা করেনি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 43-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2146 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে বিচার দিবসে ব্যবসায়ীরা অনৈতিক লোক হিসাবে উত্থাপিত হবে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎ কাজ করে এবং কথা বলে। সত্য।

যারা ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশ নেয় তাদের জন্য এই হাদীসটি প্রযোজ্য। মহান আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের

শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত । ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের উচিত তাদের বক্তব্যে সৎ হওয়া উচিত যারা জড়িত তাদের কাছে লেনদেনের সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করে। সহীহ বুখারী, 2079 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, মুসলিমরা যখন আর্থিক লেনদেনে জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখে, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, এটি বরকতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

ধার্মিকভাবে কাজ করার মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে পণ্যের জন্য অত্যধিক অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা না করা। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে সেরকম আচরণ করা যেভাবে তারা অর্থপূর্ণ আচরণ করতে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশের সাথে। একইভাবে, একজন মুসলিম আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার করা পছন্দ করবে না তাদের অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়।

যারা ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সূক্ষ্ম চরিত্র

হযরত আবু বক্কর (রাঃ) মক্কাবাসীদের সর্বজনীনভাবে প্রিয় ছিলেন। অভিজাত ব্যক্তিরা তাকে ভালোবাসতেন কারণ তিনি এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যা আরবদের মধ্যে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছিল। তিনি খুব শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন বলে বিদ্বানরা তাকে ভালোবাসতেন। তিনি একজন ন্যায্য ও ন্যায়পরায়ণ ব্যবসায়ী হওয়ায় ব্যবসায়ীরা তাকে ভালোবাসতেন। দরিদ্ররা তাকে ভালবাসত কারণ তিনি তাদের প্রতি সর্বদা উদার ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 44-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তার চরিত্রের এই দিকটির মূল ছিল অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ

থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

বুদ্ধিমত্তা

প্রাক-ইসলামী যুগে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো মদ পান করেননি। সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন যে তিনি সর্বদা তার সম্মান রক্ষা করতে এবং তার পুরুষত্ব রক্ষা করতে চান এবং মদ পান এই দুটি জিনিসকে সরিয়ে দেয়। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, ৭-৮ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, একজন মুসলিমকে কখনই অ্যালকোহল সেবন করা উচিত নয় কারণ এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি।

দুর্ভাগ্যবশত, সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে এই মহাপাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়। এটি বেশ সুস্পষ্ট কারণ একজন মাতাল তাদের জিহ্বা এবং শারীরিক কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মদ্যপানের কারণে কতটা অপরাধ সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য একজনকে কেবল খবরটি দেখতে হবে। এমনকি যারা পরিমিত মদ্যপান করে তাদের শরীরের ক্ষতি হয়, যা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। অ্যালকোহলের সাথে জড়িত শারীরিক এবং মানসিক রোগগুলি অসংখ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং করদাতাদের উপর একটি ভারী বোঝা সৃষ্টি করে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি একজন ব্যক্তির তিনটি দিককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে যেমন তাদের শরীর, মন এবং আত্মা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

এই আয়াতে শিরকবাদের সাথে যুক্ত জিনিসগুলির পাশে মদ পান করার বিষয়টিকে এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে।

এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যে, সুনানে ইবনে মাজা, 3376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত মদ পান করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সুনানে ইবনে মাজা, ৬৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন প্রচার করা জান্নাত লাভের চাবিকাঠি। তবুও, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 1017 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস, মুসলিমদের পরামর্শ দেয় যে নিয়মিত মদ্যপান করে এমন কাউকে সালাম না করার জন্য। অ্যালকোহল

অ্যালকোহল একটি অনন্য বড় পাপ কারণ সুনানে ইবনে মাজা, 3380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটিকে দশটি ভিন্ন উপায়ে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যালকোহল নিজেই, যিনি এটি তৈরি করেন, যার জন্য এটি তৈরি করা হয়, যার জন্য যে এটি বিক্রি করে, যে এটি ক্রয় করে, যে এটি বহন করে, যার কাছে এটি বহন করা হয়, যে এটি বিক্রি করে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে, যে এটি পান করে এবং যে এটি ঢেলে দেয়। যে ব্যক্তি এইভাবে অভিশপ্ত কিছু নিয়ে

কাজ করে সে প্রকৃত সফলতা পাবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

নিরর্থক জিনিস এড়িয়ে চলা

প্রাক-ইসলামী যুগে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো কবিতা রচনা করেননি, যা সেই সময়ের আরবরা ব্যাপকভাবে করত। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৭-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিরর্থক কথা অপছন্দ করতেন এবং তাই কবিতা রচনা থেকে বিরত থাকতেন।

জামে আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

এর অর্থ হল যে ব্যক্তি অনর্থক বা মন্দ কথা থেকে চুপ থাকে এবং কেবল ভাল কথা বলে তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ রক্ষা করবেন। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রধান কারণ তাদের কথাবার্তা। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিচারের দিন একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয় যা জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, সংখ্যা 2314।

বক্তৃতা তিন প্রকার হতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথাবার্তা যা যেকোনো মূল্যে পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়টি হল অনর্থক বক্তৃতা যা শুধুমাত্র একজনের সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনার কারণ হবে। উপরন্তু, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রথম ধাপ প্রায়ই অসার বক্তৃতা. তাই এই ধরনের কথাবার্তা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। চূড়ান্ত প্রকারটি ভাল বক্তৃতা যা সর্বদা গ্রহণ করা উচিত। এই দিকগুলির উপর ভিত্তি করে একজনের জীবন থেকে কথার দুই তৃতীয়াংশ মুছে ফেলা উচিত।

উপরন্তু, যারা খুব বেশি কথা বলে সে কেবল তাদের কর্ম এবং পরকালের প্রতি একটু ভাববে কারণ এর জন্য নীরবতা প্রয়োজন। এটি একজনকে তাদের কাজের মূল্যায়ন থেকে বিরত রাখবে যা একজনকে আরও সৎ কাজ করতে এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে। এই ব্যক্তি তখন আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকবে।

পরিশেষে, যারা খুব বেশি কথা বলে তারা প্রায়শই পার্থিব বিষয় এবং বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা বিনোদন এবং মজাদার। এটি তাদের এমন একটি মানসিকতা অবলম্বন করবে যার ফলে তারা মৃত্যু এবং পরকালের মতো গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করা বা শুনতে অপছন্দ করে। এটি তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে যা একটি বড় অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

এই সব এড়ানো যেতে পারে যদি কেউ পাপপূর্ণ এবং নিরর্থক কথাবার্তা থেকে নীরব থাকে এবং পরিবর্তে কেবল ভাল কথা বলে। অতএব, যে এভাবে নীরব থাকবে সে দুনিয়াতে কষ্ট ও পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

অন্ধ অনুকরণ এড়িয়ে চলা

এমনকি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো মূর্তিকে সিজদা করেননি বা পূজা করেননি। এমনকি শৈশবে তিনি তার সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করেছিলেন যখন তাকে বলা হয়েছিল যে মক্কার মূর্তিগুলি তার ঈশ্বর। তিনি একবার প্রাণহীন মূর্তিদের অনুরোধ করেছিলেন তাকে খাবার ও বস্ত্র দেওয়ার জন্য। যখন তারা উত্তর দেয়নি তখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা নিজেদের জন্য কিছুই পেতে পারে না অন্য কাউকে কিছু দেওয়ার জন্য। এমনকি তিনি একবার একটি মূর্তির দিকে একটি পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং লক্ষ্য করেছিলেন যে এটি কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, অন্য কাউকে রক্ষা করতে পারে না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 45-46-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করেছিলেন এবং নিষ্প্রাণ মূর্তির উপাসনায় তাঁর চারপাশের লোকদের অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি।

একজনের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ একটি প্রধান কারণ কেন লোকেরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, যেমন বিচার দিবস। একজন ব্যক্তির উচিত তাদের সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগানো এবং প্রমাণ এবং স্পষ্ট লক্ষণের উপর ভিত্তি করে জীবনযাপনের পথ বেছে নেওয়া এবং গবাদি পশুর মতো অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা উচিত নয়। এই পদ্ধতিতে আচরণ বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের উচিত নয় অমুসলিমদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ ও গ্রহণ করা। মুসলমানরা যত বেশি এটি করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি অনুসরণ করবে। এই দিনে এবং যুগে এটি বেশ স্পষ্ট হয় কারণ অনেক মুসলমান অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করেছে যার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের দ্বারা কতগুলি অমুসলিম সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজনকে শুধুমাত্র আধুনিক মুসলিম বিবাহ পালন করতে হবে। যা এটিকে আরও খারাপ করে তোলে তা হল যে অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে ইসলামিক অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এ কারণে অমুসলিমরাও তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না যা ইসলামের জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, অনার কিলিং হল একটি সাংস্কৃতিক প্রথা যার ইসলামের সাথে এখনও কোন সম্পর্ক নেই কারণ মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং অমুসলিম সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করার অভ্যাসের কারণে সমাজে যখনই অনার কিলিং ঘটে তখনই ইসলামকে দায়ী করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে একত্রিত করার জন্য জাতি ও ভ্রাতৃত্বের আকারে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন তবুও অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক চর্চা অবলম্বন করে অজ্ঞ মুসলমানরা তাদের পুনরুত্থিত করেছে। সহজ কথায়, মুসলমানরা যত বেশি সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর আমল করবে।

ইসলামে অন্ধ অনুকরণও অপছন্দনীয়।

সুনানে ইবনে মাজায় পাওয়া একটি হাদিস, 4049 নম্বর, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন একজনের পরিবার, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ না করে যাতে কেউ অন্ধ অনুকরণকে ছাড়িয়ে যায় এবং মহান আল্লাহকে মান্য করে, যদিও সত্যই। তার

প্রভুত্ব এবং তাদের নিজস্ব দাসত্ব স্বীকৃতি. এটি আসলে মানবজাতির উদ্দেশ্য। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

কীভাবে একজন সত্যিকারের উপাসনা করতে পারে যাকে তারা চিনতে পারে না? শিশুদের জন্য অন্ধ অনুকরণ গ্রহণযোগ্য কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্যই জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সত্যিকার অর্থে অনুধাবন করে ধার্মিক পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অজ্ঞতাই কারণ যে মুসলমানরা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তারা এখনও মহান আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। এই স্বীকৃতি একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় নয়, সারা দিন আল্লাহর একজন প্রকৃত বান্দা হিসেবে আচরণ করতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমেই মুসলমানরা মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্ব পূর্ণ করবে। এবং এটি সেই অস্ত্র যা একজন মুসলিম তাদের জীবনের সমস্ত অসুবিধাকে জয় করে। যদি তাদের কাছে এটি না থাকে তবে তারা পুরস্কার অর্জন ছাড়াই অসুবিধার সম্মুখীন হবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল উভয় জগতেই আরও অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে। অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে পারে কিন্তু উভয় জগতে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এটি প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিরাপদে পথ দেখাবে না। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্ধ অনুকরণ একজনকে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে। এই মুসলিম কেবল অসুবিধার সময় তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের থেকে দূরে সরে যাবে বা বিপরীতে।

ইচ্ছাপূজা করা

এমনকি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো মূর্তিকে সিজদা করেননি বা পূজা করেননি। এমনকি শৈশবে তিনি তার সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করেছিলেন যখন তাকে বলা হয়েছিল যে মক্কার মূর্তিগুলি তার ঈশ্বর। তিনি একবার প্রাণহীন মূর্তিদের অনুরোধ করেছিলেন তাকে খাবার ও বস্ত্র দেওয়ার জন্য। যখন তারা উত্তর দেয়নি তখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা নিজেদের জন্য কিছুই পেতে পারে না অন্য কাউকে কিছু দেওয়ার জন্য। এমনকি তিনি একবার একটি মূর্তির দিকে একটি পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং লক্ষ্য করেছিলেন যে এটি কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, অন্য কাউকে রক্ষা করতে পারে না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 45-46-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সত্য হল যে মিথ্যা দেবতার প্রতিটি উপাসক কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার পূজা করে। তাদের দেবতারা তাদের আকাঙ্ক্ষার একটি শারীরিক প্রকাশ মাত্র যা তারা পূজা করে। এটা স্পষ্ট যে একজন ব্যক্তি যে মূর্তির আকারে একটি দেবতার পূজা করে সে জানে যে নিষ্প্রাণ মূর্তি তাদের জীবনকে নির্দিষ্টভাবে বাঁচতে নির্দেশ দিতে পারে না তাই উপাসক নিজেই সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা কীভাবে তাদের নিষ্প্রাণ মূর্তিটি তাদের জীবনযাপন করতে চায় তা কল্পনা করে। এবং এই আচরণবিধি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তাদের কামনা বাসনার উপাসনাই তাদের ইবাদতের মূল। প্রভাবশালী এবং ধনী ব্যক্তিরা এই মানসিকতায় আরও নিমজ্জিত হয় কারণ তারা সচেতন যে সত্য অর্থ ইসলাম গ্রহণ করা তাদের একটি নির্দিষ্ট আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করতে বাধ্য করবে যা তাদের বিপথগামী ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে বাধা দেবে। তারা অন্যদের তাদের অনুসরণ করার পরামর্শ দেয় কারণ তারা তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব হারাতে চায় না। এ কারণেই ইতিহাসে দেখা যায় তারাই সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা করেছিল।

আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তার ইচ্ছার পূজা অর্থ, মূর্তি পূজা প্রত্যাখ্যান এবং পরিবর্তে নিজেকে একটি উচ্চ নৈতিক মান অধিষ্ঠিত.

প্রথমত, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রধান জিনিস যা একজন মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে তা হল মানুষ একটি উচ্চতর নৈতিক নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করে। যদি মানুষ এটা পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে তবে তাদের এবং পশুদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে, লোকেরা আরও খারাপ হবে কারণ তারা এখনও উচ্চ স্তরের চিন্তাভাবনার অধিকারী, তবুও পশুদের মতো জীবনযাপন করা বেছে নেয়।

দ্বিতীয়ত, মানুষ বাস্তবে স্বীকার করুক বা না করুক, প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো না কোনো ব্যক্তির সেবক। কেউ কেউ অন্যের সেবক, যেমন হলিউড এক্সিকিউটিভ এবং তারা যা করতে আদেশ করেন তা করেন এমনকি যদি তা শালীনতা এবং লজ্জাকে চ্যালেঞ্জ করে। অন্যরা তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের দাস এবং তাদের খুশি করার জন্য যা যা লাগে তাই করে। অন্যরা তাদের নিজের ইচ্ছার দাস হয়ে আরও খারাপ কারণ এটি এমন প্রাণীদের মনোভাব যারা সাধারণত নিজেকে খুশি করার জন্য কাজ করে। দাসত্বের সর্বোত্তম ও সর্বোত্তম রূপ হচ্ছে মহান আল্লাহর বান্দা হওয়া। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মহান আল্লাহর বান্দা ছিলেন, যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সম্মান ও সম্মান দেওয়া হয়েছিল এবং থাকবে। পরের এই মঞ্জুর. শতাব্দী এবং সহস্রাব্দ পেরিয়ে গেছে তবুও তাদের নাম ইতিহাসের স্তম্ভ এবং আলোকবর্তিকা হিসাবে স্মরণ করা হয়। পক্ষান্তরে যারা বিশেষ করে অন্যের সেবক হয়েছিলেন, তাদের নিজেদের কামনা-বাসনা কিছু পার্থিব মর্যাদা অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হয়েছিল এবং তারা ইতিহাসের পাদটীকাতে পরিণত হয়েছিল।

মিডিয়া খুব কমই তাদের মনে রাখে যারা রিপোর্ট করার জন্য পরবর্তী ব্যক্তির দিকে যাওয়ার আগে কয়েক দিনের বেশি সময় ধরে চলে যায়। তাদের জীবনকালে এই লোকেরা অবশেষে দু: খিত, একাকী, হতাশাগ্রস্ত এবং এমনকি আত্মঘাতী হয়ে ওঠে কারণ তাদের আত্মা এবং শালীনতা তাদের পার্থিব প্রভুদের কাছে বিক্রি করে তাদের তৃপ্তি দেয়নি যা তারা খুঁজছিল । এই সুস্পষ্ট সত্যটি বুঝতে পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং মানুষকে যদি বান্দা হতেই হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর বান্দা হওয়া, কেননা স্থায়ী সম্মান, মহানুভবতা ও প্রকৃত সাফল্য কেবল এতেই নিহিত।

নিপীড়ন এড়ানো

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ পোষণ করতেন এবং প্রায়শই বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করতেন। তার আগ্রহ সত্য এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অন্বেষণ করার একটি অকৃত্রিম ইচ্ছা দেখিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার নবুওয়াতের ধারণা সম্পর্কে তাওরাত ও বাইবেলের বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনে নওফালের সাথে আলোচনা করেছিলেন। ওয়ারাকাহ তাকে বলেছিলেন যে একজন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে যা অহী করা হয় তা বলেন। সে অত্যাচার করে না, অন্যকে যুলুম করতে সাহায্য করে না এবং অত্যাচার সহ্য করে না। এই গবেষণার একটি কারণ ছিল যে তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতকে সহজে গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 49-50-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যেমন উপরে বর্ণিত একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি একজন মুসলমানেরও উচিৎ, যেমন নিপীড়ন উভয় জগতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

সহীহ বুখারী, 2447 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে বিচারের দিন জুলুম অন্ধকার হয়ে যাবে।

এটা এড়ানো অত্যাবশ্যক কারণ যারা নিজেদেরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে তাদের পরমদেশে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। শুধুমাত্র যারা একটি গাইড আলো প্রদান করা হবে সফলভাবে এটি করতে সক্ষম হবে.

নিপীড়ন অনেক রূপ নিতে পারে। প্রথম প্রকার হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যর্থ হয় এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে। যদিও এটি মহান আল্লাহর অসীম মর্যাদার উপর কোন প্রভাব ফেলে না, তবুও এটি ব্যক্তিকে উভয় জগতেই অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4244 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখনই কেউ পাপ করে তখন তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারা যত বেশি পাপ করবে ততই তাদের হৃদয় অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। এটি তাদের এই পৃথিবীতে সত্য নির্দেশনা গ্রহণ ও অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখবে যা শেষ পর্যন্ত পরবর্তী জগতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 14:

"না! বরং দাগ তাদের অন্তরকে ঢেকে দিয়েছে যা তারা উপার্জন করছিল।"

পরবর্তী প্রকারের নিপীড়ন হল যখন কেউ তাদের দেহ ও অন্যান্য পার্থিব নেয়ামতের আকারে মহান আল্লাহ প্রদত্ত আমানত পূরণ না করে নিজেদের উপর জুলুম করে। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের বিশ্বাস। ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এটিকে অবশ্যই সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করতে হবে।

নিপীড়নের চূড়ান্ত ধরন হল যখন একজন অন্যের সাথে দুর্ব্যবহার করে। অত্যাচারীর শিকার প্রথমে ক্ষমা না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ এই পাপগুলো

ক্ষমা করবেন না। মানুষ অতটা দয়ালু না হওয়ায় এটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। অতঃপর বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে অত্যাচারীর সৎকাজ তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপের শাস্তি অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তাই অন্যদের সাথে সেরকম আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ। একজন মুসলমানের উচিত সকল প্রকার নিপীড়ন পরিহার করা যদি তারা ইহকাল ও পরকালে পথপ্রদর্শক আলো চায়।

সত্যের সন্ধান

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ পোষণ করতেন এবং প্রায়শই বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করতেন। তার আগ্রহ সত্য এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অন্বেষণ করার একটি অকৃত্রিম ইচ্ছা দেখিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার নবুওয়াতের ধারণা সম্পর্কে তাওরাত ও বাইবেলের বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনে নওফালের সাথে আলোচনা করেছিলেন। ওয়ারাকাহ তাকে বলেছিলেন যে একজন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে যা অহী করা হয় তা বলেন। সে অত্যাচার করে না, অন্যকে যুলুম করতে সাহায্য করে না এবং অত্যাচার সহ্য করে না। এই গবেষণার একটি কারণ ছিল যে তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতকে সহজে গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 49-50-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই আবু বক্করের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সক্রিয়ভাবে জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করার মাধ্যমে এটি ঈমানের নিশ্চিততার দিকে পরিচালিত করে, ঠিক যেমন আবু বক্কর রা. মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহ্বানে অনায়াসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সকল মুসলমানেরই ইসলামে বিশ্বাস আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের শক্তি ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে কারণ তাদের পরিবার তাদের বলেছিল যে তারা প্রমাণের মাধ্যমে এটিকে বিশ্বাস করে তার মতো নয়। যে ব্যক্তি কোন কিছুর কথা শুনেছে সে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না যেভাবে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এর একটি কারণ হল একজন মুসলমান ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে এটাই সর্বোত্তম উপায়। এটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততা যত বেশি শক্তিশালী তারা সঠিক পথে অবিচল থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, বিশেষত যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয়। উপরন্তু, সুনানে ইবনে মাজা, 3849 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন একটি সর্বোত্তম জিনিস হিসাবে বিশ্বাসের নিশ্চিত হওয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্ঞানটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শুধু একটি সত্য ঘোষণা করেননি বরং উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রমাণও দিয়েছেন। অতীতের জাতির মধ্যে যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায় তা নয়, উদাহরণগুলি যা নিজের জীবনে স্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো একজন ব্যক্তি কোনো জিনিসকে ভালোবাসে যদিও তা পেয়ে গেলে তাকে কষ্ট দেয়। একইভাবে, তারা একটি জিনিস ঘৃণা করতে পারে যখন তাদের জন্য অনেক ভাল লুকিয়ে আছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ইতিহাসে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে যেমন হুদাইবার চুক্তি। কিছু মুসলিম বিশ্বাস করেছিল যে এই চুক্তিটি, যা মক্কার অমুসলিমদের সাথে করা হয়েছিল, সম্পূর্ণভাবে পরবর্তী গোষ্ঠীর পক্ষে হবে। তবুও, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষপাতী ছিল। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, 2731 এবং 2732 নম্বরে পাওয়া হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ যদি তাদের নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা অনেক উদাহরণ পাবে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি তাদের জন্য খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে। এই উদাহরণগুলি এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা (বিচার দিবস) দেখবে যেদিন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে কিভাবে বড় বড় সাম্রাজ্য এসেছে এবং গেছে। কিন্তু যখন তারা চলে গেল তখন এমনভাবে চলে গেল যেন তারা ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতেই ছিল। তাদের কয়েকটি চিহ্ন বাদে সবগুলি এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে যেন তারা পৃথিবীতে প্রথম স্থানে ছিল না। একইভাবে, যখন কেউ তাদের নিজের জীবনের প্রতি চিন্তাভাবনা করে তখন তারা বুঝতে পারে যে তারা যতই বয়সী হোক না কেন এবং নির্দিষ্ট কিছু দিন যতই ধীরগতির মনে হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন এখন পর্যন্ত ঝাঁকুনিতে কেটে গেছে। এই আয়াতের সত্যতা বোঝা একজনের বিশ্বাসের

নিশ্চিততাকে শক্তিশালী করে এবং এটি তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এ ধরনের উদাহরণে পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে এই খোদায়ী শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবং জান্নাতের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া পথে অবিচল থাকবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

সত্যকে গ্রহণ করা

এটা সর্বজনবিদিত যে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, বিনা দ্বিধায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে অন্য সকল পুরুষ দ্বিধায় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা দেখিয়েছিলেন। এটি ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 51-এ আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারি, 3661 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তিনি সত্যকে সহজে গ্রহণ করার একটি কারণ হল তিনি একজন সত্যবাদী ছিলেন। অর্থ, ইসলামের পূর্বে তিনি সত্যবাদিতার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন এবং গ্রহণ করেছিলেন। তাই ইসলামের সত্যতা যখন তাঁর সামনে পেশ করা হল, তখন তিনি বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করলেন।

মুসলমানদের অবশ্যই তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা অবলম্বন করে তাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করতে হবে।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। অধিকাংশ মৌখিক পাপ সংঘটিত হয় কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

ভালো সাহচর্য

এটা সর্বজনবিদিত যে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, বিনা দ্বিধায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে অন্য সকল পুরুষ দ্বিধায় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা দেখিয়েছিলেন। এটি ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 51-এ আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারি, 3661 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামের সত্যকে সহজে গ্রহণ করার অন্যতম কারণ হল, তিনি ইতিমধ্যেই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে গভীর বন্ধুত্বের বন্ধন রেখেছিলেন। অতএব, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের দাওয়াতের পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্রুটিহীন চরিত্র সম্পর্কে জানার মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যদিও, মক্কার অমুসলিমরা একই জিনিস পালন করেছিল তবুও তারা একগুঁয়েভাবে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাঁর সমগ্র জীবন মক্কার অমুসলিমদের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন তা তাঁর নবুওয়াত ঘোষণার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন মক্কার অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তখন তিনি সত্য কথা বলার প্রমাণ হিসেবে তাদের মধ্যে তাঁর ৪০ বছর ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি অমুসলিমদের দ্বারাও এই প্রমাণ অনস্বীকার্য ছিল। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, 4553 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে। শুধুমাত্র কিছু লোকের অহংকারই তাদেরকে সত্যের প্রতি আনুগত্য করতে বাধা দেয়। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 16:

"...কারণ এর আগে আমি সারাজীবন তোমাদের মাঝে ছিলাম। তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ভালো সাহচর্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারী, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভাল এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উত্তম সঙ্গী হল সেই ব্যক্তির মত যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তাদের সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি প্রাপ্ত হবে বা অন্তত মনোরম গন্ধ দ্বারা প্রভাবিত হবে. অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী একজন কামারের মতো, যদি তাদের সঙ্গী তাদের কাপড় না পোড়ায় তবে তারা অবশ্যই ধোঁয়ায় আক্রান্ত হবে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যে লোকেদের সাথে থাকবে তাদের উপর প্রভাব পড়বে তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম। কাউকে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয় এবং এর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর ধর্মে রয়েছে। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। তাই মুসলমানদের জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সঙ্গী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের একটি ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করবে যার অর্থ, তারা তাদের মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করবে। অন্যদিকে, খারাপ সঙ্গীরা হয় কাউকে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, অথবা তারা একজন মুসলিমকে পরকালের জন্য প্রস্তুতির

জন্য বস্তুগত জগতে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করবে। এই মনোভাব বিচারের দিনে তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হয়ে উঠবে যদিও তারা যে জিনিসগুলির জন্য চেষ্টা করে তা বৈধ কিন্তু তাদের প্রয়োজনের বাইরে।

পরিশেষে, সহীহ বুখারি, 3688 নং হাদিস অনুসারে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথে শেষ হবে, একজন মুসলিমকে বাস্তবিকভাবে দেখাতে হবে যে তারা ধার্মিকদের প্রতি ভালবাসা এই পৃথিবীতে তাদের সাথে নিয়ে। কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফেল লোকদের সঙ্গ দেয় তবে তা প্রমাণ করে এবং ইঙ্গিত করে যে তারা তাদের প্রতি ভালবাসা এবং পরকালে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় জীবন

অন্যদেরকে বিশ্বাসের পথে পরিচালিত করা

ইসলাম গ্রহণের পর আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্যের দিকে অন্যদের দাওয়াত দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। এই লোকেরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশিষ্ট ও জ্যেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরামে পরিণত হন। এই ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে: আয জুবায়ের ইবনে আল আওয়াম, উসমান ইবনে আফফান, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং আরও অনেকে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 55-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু যেভাবে এই মহান কাজটি অর্জন করেছিলেন তার মধ্যে একটি হল উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া। অন্যরা যখন তার চরিত্র ও কর্মে ইসলামের নিদর্শন দেখতে পেল, কেবল তার জিহ্বায় নয়, তখন তা তাদের সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল।

সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তারা অন্যদেরকে যা পরামর্শ দেয় তার উপর আমল করা। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা তাদের প্রচারের উপর কাজ করেছিল তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব

দেয়নি। সর্বোত্তম উদাহরণ হ'ল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি কেবল যা প্রচার করেছিলেন তা অনুশীলন করেননি বরং সেই শিক্ষাগুলি অন্য কারও চেয়ে কঠোরভাবে মেনে চলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের সাথে মুসলমানদের বিশেষ করে, পিতামাতারা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করে কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে মিথ্যা বলে তার সন্তানরা তার পরামর্শে কাজ করার সম্ভাবনা কম। একজন ব্যক্তির কর্ম সবসময় তার বক্তব্যের চেয়ে অন্যদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তবে সে নিজেই তার উপর আমল করে। কঠিন শাস্তি জাহান্নামে. অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশের উপর নিজে আমল করার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক এবং অন্যদেরকেও তা করার পরামর্শ দেওয়া। দৃষ্টান্ত দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া হল সমস্ত নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য, এবং অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

ইসলামের সর্বজনীন আহ্বান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরাম যখন তাদের উপর সন্তুষ্ট, তখন আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংখ্যা প্রায় ৩৮ জন হয়ে গেল, তখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যদেরকে খোলাখুলিভাবে ঘোষণা ও দাওয়াত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। . যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহর গৃহ, কাবা ও হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চারপাশের পবিত্র এলাকায় প্রবেশ করলেন। তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, উঠলেন এবং মসজিদের আশেপাশে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলকে সম্বোধন করলেন যখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি খোলাখুলিভাবে মানুষকে মহান আল্লাহ ও তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ করার দিকে আহ্বান করেছিলেন। মক্কার অমুসলিমরা যখন তাঁর ডাক শুনেছিল তখন তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মসজিদে তাদের এবং সাহাবীদের মধ্যে সহিংস লড়াই শুরু হয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু গুরুতর আহত হন। তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি জ্ঞান ফিরে পান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এই ঘটনাটি ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 319-320 এ আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলমান সর্বদাই হয় স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা অসুবিধার সময় মোকাবেলা করে। কিছু অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে কেউই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও সংজ্ঞা অনুসারে অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবে তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য ও দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ

জীবনের পাঠ শিখে। এবং লোকেরা প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে অসুবিধার সময়গুলি অনুভব করার পরে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল এটির প্রতি চিন্তা করা দরকার । প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে আলোচনা করা বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধা জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সত্যিকারের মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করার মধ্যে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। এটা এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। তাই একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এই মুহূর্তগুলি তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতে চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরাম যখন তাদের উপর সন্তুষ্ট, তখন আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংখ্যা প্রায় ৩৮ জন হয়ে গেল, তখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যদেরকে খোলাখুলিভাবে ঘোষণা ও দাওয়াত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। . যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহর গৃহ, কাবা ও হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চারপাশের পবিত্র এলাকায় প্রবেশ করলেন। তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, উঠলেন এবং মসজিদের আশেপাশে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলকে সম্বোধন করলেন যখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি খোলাখুলিভাবে মানুষকে মহান আল্লাহ ও তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ করার দিকে আহ্বান করেছিলেন। মক্কার অমুসলিমরা যখন তাঁর ডাক শুনেছিল তখন তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মসজিদে তাদের এবং সাহাবীদের মধ্যে সহিংস লড়াই শুরু হয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু গুরুতর আহত হন। তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি জ্ঞান ফিরে পান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু না খেয়ে, পান বা বিশ্রাম করেননি যতক্ষণ না তিনি দেখতে পান যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 56-59-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছিলেন, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রতি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা বজায় রেখেছিলেন।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"... আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

" বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

সাহসিকতা

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার মন্তব্য করেছিলেন যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী। বদর যুদ্ধের সময় তিনি প্রতিটি আক্রমণ থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে ছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন। আরেকটি অনুষ্ঠানে, মদিনায় হিজরতের পূর্বে, মক্কার অমুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করেছিল এবং এটি ছিল আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি তাকে একটি আঘাত করে রক্ষা করেছিলেন। তাদের মধ্যে, অন্য একটি সংযত এবং অন্য নিচে নিক্ষেপ. এটি ইমাম সুয়ূতী, তারিখ আল খুলাফা, 13 পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ছিলেন কারণ তিনি দুর্বলতা ছাড়াই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল ছিলেন।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ

রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এই বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"...সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহর অবিচল আনুগত্যে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের

মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

দুর্বলদের সাহায্য করা

যখন সামাজিকভাবে দুর্বল সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মক্কার অমুসলিমদের দ্বারা সহিংসভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষ ও নারী ক্রীতদাসদের ক্রয় ও মুক্ত করে তাদের সহায়তা করেছিলেন। , যেমন বিলাল, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হতে পারে. সহীহ বুখারি, 3754 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি তাঁর ধার্মিক কাজের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল। অধ্যায় 92 আল লায়ল, আয়াত 5-7:

"যে ব্যক্তি দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে। এবং সর্বোত্তম [পুরস্কারে] বিশ্বাস করে। আমরা তাকে স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সহজ করে দেব।"

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 357-358-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করে, মহান আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন তাদের থেকে একটি কষ্ট দূর করবেন।

এটি দেখায় যে একজন মুসলমানের সাথে মহান আল্লাহ তায়ালা সেইভাবে আচরণ করেন যেভাবে তারা আচরণ করে। ইসলামের শিক্ষার মধ্যে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 152:

"সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব..."

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত লাভ করবে।

একটি দুর্দশা এমন কিছু যা কাউকে উদ্বেগ এবং অসুবিধার মধ্যে ফেলে দেয়। অতএব, যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পার্থিব বা ধার্মিক যা-ই হোক না কেন অন্যের জন্য এ ধরনের কষ্ট লাঘব করেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তায়ালা বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। অনেক হাদিসে বিভিন্নভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, জামে আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি একজন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাতের ফল খাওয়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানীয় পান করাবে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে পান করাবেন।

যেহেতু আখেরাতের কষ্টগুলো দুনিয়ার তুলনায় অনেক বেশি, এই পুরস্কার একজন মুসলমানের জন্য আটকে থাকে যতক্ষণ না তারা পরকালে পৌঁছায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মহান আল্লাহ একজন মুসলমানকে ততক্ষণ সাহায্য করতে থাকবেন যতক্ষণ তারা অন্যকে সাহায্য করছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে যখন তারা কোনো কিছুর জন্য চেষ্টা করে বা কোনো বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি সাহায্য করে তখন ফলাফল সফল হতে পারে বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ যখন কাউকে সাহায্য করেন তখন তার সফল পরিণতি নিশ্চিত হয়। তাই, মুসলমানদের উচিত নিজেদের স্বার্থে, অন্যদেরকে সকল ভালো কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করা যাতে তারা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর সাহায্য পায়।

উপরন্তু, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধরনের দাসত্ব রয়েছে যেখানে মুসলমানদের তাদের সাহায্য করা উচিত, যেমন ঋণের মাধ্যমে আর্থিক দাসত্ব। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে সাহায্য করা বা একজন মুসলমান যখন অন্যের কাছ থেকে ঋণ পাওনা থাকে তখন বিষয়গুলো সহজ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ঋণ ঢেলে দেয়, মহান আল্লাহ তায়ালা উভয় জগতেই তাকে ক্ষমা করবেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আন্তরিকতা

যখন সামাজিকভাবে দুর্বল সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মক্কার অমুসলিমদের দ্বারা সহিংসভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষ ও নারী ক্রীতদাসদের ক্রয় ও মুক্ত করে তাদের সহায়তা করেছিলেন। , যেমন বিলাল, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হতে পারে. যখন তাকে তার পিতার পরামর্শে শক্তিশালী ক্রীতদাস ক্রয় এবং মুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যারা তাকে তার পক্ষে সমর্থন করতে পারে, তখন আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ক্রয় এবং মুক্ত করছেন। একটি গোপন উদ্দেশ্য জন্য না. পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তার সৎকর্মের কারণে অবতীর্ণ হয়। অধ্যায় 92 আল লায়ল, আয়াত 5-7:

"যে ব্যক্তি দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে। এবং সর্বোত্তম [পুরস্কারে] বিশ্বাস করে। আমরা তাকে স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সহজ করে দেব।"

ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬৯-৭০ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই ভালো কাজ করার সময় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক থাকার মাধ্যমে আবু বক্কর রা.-এর অনুকরণ করতে হবে।

জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে লোক দেখানোর মতো কাজ করে। , মহিমান্বিত, কেয়ামতের দিন তাদের পুরষ্কার লাভের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য তারা কাজ করেছে যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কাজের ভিত্তি এমনকি ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। সহীহ বুখারীর ১ নম্বর হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিচার করেন। একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা সকল ধর্মীয় ও উপকারী পার্থিব কর্ম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পালন করে, যাতে তারা উভয় জগতে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করুন। এই সঠিক মানসিকতার একটি চিহ্ন হল যে এই ব্যক্তিটি তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আশা করে না বা চায় না। যদি কেউ এটি কামনা করে তবে এটি তাদের ভুল উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

উপরন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা দুঃখ এবং তিক্ততাকে প্রতিরোধ করে কারণ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের বিরক্ত এবং তিক্ত করে তুলবে কারণ তারা মনে করে যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন, তিনি তাদের সন্তানদের মতো অন্যদের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে কখনই তিক্ত বা ক্রোধান্বিত হবেন না। এই মনোভাব মানসিক প্রশান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে নিয়ে যায় কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের সৎ কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। এইভাবে সমস্ত মুসলমানদের কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে পড়ে থাকতে পারে।

দরিদ্রদের সহায়তা করা

সামাজিকভাবে দুর্বল সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মক্কার অমুসলিমদের সহিংসতা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কয়েকজনকে ইথিওপিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাদের রাজা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং তারা সেখানে নিপীড়নের সম্মুখীন হবে না। অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পরিবার-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুও হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন যাতে তিনি শান্তিতে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন। যখন তিনি মক্কা থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছেন তখন তিনি মক্কার একজন অমুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইবনে আদ দাগিনার সাথে দেখা করেন। দুজন কথা বললে ইবনে আদ দাঘিনা মন্তব্য করেছিলেন যে তার মতো একজন ভাল ব্যক্তিকে তার জন্মভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা উচিত নয়। ইবনে আদ দাগিনা আবু বক্কর (রা.)-এর কিছু মহৎ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: অভাবী ও দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য তার আগ্রহ। সহীহ বুখারী, ৩৯০৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, মহান আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন না যে অন্যের প্রতি দয়া করে না।

ইসলাম একটি অতি সরল ধর্ম। এর একটি মৌলিক শিক্ষা এতই সহজ যে, এমনকি অশিক্ষিত লোকেরাও সেগুলি বুঝতে এবং তার উপর আমল করতে পারে, অর্থাৎ মানুষ অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করবে তা হল মহান আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, যারা অন্যের ভুল

উপেক্ষা করতে এবং ক্ষমা করতে শেখে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

যারা অন্যদেরকে উপকারী পার্থিব এবং ধর্মীয় বিষয়ে যেমন মানসিক বা আর্থিক সাহায্যে সমর্থন করে, তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহ সমর্থন করবেন। সুনান আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করবেন।

সোজা কথায়, কেউ যদি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে সদয় ও সম্মানের সাথে আচরণ করে তবে মহান আল্লাহ তাদের সাথে একই আচরণ করবেন। এবং যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাদের সাথে মহান আল্লাহ অনুরূপ আচরণ করবেন, এমনকি যদি তারা ফরয নামাযের মতো বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে। এর কারণ হল একজন মুসলিমকে সফলতা অর্জনের জন্য উভয় দায়িত্বই পালন করতে হবে যথা, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা সদয় আচরণ করবেন, যদি তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেন। যদি তারা অন্য কোন কারণে তা করে তবে তারা নিঃসন্দেহে এই শিক্ষাগুলিতে বর্ণিত সওয়াব হারাবে। সকল কর্মের ভিত্তি এবং

ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৪৭-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আবদ্ধ যে বন্ধন

সামাজিকভাবে দুর্বল সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মক্কার অমুসলিমদের সহিংসতা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কয়েকজনকে ইথিওপিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাদের রাজা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং তারা সেখানে নিপীড়নের সম্মুখীন হবে না। অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পরিবার-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুও হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন যাতে তিনি শান্তিতে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন। যখন তিনি মক্কা থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছেন তখন তিনি মক্কার একজন অমুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইবনে আদ দাগিনার সাথে দেখা করেন। দুজন কথা বললে ইবনে আদ দাঘিনা মন্তব্য করেছিলেন যে তার মতো একজন ভাল ব্যক্তিকে তার জন্মভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা উচিত নয়। ইবনে আদ দাগিনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কিছু মহৎ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা। সহীহ বুখারী, ৩৯০৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ইসলামের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক যা সফলতা চাইলে পরিত্যাগ করা যায় না। উভয় জগতে। কারো ঈমানের প্রকৃত নিদর্শন হল সারাদিন মসজিদে মহান আল্লাহর ইবাদত করে কাটানো নয় বরং তা হলো মহান আল্লাহর হক আদায় করা এবং সৃষ্টির হক আদায় করা। সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। ইসলামের পোশাক পরে কেউ ধার্মিকতার জাহির করতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারে না। যখন একজন মোড় নেয় ইতিহাসের পাতায় তারা সর্বদা লক্ষ্য করবে যে, মহান আল্লাহর ধার্মিক বান্দাগণ তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

এমনকি যখন তাদের আত্মীয়রা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল তখনও তারা সদয় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

"এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।"

সহীহ মুসলিম, 6525 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সর্বদা তাকে সাহায্য করবেন যে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করে এমনকি যদি তাদের আত্মীয়রা কিছু কঠিন করে দেয়। তাদের জন্য।

ভালোর জবাব ভালো দিয়ে দেওয়া বিশেষ কিছু নয়, যেখানে ভালোকে মন্দের জবাব দেওয়াই একজন আন্তরিক বিশ্বাসীর লক্ষণ। প্রাক্তন আচরণ এমনকি প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, যখন কেউ একটি প্রাণীর সাথে সদয় আচরণ করে তখন এটি আবার স্নেহ প্রদর্শন করবে। সহীহ বুখারী, 5991 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি যে আত্মীয়স্বজন ছিন্ন করলেও সম্পর্ক বজায় রাখে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত ছিলেন তার আত্মীয়দের অধিকাংশ দ্বারা কিন্তু তিনি সবসময় তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন.

এটা সাধারণভাবে জানা যায় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য ছাড়া কেউ সফলতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু সহীহ বুখারীর ৫৯৮৭ নম্বর হাদিসে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক

ছিন্ন করবে তিনি তার সাথে বন্ধন ছিন্ন করবেন। মনে রাখবেন, এটি নির্বিশেষে সত্য ফরজ নামাজের মতো ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর হক আদায়ের জন্য কতটা সংগ্রাম করে। মহান আল্লাহ যদি একজন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তাহলে তারা কিভাবে তার নৈকট্য ও চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করবে?

উপরন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ শাস্তি বিলম্বিত করেন মানুষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য পাপের অনুতাপ করা। কিন্তু পার্থিব কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হয়। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4212 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, আজ বিশ্বে সম্পর্ক ছিন্ন করা সাধারণত দেখা যায়। তুচ্ছ পার্থিব কারণে মানুষ সহজেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। তারা যে কোন ক্ষতি চিনতে ব্যর্থ বস্তুজগতে যা ঘটে তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহ তায়ালা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে উভয় জগতেই তারা দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার একটি কারণ যা সাধারণত ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যখন কেউ তাদের পেশার মাধ্যমে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় পৌঁছায়। এটি তাদের আত্মীয়দের পরিত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করে যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের সাথে আর যোগাযোগ করার যোগ্য নয়। তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি তাদের ভালবাসা তাদের বিভ্রান্তির দরজায় ঠেলে দেয় যা তাদের বিশ্বাস করে যে তাদের আত্মীয়রা তাদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ কেড়ে নিতে চায়।

পবিত্র কুরআন ইঙ্গিত করে যে এই বন্ধনগুলি কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 1:

“…আর আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরকে এবং গর্ভকে চাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বদাই তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।"

এই আয়াতটিও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় না রেখে তাকওয়া অর্জন করা যায় না। তাই যারা ঈমান এনেছে অতিরিক্ত ইবাদতের মাধ্যমে তারা তা অর্জন করতে পারে এবং উপবাস ভুল প্রমাণিত হয় এবং তাই তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে হবে।

ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করার মাধ্যমে সব ধরনের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে শেখায় যেগুলো যখনই এবং যেখানেই সম্ভব ভালো। তাদের একটি গঠনমূলক মানসিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা সমাজের স্বার্থে আত্মীয়দের একত্রিত করে না একটি ধ্বংসাত্মক মানসিকতা যা শুধুমাত্র পরিবারের মধ্যে বিভাজন ঘটায়। সুনানে আবু দাউদ, 4919 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ব্যক্তিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাদেরকে পবিত্র কোরআনে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 22-23:

“সুতরাং, যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করবে? [যারা তা করে] তারাই যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন..."

এই দুনিয়াতে বা পরকালে কেউ কিভাবে তাদের বৈধ ইচ্ছা পূরণ করতে পারে যখন তারা মহান আল্লাহর অভিশাপে পরিবেষ্টিত এবং তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত?

তাদের আত্মীয়স্বজনদের সমর্থনে তাদের সাধ্যের বাইরে যাওয়ার আদেশ দেয় না এবং তাদের আত্মীয়দের জন্য মহান আল্লাহর সীমাকে ত্যাগ করতে বলে না কারণ এর অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা। এটি সুনান আবু দাউদ, 2625 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, কেউ কখনই তাদের আত্মীয়দের সাথে খারাপ কাজের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে একজন মুসলমানের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সৎকাজের আদেশ দিন এবং তাদের প্রতি সম্মান বজায় রেখে মন্দ কাজ থেকে মৃদুভাবে নিষেধ করুন। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

" এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অগণিত সুবিধা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী দ্বারা প্রাপ্ত হয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি সম্পর্ক বজায় রাখে সে তাদের রিযিকে এবং তাদের জীবনে অতিরিক্ত অনুগ্রহে ধন্য হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1693 নম্বরে পাওয়া

একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল তাদের রিযিক যত কমই হোক না কেন তাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এটি তাদের মানসিক শান্তি প্রদান করবে। এবং শরীর। জীবনে অনুগ্রহ মানে তারা তাদের সমস্ত ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের জন্য সময় পাবে। এ দুটি দোয়া মুসলমানরা তাদের সারা জীবন এবং সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় ব্যয় করে কিন্তু অনেকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয় যে, মহান আল্লাহ তাদের উভয়কেই স্থান দিয়েছেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায়

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তাদের অমুসলিম আত্মীয়দের সাথেও এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা । সহীহ মুসলিম, 2324 নম্বরে এই পরামর্শ দেওয়া একটি হাদিস পাওয়া যায়।

শয়তানের ফাঁদগুলির মধ্যে একটি হ'ল সে আত্মীয়দের মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্য রাখে যা ভেঙে পরিবারকে নিয়ে যায়। এবং সামাজিক বিভাগ। ইসলামকে জাতি হিসেবে দুর্বল করাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ ক্ষোভ পোষণ করার জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছে যা কয়েক দশক ধরে চলে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে যায়। একজন ব্যক্তি কয়েক দশক ধরে একজন আত্মীয়ের সাথে ভাল আচরণ করবে কিন্তু একটি ভুল এবং তর্কের জন্য সে পরবর্তীতে তাদের সাথে আর কথা বলবে না বলে শপথ করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন সহীহ মুসলিম, 6526 নম্বরে পাওয়া যায় যে, একজন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অবৈধ। অ-আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ যদি এই হয় তাহলে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার গুরুতরতা কি কেউ কল্পনা করতে পারে? এই প্রশ্ন সহীহ বুখারী, 5984 নম্বরে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে পার্থিব কারণে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আয়াত ও হাদিসগুলোর প্রতি আমাদের অবশ্যই চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, কয়েক দশকের পাপের পরও যদি মহান আল্লাহ তার দরজা বন্ধ না করেন বা মানুষের সাথে সার্ভারের সংযোগ বন্ধ না করেন, তাহলে মানুষ কেন এত সহজে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ছোট ছোট পার্থিব বিষয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়? সমস্যা? এটি অবশ্যই পরিবর্তন হবে যদি কেউ মহান আল্লাহর সাথে তাদের সংযোগ অটুট রাখতে চায়।

অন্যদের সান্ত্বনা

সামাজিকভাবে দুর্বল সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মক্কার অমুসলিমদের সহিংসতা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কয়েকজনকে ইথিওপিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাদের রাজা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং তারা সেখানে নিপীড়নের সম্মুখীন হবে না। অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পরিবার-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুও হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন যাতে তিনি শান্তিতে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন। যখন তিনি মক্কা থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছেন তখন তিনি মক্কার একজন অমুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইবনে আদ দাগিনার সাথে দেখা করেন। দুজন কথা বললে ইবনে আদ দাঘিনা মন্তব্য করেছিলেন যে তার মতো একজন ভাল ব্যক্তিকে তার জন্মভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা উচিত নয়। ইবনে আদ দাগিনা আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কিছু মহৎ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: দুঃখী ব্যক্তিকে সাহায্য করা। সহীহ বুখারী, ৩৯০৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 1601 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো শোকাহত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয় তাকে বিচারের দিন সম্মানের পোশাক পরানো হবে।

যেহেতু অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সব কিছুর জন্য গ্যারান্টিযুক্ত এটি একটি দুর্দান্ত পুরস্কার পাওয়ার একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যার জন্য খুব বেশি সময়, শক্তি বা অর্থের প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে রয়েছে মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিক সহায়তার মতো একজনের উপায় অনুযায়ী অসুবিধার সম্মুখীন

পরিবারকে সাহায্য করার চেষ্টা করা। একজন মুসলিমকে অবশ্যই অগ্নিপরীক্ষার সময় ধৈর্য ধরে থাকতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদের পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসগুলি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, যেগুলি ধৈর্যশীল হওয়ার গুরুত্ব এবং মহান পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করে। তাদের মনে করিয়ে দিয়ে ইতিবাচকভাবে কথা বলা উচিত যে জিনিসগুলি শুধুমাত্র একটি সঙ্গত কারণেই ঘটে, এমনকি যদি লোকেরা তাদের পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তির এই সৎ কাজটি করার জন্য একজন পণ্ডিত হওয়া উচিত নয় কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমর্থনের কয়েকটি শব্দই যথেষ্ট সমস্যাগুলির মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তিকে ভাল বোধ করার জন্য যথেষ্ট। এবং কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শারীরিকভাবে সেখানে থাকাই তাদের সমর্থনের অনুভূতি প্রদান করার জন্য যথেষ্ট, এমনকি যদি কোন কথা না বলা হয়।

পরিশেষে, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে মুসলমানরা এই সৎ কাজটি করার সময় তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করে অর্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এটি করুন এবং অন্যদের, যেমন তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দেখানোর জন্য এটি করবেন না বা ভয়ের কারণে করবেন না। অন্যদের দ্বারা সমালোচিত হচ্ছে যদি তারা তা করতে ব্যর্থ হয়। যারা অন্যের জন্য কাজ করে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে যে তারা তাদের কাজ থেকে তাদের পুরষ্কার লাভ করবে যার জন্য তারা কাজ করেছে যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

প্রথম মাইগ্রেশন

সামাজিকভাবে দুর্বল সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মক্কার অমুসলিমদের সহিংসতা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কয়েকজনকে ইথিওপিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাদের রাজা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং তারা সেখানে নিপীড়নের সম্মুখীন হবে না। অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পরিবার-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুও হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন যাতে তিনি শান্তিতে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন। যখন তিনি মক্কা থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছেন তখন তিনি মক্কার একজন অমুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইবনে আদ দাগিনার সাথে দেখা করেন। দুজন কথা বললে ইবনে আদ দাঘিনা মন্তব্য করেছিলেন যে তার মতো একজন ভাল ব্যক্তিকে তার জন্মভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা উচিত নয়। ইবনে আদ দাগিনা আবু বকর (রা) এর কিছু মহৎ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। ইবনে আদ দাঘিনা তখন আবু বক্করকে উৎসাহিত করেন, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন, মক্কায় ফিরে যেতে যেখানে তিনি তাকে মক্কার অমুসলিমদের কাছ থেকে তার সুরক্ষা প্রদান করবেন। যখন তারা উভয়েই ফিরে আসেন তখন মক্কার অমুসলিমদের নেতারা ইবনে আদ দাগিনার দাবিতে সম্মত হন কিন্তু আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিজের বাড়ির গোপনীয়তায় প্রার্থনা ও মহান আল্লাহর ইবাদত করার জন্য জোর দেন। জনসমক্ষে না। সহীহ বুখারী, ৩৯০৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন তবুও তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করতে এবং সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে এই কাজটি করেছিলেন।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এমন অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে দাবি করেন না। উদাহরণস্বরূপ, এই ঘটনাটি যা কিছু সাহাবীর হিজরত নিয়ে আলোচনা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, ইথিওপিয়ায়।

তুলনামূলকভাবে, মুসলমানরা এখন যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ততটা কঠিন নয় যতটা ধার্মিক পূর্বসূরিরা সম্মুখীন হয়েছিল। তাই মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাদের শুধুমাত্র কয়েকটি ছোট কুরবানী করতে হবে, যেমন ফরজ ফজরের নামাজ পড়ার জন্য কিছু ঘুম কুরবানী এবং বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করার জন্য কিছু সম্পদ। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের বাড়িঘর ও পরিবার পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এই কৃতজ্ঞতা অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে একজনের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি ব্যবহার করে কার্যত দেখাতে হবে।

উপরন্তু, যখন একজন মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের উচিত ধার্মিক পূর্বসূরিরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল এবং কীভাবে তারা মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল তা মনে রাখা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই জ্ঞান একজন মুসলিমকে তাদের অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে শক্তি প্রদান করতে পারে কারণ তারা জানে যে ধার্মিক পূর্বসূরিরা মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল, তবুও তারা ধৈর্যের সাথে আরও কঠিন সমস্যা সহ্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ

দেয় যে মহানবী (সাঃ) তাদের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সহ্য করেছেন এবং তারা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

একজন মুসলমান যদি ধার্মিক পূর্বসূরিদের অটল মনোভাব অনুসরণ করে তবে আশা করা যায় যে তারা পরকালে তাদের সাথেই থাকবে।

ঐশ্বরিক সুরক্ষা

সামাজিকভাবে দুর্বল সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মক্কার অমুসলিমদের সহিংসতা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কয়েকজনকে ইথিওপিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাদের রাজা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং তারা সেখানে নিপীড়নের সম্মুখীন হবে না। অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পরিবার-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুও হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন যাতে তিনি শান্তিতে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন। যখন তিনি মক্কা থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছেন তখন তিনি মক্কার একজন অমুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইবনে আদ দাগিনার সাথে দেখা করেন। দুজন কথা বললে ইবনে আদ দাঘিনা মন্তব্য করেছিলেন যে তার মতো একজন ভাল ব্যক্তিকে তার জন্মভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা উচিত নয়। ইবনে আদ দাগিনা আবু বকর (রা) এর কিছু মহৎ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। ইবনে আদ দাঘিনা তখন আবু বক্করকে উৎসাহিত করেন, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন, মক্কায় ফিরে যেতে যেখানে তিনি তাকে মক্কার অমুসলিমদের কাছ থেকে তার সুরক্ষা প্রদান করবেন। যখন তারা উভয়েই ফিরে আসেন তখন মক্কার অমুসলিমদের নেতারা ইবনে আদ দাগিনার দাবিতে সম্মত হন কিন্তু আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিজের বাড়ির গোপনীয়তায় প্রার্থনা ও মহান আল্লাহর ইবাদত করার জন্য জোর দেন। জনসমক্ষে না। আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সম্মত হন কিন্তু তাঁর বাড়ির সামনে একটি মসজিদ তৈরি করেন যেখানে তিনি প্রার্থনা করেন এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন যা পথচারীরা শুনতে পায়। মক্কার অমুসলিমদের নেতারা এ বিষয়ে ইবনে আদ দাগিনাকে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করেন, হয় একান্তে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে অথবা তাকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিতে। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তার পরিবর্তে বিশ্বজগতের মহান প্রভু আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৩৯০৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 1081 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে তাদের বিধান, খোদায়ী সমর্থন এবং তাদের অবস্থা ও অবস্থার উন্নতিতে কীভাবে আশীর্বাদ লাভ করতে হবে তার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম কাজটি হল, মৃত্যুর আগে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করা। যেহেতু মৃত্যুর সময় অজানা এই হাদিসটি আসলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেয় যখনই কেউ পাপ করে, অর্থ বিলম্ব না করে অনুতপ্ত হওয়া। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, অনুশোচনা করা, একই বা অনুরূপ পাপ আবার না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। এবং পরিশেষে, যদি সম্ভব হয়, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের সম্মানে যে কোন অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করা।

প্রধান হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী বিষয় হল যে একজন মুসলিমকে দায়িত্ব, অসুস্থতা বা অসুবিধায় ব্যস্ত হওয়ার আগে তাদের সময়কে কাজে লাগাতে হবে। একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করতে পারে। তাদেরকে দেরি না করে যতটা সম্ভব তাদের সাধ্যের মধ্যে সৎকাজ সম্পাদন করতে ত্বরান্বিত করতে হবে কারণ তারা যে আগামীকালের জন্য আশা করে তা কখনোই আসবে না। আশা করা যায় যে এই আচরণকারীকে মহান আল্লাহ তায়ালা সমর্থন করবেন, যখন তারা পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে অতিরিক্ত সৎ কাজ করার মতো অবস্থায় থাকবে না।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল যে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সাথে তাদের বন্ধন দৃঢ় করতে হবে, তাঁকে অনেক বেশি স্মরণ করে। মহান আল্লাহর প্রকৃত স্মরণ তিনটি স্তরে গঠিত। প্রথমটি হল অভ্যন্তরীণ স্মরণ অর্থ, তাঁর প্রতি আন্তরিকতা। দ্বিতীয় স্তরটি হল মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, ভাল কথা বলা এবং অনর্থক ও পাপপূর্ণ কথা পরিহার করা। এবং সর্বোচ্চ স্তর হল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

মূল হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বিষয় হল গোপন ও প্রকাশ্য উভয় প্রকার দান করা। এর মধ্যে বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ হল নিজের সাধ্য অনুযায়ী দান করা, তা বেশি হোক বা কম হোক। মহান আল্লাহ, পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করেন না তিনি গুণগত অর্থ, একজনের আন্তরিকতার উপর ভিত্তি করে কর্ম পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এটি সহীহ বুখারী, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা ছাড়া আর কোন অজুহাত নেই। উপরন্তু, নিয়মিত দান করা জরুরী একবারের পরিবর্তে নিয়মিত দান করা কারণ নিয়মিত কাজগুলি মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়, যদিও তা সামান্যই হয়। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, যারা অন্যকে দান করার জন্য উত্সাহিত করতে চান তারা প্রকাশ্যে দিতে পারেন। এটি তাদের অনুপ্রেরণার কারণে দানকারীদের সমান পুরষ্কার অর্জন করতে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের 2351 নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা প্রদর্শনের ভয়ে ভীত, যা তাদের পুরস্কার বাতিল করে, তাদের উচিত গোপনে তা করা। ইসলাম মুসলমানদের জন্য অনেক পুরষ্কার অর্জনের জন্য অনেক বিকল্প এবং সুযোগ প্রদান করেছে যা উভয় জগতে তাদের বোঝা অপসারণের দিকে পরিচালিত করে।

সত্যের চ্যাম্পিয়ন

মদিনায় হিজরত করার পূর্বে মক্কায় তাঁর শেষ বছরগুলিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অলৌকিক স্বর্গীয় যাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাকে প্রথমে ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসায় এবং তারপর রাতের একটি ছোট অংশে সাত আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 1:

"পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে [অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)]কে রাতের বেলা আল-মসজিদ আল-হারাম থেকে আল-মসজিদ আল-আকসা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চারপাশে আমরা বরকত দান করেছি, তাকে আমাদের দেখানোর জন্য। লক্ষণ..."

ফিরে এসে তিনি মক্কাবাসীকে তার স্বর্গীয় যাত্রার কথা জানান। মক্কার অমুসলিমরা তার দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং সাহাবায়ে কেরামকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, ইসলাম ত্যাগ করার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন কারণ তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে এই যাত্রা অসম্ভব। কিন্তু আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহজভাবে উত্তর দিয়েছিলেন যে এই যাত্রায় বিশ্বাস করা একটি ছোট বিষয় ছিল কারণ তিনি আরও বড় বিষয়ে বিশ্বাস করতেন যা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জানিয়েছিলেন যেমন ঐশ্বরিক ওহী। এরপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সিদ্দিক অর্থাৎ সত্যবাদী উপাধি দেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 63-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা অবলম্বন করে একজনকে অবশ্যই আবু বক্কর (রা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। অধিকাংশ মৌখিক পাপ সংঘটিত হয় কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা

অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে মদিনায় হিজরত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা

মক্কায় বছরের পর বছর অত্যাচারের পর মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আবু বক্কর (রাঃ) এর সাথে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেন। তারা মক্কার অমুসলিমদের দ্বারা সনাক্ত না হওয়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করেছিল, যেমন গোপনে মক্কা ত্যাগ করা। তাদের কাছে ছিল আবু বক্করের পুত্র আবদুল্লাহ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মক্কার অমুসলিমদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করছিলেন যাতে তাদের মন্দ পরিকল্পনা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। মদিনায় তাদের যাত্রায় সাহায্য করার জন্য তারা একজন গাইড নিয়োগ করেছিল। সহীহ বুখারী, ৩৯০৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সতর্কতা এবং পদক্ষেপগুলি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক নির্দেশ করে, যেমন, আল্লাহ, মহান, কোন প্রকার সুবিধা অর্জনের জন্য বৈধ উপায়ে যে উপায়গুলি সরবরাহ করেছেন তা ব্যবহার করে। অন্য দিকটি হল বিশ্বাস করা যে ফলাফল, যা মহান আল্লাহ বাছাই করেন, তা জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বক্কর (রাঃ) উভয়ের মধ্যেই মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উভয় উপাদানই স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সাওর পর্বতের গুহায় থাকাকালীন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, মহান আল্লাহ তাদের সাথে ছিলেন বলে তার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করবেন না। এটি সহীহ বুখারী, 3922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2344 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যদি সত্যই মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে, তবে তিনি পাখিদের যেমন রিজিক দেন, তেমনি তিনি তাদের রিযিক দেবেন। সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা ছেড়ে সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা হল এমন একটি বিষয় যা অন্তরে অনুভূত হয় কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

আস্থার যে দিকটি অভ্যন্তরীণ তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে একমাত্র মহান আল্লাহই একজনকে উপকারী জিনিস প্রদান করতে পারেন এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারেন। একজন মুসলিম বোঝে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে দিতে, আটকাতে, ক্ষতি করতে বা উপকার করতে পারে না।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর উপর সত্যিকারের আস্থা রাখার অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহ যে উপায়গুলো দিয়েছেন, যেমন ওষুধ ব্যবহার করা ছেড়ে দেওয়া উচিত। আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাখিরা তাদের বাসা ছেড়ে সক্রিয়ভাবে রিযিকের সন্ধান করে। যখন কেউ মহান আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও উপায় ব্যবহার করে, তখন ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তারা নিঃসন্দেহে তাঁর আনুগত্য করে। এটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার বাহ্যিক উপাদান। বহু আয়াত ও হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 71:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সাবধান হও..."

প্রকৃতপক্ষে, বাহ্যিক কর্মকাণ্ড মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করাই হলো মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা। অভ্যন্তরীণ আস্থার অধিকারী হলেও বাহ্যিক ঐতিহ্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

কর্ম এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায় ব্যবহার করা, তাঁর উপর ভরসা করার একটি দিক। এই ক্ষেত্রে, ক্রিয়াগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি হল আনুগত্যের সেসব কাজ যা মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদেরকে আদেশ করেন যাতে তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে এবং জান্নাত লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এই বিশ্বাস দাবী করার সময় এগুলো পরিত্যাগ করা নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তা এবং তাই দোষারোপযোগ্য।

দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম হল সে সকল মাধ্যম যা মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য নিরাপদে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া, তৃষ্ণা পেলে পান করা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম কাপড় পরিধান করা। যে ব্যক্তি এগুলি পরিত্যাগ করে এবং নিজের ক্ষতি করে সে দোষী। যাইহোক, কিছু লোক আছে যাদেরকে মহান আল্লাহ বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন, যাতে তারা নিজেদের ক্ষতি না করে এই উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনব্যাপী রোজা রাখতেন কিন্তু অন্যদেরকে সেই কাজ করতে নিষেধ করতেন, যেমন মহান আল্লাহ তাঁর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি প্রদান করেন। এটি সহীহ বুখারি, 1922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) চতুর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আলী বিন আবু তালিবের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট না হন। অতিরিক্ত ঠান্ডা বা তাপ অনুভব করা। সুনানে ইবনে মাজাহ, 117 নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, যদি একজন ব্যক্তি এই উপায়গুলি থেকে দূরে সরে যায় কিন্তু আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি প্রদান করে তবে তা গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় এটা দোষারোপযোগ্য।

মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রকারের কর্ম হল সেসব কাজ যা একটি প্রথাগত অভ্যাস হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ কখনও কখনও নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য ভেঙে দেন। এর একটি উদাহরণ হল সেই সব মানুষ যারা ওষুধের প্রয়োজন ছাড়াই রোগ নিরাময় করে। এটি বিশেষত দরিদ্র দেশগুলিতে বেশ সাধারণ যেখানে ওষুধ পাওয়া কঠিন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 2144 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের সাথে যুক্ত, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না তারা তাদের জন্য বরাদ্দ করা প্রতিটি আউন্স ব্যবহার করে, যা সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস অনুসারে ছিল। পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, মহান আল্লাহ আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই হাদিসটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করেন তিনি সক্রিয়ভাবে এই জেনেও ব্যবস্থা নাও পেতে পারেন যে এতদিন আগে তাদের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছিল তা তাদের

মিস করতে পারে না। সুতরাং এই ব্যক্তির জন্য রিযিক প্রাপ্তির প্রথাগত উপায় যেমন চাকরির মাধ্যমে তা অর্জন করা মহান আল্লাহ তায়ালা ভেঙে দিয়েছেন। এটি একটি উচ্চ এবং বিরল পদ। অভিযোগ না করে বা আতঙ্কিত না হয়ে বা মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা না করে যে এমন আচরণ করতে পারে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি যদি এই পথ বেছে নেয় তবে দোষমুক্ত। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 1692 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তির পক্ষে তাদের নির্ভরশীলদের ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হওয়া একটি পাপ। তারা এই উচ্চ পদে থাকতে পারে।

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত আস্থা রাখলে নিয়তিতে সন্তুষ্ট থাকে। অর্থ, মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা কিছু বেছে নেন তারা কোনো অভিযোগ ছাড়াই এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই গ্রহণ করেন কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহই তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপসংহারে বলা যায়, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা সর্বোত্তম, বৈধ উপায় ব্যবহার করে একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয়েছে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন এবং অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধুমাত্র আল্লাহ, উচ্চতর, সিদ্ধান্ত নেবে ঘটবে, যেটি নিঃসন্দেহে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম পছন্দ যে তারা এটি পালন করে বা না করে।

সত্য ভালবাসা

মক্কায় বছরের পর বছর অত্যাচারের পর মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আবু বক্কর (রাঃ) এর সাথে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেন। তাদের সফরের সময় আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে নিজেকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে অবস্থান করতেন, যখন হাঁটতেন এবং তারপর কখনও কখনও তাঁর পিছনে অবস্থান করতেন। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে যতবারই তিনি আশংকা করতেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছন থেকে আক্রমণ করবেন তখনই তিনি নিজেকে পবিত্রতার পিছনে অবস্থান করবেন। নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিন্তু তখন তিনি সম্মুখ আক্রমণের ভয় পেতেন এবং এর ফলে তিনি অবস্থান পরিবর্তন করতেন। অবশেষে তারা কিছু দিনের জন্য থাওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। গুহায় প্রবেশের পূর্বে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ভেতর থেকে কোনো ক্ষতিকর জিনিস পরিষ্কার ও অপসারণ করার জন্য প্রথমে গুহায় প্রবেশ করার জন্য জোর দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি গুহার ভিতরে একটি ফাটলের উপর পা রেখেছিলেন এই ভয়ে যে সেখান থেকে কোন প্রাণী বের হয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ষতি করতে পারে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 157-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক মুসলমান খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে, তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যান্য নবী-রাসুল (সঃ) এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি উদ্‌ধৃত করে, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি পরকালে তাদের সাথে থাকবে যাদের তারা ভালবাসে। আর এর কারণে তারা মহান আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে।

কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে তারা এই ফলাফল কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসার দাবি করে, তবুও তারা তাকে খুব কমই চেনে কারণ তারা তাঁর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত। এটা বোকামি যে কিভাবে একজন সত্যিকারের ভালোবাসতে পারে যাকে তারা জানে না?

উপরন্তু, যখন এই লোকদের কাছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের ভালবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, হাশরের দিনে তারা কি বলবে? তারা কি উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ হচ্ছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন, চরিত্র ও শিক্ষার উপর অধ্যয়ন ও আমল করা। এই প্রমাণ ছাড়া একটি ঘোষণা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। এটা খুবই সুস্পষ্ট কারণ সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে ভালো ইসলামকে কেউ বুঝতে পারেনি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেন। এই কারণেই তারা পরকালে তার সাথে থাকবে।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালবাসা হৃদয়ে রয়েছে এবং এটিকে কাজের মাধ্যমে দেখানোর প্রয়োজন হয় না তারা সেই ছাত্রের মতো বোকা যে ছাত্রটি তাদের শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে জ্ঞান তাদের মনে রয়েছে তাই তাদের কার্যত লিখতে হবে না। কাগজে নিচে এবং তারপর এখনও পাস করার আশা.

যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, সে মহান আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

পরিশেষে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালবাসা দাবি করে, তাদের উপর শান্তি। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা অবশ্যই বিচারের দিন তাদের সাথে থাকবে না। এক মুহুর্তের জন্য যদি কেউ এই সত্যটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

শ্রেষ্ঠ সঙ্গী

মদিনায় হিজরতের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং হযরত আবু বক্কর (রাঃ) যখন থাওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন তখন মক্কার অমুসলিমরা শহীদ হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই সুযোগে মক্কার অমুসলিমরা যে গুহায় লুকিয়ে ছিল সেখানে পৌঁছে। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু লক্ষ্য করেছেন যে, অমুসলিমরা যদি তাদের পায়ের দিকে তাকাতো তবে তারা তাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কেই গুহায় লুকিয়ে দেখতে পাবে। এতে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি যেন শোক না করেন কারণ মহান আল্লাহ তাদের তৃতীয় সাহাবী ছিলেন। এটি সহীহ বুখারী, 3922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 9 আত তওবাহ, আয়াত 40:

"...যখন তারা গুহায় ছিল এবং তিনি [অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর সাথীকে বললেন, "দুঃখ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"...

সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, যিনি তাঁকে স্মরণ করেন তিনি তাঁর সাথে আছেন।

বিষণ্নতার মতো মানসিক সমস্যা এবং ব্যাধির উত্থানের সাথে সাথে এই ঘোষণার গুরুত্ব বোঝা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক। একজন ব্যক্তির

মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার একটি ছোট সম্ভাবনা থাকে যখন তারা ক্রমাগত তাদের ঘিরে থাকে এবং তাকে সত্যিকারের ভালবাসে এমন কাউকে সাহায্য করে। যদি এটি একজন ব্যক্তির জন্য সত্য হয় তবে নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর জন্য আরও উপযুক্ত, যিনি তাকে স্মরণকারীর সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধুমাত্র এই ঘোষণার উপর কাজ করা সমস্ত মানসিক সমস্যা যেমন বিষণ্নতা দূর করবে। এ কারণেই অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা অন্যদের মধ্যে থাকা নেককার পূর্বসূরিদের মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করেনি কারণ তারা সর্বদা মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে ছিল। এটা স্পষ্ট যে, যখন কেউ মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে, তখন তারা পরকালে তাঁর নৈকট্য না পাওয়া পর্যন্ত সকল বাধা-বিপত্তি সফলভাবে অতিক্রম করবে।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে এই ঘোষণাকে কোনভাবেই সীমাবদ্ধ করেননি। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ঘোষণা করেননি যে তিনি শুধুমাত্র ধার্মিকদের সাথে বা যারা নির্দিষ্ট ভাল কাজ করে তাদের সাথে ছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মুসলমানকে তাদের বিশ্বাসের শক্তি বা কত পাপই করেছেন তা নির্বিশেষে ঘিরে রেখেছেন। তাই একজন মুসলমানের কখনই মহান আল্লাহর রহমত থেকে আশা হারানো উচিত নয়। কিন্তু এই হাদীসে উল্লেখিত শর্তটি লক্ষ্য করা জরুরী অর্থাৎ মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। এটি কেবল জিহ্বা দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা নয় বরং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল নিজের কাজের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা। এটি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এটাই মহান আল্লাহর প্রকৃত স্মরণ। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে মহান আল্লাহর সঙ্গ ও সমর্থনে ধন্য হবে।

সহজ কথায়, যে ব্যক্তি যত বেশি মহান আল্লাহকে মান্য করবে, ততই তার সাহচর্য পাবে। একজন যা দেয় তাই তারা পাবে।

সত্যকে মেনে চলা

মদিনায় তাদের হিজরতের সময়, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একজন পথচারী জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ছিলেন, কারণ তিনি তাঁকে চিনতে পারেননি। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সত্য বলতে চাননি কারণ এই তথ্য মক্কার অমুসলিমদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে, যারা তাদের অনুসরণ করছিল, কিন্তু একই সাথে তিনি মিথ্যা বলতে চাননি, যেহেতু তিনি ছিলেন সততা ও সত্যবাদিতার শিখর। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে বলেছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল তাঁর পথপ্রদর্শক ছিলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এই পৃথিবীতে তাঁর পথপ্রদর্শককে বোঝাতে চেয়েছিলেন যেখানে লোকটি ধরে নিয়েছিল যে তিনি তাঁর ভ্রমণের সময় তাঁর পথপ্রদর্শক ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 104-105 এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা খুবই লজ্জার বিষয় যে আজকাল মুসলমানরা কোনো বাস্তব কারণ ছাড়াই মিথ্যা বলে, যদিও আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সৎ ছিলেন, এমনকি মারাত্মক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েও।

মিথ্যা বলা অগ্রহণযোগ্য যে এটি একটি ছোট মিথ্যা যা প্রায়ই একটি সাদা মিথ্যা বলা হয় বা যখন কেউ একটি রসিকতা হিসাবে মিথ্যা বলে। এই ধরনের মিথ্যা সব হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাই তাদের উদ্দেশ্য কাউকে ধোঁকা দেওয়া নয়, জামি আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি জনপ্রিয় মিথ্যা যা লোকেরা প্রায়শই বলে যে এটি একটি পাপ নয় তা হল যখন তারা শিশুদের সাথে মিথ্যা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুনাহ যেমন সুনানে আবু দাউদ, নং 4991 এ পাওয়া যায়। বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা পরিষ্কার মূর্খতা কারণ তারা এই পাপপূর্ণ অভ্যাসটি শুধুমাত্র বড়দের কাছ থেকে গ্রহণ করবে যে তাদের সাথে মিথ্যা বলে। এইভাবে আচরণ করা দেখায় যে শিশুদের মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য যখন এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। শুধুমাত্র খুব বিরল এবং চরম ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, উদাহরণস্বরূপ, একটি নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা জরুরী, এটি অন্যান্য গুনাহের দিকে নিয়ে যায় যেমন গীবত করা এবং লোকদের উপহাস করা। এই আচরণ একজনকে জাহান্নামের দরজার দিকে নিয়ে যায়। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে তখন মহান আল্লাহ তাকে মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। কেয়ামতের দিন একজন ব্যক্তির কী ঘটবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই, যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সমস্ত মুসলমানই ফেরেশতাদের সঙ্গ কামনা করে তবুও যখন কেউ মিথ্যা বলে তখন তারা তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে বাদ দেওয়া দুর্গন্ধ ফেরেশতাদের তাদের থেকে এক মাইল দূরে সরিয়ে দেয়। জামে আত তিরমিযী, 1972 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মিথ্যা কথা বলা যা সমাজে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এমন একটি গুরুতর পাপ যে, সহীহ বুখারীর 7047 নম্বর হাদিস অনুসারে, যদি কেউ এটি করে এবং অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয় তবে তার মৃত্যুর পরে তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যে একটি লোহা। তাদের মুখে হুক বসানো হবে এবং তাদের মুখের চামড়া ছিঁড়ে ফেলা হবে। তাদের মুখ অবিলম্বে পুনর্জন্ম হবে এবং প্রক্রিয়া তারপর পুনরাবৃত্তি করা হবে. কেয়ামত পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকবে।

উপসংহারে বলা যায়, সকল মুসলমানের উচিত সকল প্রকার মিথ্যা কথা এড়ানো, তারা কার সাথে কথা বলুক না কেন।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় মদিনায় জীবন

মাইগ্রেশনের পর ১ ম বছর

একটি সুন্দর উত্তরাধিকার

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল মহান আল্লাহর ঘর, মসজিদে নববী নির্মাণ। জমিটি দুই এতিম বালক সুহাইল ও সাহল (রাঃ)-এর ছিল, যারা বিনা মূল্যে জমিটি প্রদান করেছিলেন কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিনামূল্যে নিতে অস্বীকার করেন এবং তাদের কাছ থেকে কিনে নেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 165-166-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, পার্থিব উত্তরাধিকার আসা-যাওয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। ইসলাম শুধু মুসলমানদেরকে সৎকর্মের মাধ্যমে আখেরাতের জন্য আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায় না বরং এটি তাদের পিছনে একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতে শেখায় যা থেকে লোকেরা উপকৃত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলমান মারা যায় এবং দরকারী কিছু রেখে যায়, যেমন একটি জলের

কূপ আকারে চলমান দাতব্য তারা এর জন্য সওয়াব পাবে। এটি সহীহ মুসলিম, 4223 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত নেক আমল করার চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব ভালো কিছু পাঠানোর চেষ্টা করা উচিত, তবে তাদের পিছনে একটি ভাল উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত যা তারা মারা যাওয়ার পরে তাদের উপকার করবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান তাদের সম্পদ ও সম্পত্তির ব্যাপারে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তারা কেবল তাদের পিছনে ফেলে চলে যায় যা তাদের সামান্যতম উপকারে আসে না। প্রত্যেক মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাদের নিজের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য তাদের কাছে প্রচুর সময় আছে কারণ মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর আঘাত করে। আজ সেই দিনটি যেটি একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের প্রতিফলন করা উচিত। যদি এই উত্তরাধিকারটি ভাল এবং উপকারী হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, তিনি তাদের তা করার শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু যদি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসে না, তবে তাদের এমন কিছু প্রস্তুত করা উচিত যা তারা কেবল আখেরাতের জন্য কল্যাণই প্রেরণ করে না বরং কল্যাণও রেখে যায়। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত তাদের উত্তরাধিকার কি?

বিশ্বের সেরা স্থান

মদিনায় পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মসজিদটি প্রাথমিকভাবে ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছিল যার উপরে খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি একটি হালকা ছাদ ছিল। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফত আমলে এর কোনো উন্নতি করেননি। কিন্তু উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর খিলাফত আমলে এটিকে বড় করে তোলেন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে যেভাবে ইট ও খেজুর পাতা দিয়ে পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। এর কাঠের স্তম্ভগুলিও পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর খিলাফতকালে উসমান ইবনে আফফান রা. তিনি এর দেয়ালগুলি কাটা পাথর ও প্লাস্টার দিয়ে, পাথরের স্তম্ভ এবং সেগুনের ছাদ দিয়েছিলেন। তিনি সুনানে ইবনে মাজা, 738 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসকে কার্যকর করছিলেন। এতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, এমনকি একটি মসজিদ যত ছোট হোক। চড়ুইয়ের বাসা হোক বা ছোট হোক, মহান আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 201-202-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 1528 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে যেতে নিষেধ করে না। কিংবা তাদেরকে সর্বদা মসজিদে বসবাসের নির্দেশ দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাজারের জায়গায় যাওয়ার চেয়ে

জামাতের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন শপিং সেন্টারের মতো অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলমানের উচিত অপ্রয়োজনীয়ভাবে সেখানে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়া কারণ তারা এমন জায়গা যেখানে পাপ বেশি হয়। যেখানে, মসজিদগুলিকে বোঝানো হয়েছে পাপ থেকে আশ্রয়স্থল এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য একটি আরামদায়ক স্থান। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। একজন ছাত্র যেমন একটি লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হয় যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়, তেমনি মুসলমানরা মসজিদ থেকে উপকৃত হতে পারে কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে দরকারী জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার জন্য উত্সাহিত করা যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে।

একজন মুসলমানকে অন্য জায়গার চেয়ে মসজিদকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের উচিত অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়ানোর জন্য একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে কষ্ট এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

সাহায্যকারী এবং অভিবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব (রহঃ)

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর সহযাত্রী হিজরতকারী, মুহাজিরগণ এবং সাহায্যকারী, আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহর পথে ভাই ভাই হওয়ার উপদেশ দেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 215-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে একসময় তাদের দৃঢ় সংযোগ হারায়। এর অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি। এটি সাধারণত জানা যায় যে যখন একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন ভবনটি সময়ের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এমনকি ধসে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষকে সংযুক্ত করার বন্ধনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যকার বন্ধনগুলি অবশেষে দুর্বল বা এমনকি ভেঙ্গে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন। যেখানে, বেশিরভাগ মুসলমান আজ উপজাতীয়তা, ভ্রাতৃত্বের জন্য এবং অন্যান্য পরিবারকে দেখানোর জন্য লোকদের একত্রিত করে। যদিও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগকারী বন্ধনের ভিত্তি ছিল যথার্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন শক্তিশালী থেকে শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও আজকাল অনেক মুসলমান রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সময়ের সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যদি তাদের বন্ধন টিকে থাকার এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জনের ইচ্ছা থাকে তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং একসাথে এমনভাবে কাজ করে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মাইগ্রেশনের পর 2 য় বছর

বদরের যুদ্ধ

দৃঢ় অবস্থান

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কার অমুসলিমদের একটি কাফেলা আক্রমণ করার পথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানানো হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য একটি সেনাবাহিনী সংগঠিত করেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে কি করতে হবে তার মতামত জানতে চাইলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 259-260-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ সময় হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে গিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেন, সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি সমর্থনের অঙ্গীকার করেন এবং অন্যান্য সাহাবীগণকে উৎসাহিত করেন, আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। তাদের, একই করতে.

এই ঘটনাটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের ভেতরের শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ

মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

উপরন্তু, ভন্ডামির একটি দিক হল যখন কেউ মৌখিকভাবে অন্যদের এবং তাদের ভাল প্রকল্পগুলির জন্য সমর্থন দেখায় যেমন, একটি মসজিদ নির্মাণ কিন্তু যখন প্রকল্পে অংশ নেওয়ার সময় আসে, যেমন সম্পদ দান করার সময় তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। একইভাবে, লোকেরা যখন ভাল সময়ের মুখোমুখি হয় তখন তারা তাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা অন্যদের মনে করিয়ে দিয়ে মৌখিকভাবে তাদের সমর্থন করে। কিন্তু জনগণ যে মুহুর্তে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এই মুনাফিকরা কোন মানসিক বা শারীরিক সমর্থন দেয় না। বরং তারা তাদের সমালোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুনাফিকদের এই মনোভাব ছিল। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 62:

“অতএব কেমন হবে যখন তাদের হাতের বর্ধনের কারণে তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসে এবং তখন তারা আল্লাহর নামে শপথ করে আপনার কাছে আসে, “আমরা সদাচরণ ও বাসস্থান ছাড়া আর কিছুই চাইনি।”

সাহস

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী। বদর যুদ্ধের সময় তিনি প্রতিটি আক্রমণ থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে ছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন। এটি ইমাম সুয়ূতী, তারিখ আল খুলাফা, 13 পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার অমুসলিমদের প্রাথমিক লক্ষ্যবস্তু ছিলেন, বদর যুদ্ধের সময় তাঁর সাথে থাকাটাই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান।

একজন মুসলমানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাহসিকতা অবলম্বন করতে হবে, যার মধ্যে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য থাকা জড়িত।

সুনানে আবু দাউদ, 2511 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কাপুরুষ আচরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। এই মনোভাব মহান আল্লাহ, এবং তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমন একজনের নিশ্চিত বিধানের উপর আস্থা রাখতে বাধা দেয়। এটি সন্দেহজনক এবং বেআইনি উপায়ে তাদের বিধান অনুসন্ধান করতে পারে যা উভয় জগতের একজন ব্যক্তিকে ধ্বংস করবে। মহান আল্লাহ এমন কোন কাজ কবুল করেন না যার ভিত্তি হারাম। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, কাপুরুষ হওয়া একজনকে শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বাধা দেয় এবং একজনের অভ্যন্তরীণ শয়তান যার জন্য প্রকৃত সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। এটি একজনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এবং তাই এটি তাদের জনগণের অধিকার পূরণে বাধা দেবে। পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা এবং সময় প্রয়োজন। একজন কাপুরুষ এই সংগ্রাম করতে খুব ভয় পাবে এবং পরিবর্তে অলস হবে যা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়।

সত্যিকারের আশা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিজয় দান করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে অবিরাম এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন। মহান আল্লাহর কাছে তার অনুনয় এতই তীব্র ছিল যে, যখন তিনি দু'হাত তুলে দোয়া করতেন তখন তার চাদরটি কাঁধ থেকে পড়ে যেত। হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন এবং তাঁর জন্য তাঁর চাদরটি প্রতিস্থাপন করতেন এবং সহানুভূতি স্বরূপ তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুরোধ করতেন। তার তীব্রতা হ্রাস করুন কারণ মহান আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন এবং তাকে বিজয় দান করবেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 273-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু মহান আল্লাহর পূর্ণ বান্দা, তাই তিনি তাঁর প্রভু ও প্রভুর কাছে প্রার্থনা ও প্রার্থনা করা বন্ধ করেননি। এই ঘটনার সময় হযরত আবু বক্কর (রাঃ) আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশার কেন্দ্রে ছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে। অথচ মূর্খ ইচ্ছুক চিন্তাশীল ব্যক্তি

তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে এবং তারপর মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের ইচ্ছা পূরণের প্রত্যাশা করে।

মুসলমানদের জন্য এই দুটি মনোভাবকে বিভ্রান্ত না করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা একটি ইচ্ছাপূরণকারী চিন্তাবিদ হিসাবে বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু এড়াতে পারে কারণ এই ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বা পরের জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা এমন একজন কৃষকের মতো যে রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়, বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হয়, জমিতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারপরে একটি বিশাল ফসলের আশা করে। এটি সাধারণ মূর্খতা এবং এই কৃষকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যেখানে, প্রকৃত আশা হল একজন কৃষকের মত যে জমি প্রস্তুত করে, বীজ রোপণ করে, জমিতে জল দেয় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের একটি বিশাল ফসলের আশীর্বাদ করবেন। মূল পার্থক্য হল যে প্রকৃত আশার অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে। তার উপর। এবং যখনই তারা পিছলে যায় তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে না, বরং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করবে এবং তবুও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলে আশা করবেন।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মূল পার্থক্যটি শিখতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশা গ্রহণ করতে পারে, যা সর্বদা উভয় জগতেই ভাল এবং সাফল্য ছাড়া কিছুই নিয়ে যায় না। সহীহ বুখারী, ৭৪০৫ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ধরনের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা যা অতীতের জাতি এবং এমনকি মুসলিম জাতিকে প্রভাবিত করেছিল যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে এবং বিচারের দিনে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের রক্ষা করবে। জাহান্নাম থেকে। যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত একটি সত্য এবং অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজাহ, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়, এমনকি তাঁর সুপারিশে কিছু মুসলিমও কম নয়। এর দ্বারা যার শাস্তি লাঘব হবে তখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে একটি মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে প্রকৃত আশা গ্রহণ করা উচিত।

যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না তাদের শয়তান বিশ্বাস করে যে তারা সেই দিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে এই দাবি করে যে তারা এতটা খারাপ ছিল না কারণ তারা হত্যার মতো বড় অপরাধ এড়িয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করেছে যে তাদের আবেদন গৃহীত হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠানো হবে যদিও তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল। এটি অবিশ্বাস্যভাবে মূর্খ কারণ মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির সাথে আচরণ করবেন না যে তাকে বিশ্বাস করে এবং তার আনুগত্য করার চেষ্টা করে যে তাকে অবিশ্বাস করেছিল। একটি একক শ্লোক এই ধরণের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে মুছে দিয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

" আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্যকে দ্বীন হিসাবে চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

সত্যি কারের ভালোবাসা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের সময় আবু বক্করের পুত্র আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অমুসলিমদের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। বহু বছর পর, ইসলাম গ্রহণের পর, তিনি তার বাবাকে বলেছিলেন যে বদর যুদ্ধের সময়, তিনি তাকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তার হাত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, যদি সেদিন তার সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ থাকে, তাহলে সে করবে। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১২ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও তিনি তাঁর পুত্র ছিলেন, তবুও আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যকে সর্বোপরি সর্বোপরি রেখেছিলেন।

মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালোবাসার একটি নিদর্শন হল যে, কেউ পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাকে প্রাধান্য দেবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসসমূহকে প্রাধান্য দেবে। তার উপর, তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং মতামত উপর. অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 24:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমরা যে সম্পদ অর্জন করেছ, বাণিজ্য যাতে তোমরা পতনের আশঙ্কা কর, এবং যে বাসস্থানে তোমরা সন্তুষ্ট, তা তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করুন, অতঃপর অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ পালন করেন এবং আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের প্রতি ভালবাসার কারণে এই আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলির দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু যখন কেউ এসবের উপর ইসলামের আনুগত্য বেছে নেয়, তখন তা প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের ভালোবাসা। একজন সত্যিকারের প্রেমিক কেবল তাদের প্রিয়তমের আনুগত্য করতে এবং সর্বদা তাদের খুশি রাখতে চায়। এটা তখনই সম্ভব যখন একজন মুসলিম ইসলামের শিক্ষা মেনে চলে।

একটি করুণাময় আইন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের বিজয় লাভের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যুদ্ধবন্দীদের সাথে কি করবেন সে বিষয়ে তাঁর সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের অনেক অপরাধ ও যুদ্ধের জন্য তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পরামর্শ অপছন্দ করেন। তারপর আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাদের মৃত্যুদন্ড থেকে ক্ষমা করার পরামর্শ দেন এবং পরিবর্তে তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা ক্রয় করার অনুমতি দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উপদেশে সন্তুষ্ট হন এবং এর উপর আমল করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 305-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস জুড়ে, মুসলমানদেরকে অন্যদের প্রতি দয়ালু হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যারা সৃষ্টির প্রতি করুণা করে তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত করবেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, করুণা দেখানো শুধুমাত্র নিজের কাজের মাধ্যমে নয়, যেমন গরীবদের সম্পদ দান করা। এটি প্রকৃতপক্ষে একজনের জীবনের প্রতিটি দিক এবং অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন একজনের কথা। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছেন যারা দাতব্য দান করে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে যে তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে করুণা

দেখাতে ব্যর্থ হওয়া, যেমন অন্যদের প্রতি করা তাদের অনুগ্রহ গণনা করা, শুধুমাত্র তাদের পুরস্কার বাতিল করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

সত্যিকারের করুণা সব কিছুতে দেখানো হয়: একজনের মুখের অভিব্যক্তি, একজনের দৃষ্টি এবং তাদের কথার স্বর। এটি ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রদর্শিত সম্পূর্ণ করুণা, এবং তাই মুসলমানদের অবশ্যই কাজ করতে হবে।

উপরন্তু, করুণা প্রদর্শন করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও অগণিত সুন্দর ও মহৎ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তবুও যা মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রতি মানুষের হৃদয় ও ইসলাম ছিল রহমত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

এটা স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, করুণা ছাড়া মানুষ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পালিয়ে যেত। তার প্রতি যদি এমনই হয়, যদিও তার মধ্যে অগণিত সুন্দর বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদিও মুসলমানরা, যাদের মধ্যে এমন মহৎ বৈশিষ্ট্য নেই, তারা সত্যিকারের করুণা না দেখিয়ে অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি করে?

সহজ কথায়, মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেমন তারা আল্লাহ, মহান এবং অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা নিঃসন্দেহে সত্য এবং পূর্ণ করুণার সাথে।

মাইগ্রেশনের পর ৩ য় বছর

উহুদের যুদ্ধ

অসুবিধার মধ্যে বাধ্যতা

পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধে ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে উহুদ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত অমুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ফলাফল নির্বিশেষে উহুদ পর্বতের সামনে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড় জাবাল আল রুমায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধটি ছিল। ওভার এবং কমান্ড আর প্রয়োগ করা হয় না। তারা যখন জাবাল আল রুমায় নেমেছিল, তখন এটি মুসলিম সেনাবাহিনীর পিছনের অংশ উন্মোচিত করেছিল। অমুসলিম বাহিনী তখন একত্রিত হয়ে উভয় দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে অনেক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের দেহ অমুসলিমদের দ্বারা বিকৃত হয়ে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তারা অবগত হন যে মক্কার অমুসলিম নেতারা মদিনার দিকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন যাতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ইসলাম ভালোর জন্য। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাদের বেদনাদায়ক ক্ষত এবং ক্লান্ত শরীর সত্ত্বেও, অমুসলিমদের অনুসরণে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। যখন সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট,

ইতিবাচকভাবে সাড়া দিলেন, মহান আল্লাহ, অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 172 নাজিল করলেন:

"যারা [মুমিনদের] আঘাতের পর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সাড়া দিয়েছিল তারা আঘাত করেছিল। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 67-68-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ সত্তরজন সাহাবী স্বেচ্ছায় মক্কার অমুসলিমদের ধাওয়া দেন। এটি সহীহ মুসলিমের ৬২৪৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কেন তারা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যখন কেউ মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিস লাভের জন্য তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যখন তারা তাদের গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা প্রায়ই ক্ষুব্ধ হয় যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা বাস্তবে মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের বিরোধিতা করে।

যদিও, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, তবুও যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা এই আয়াতে উল্লেখিত মত হয়ে যেতে পারে। পরকালে নাজাত পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক উত্তম। এই ব্যক্তি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, কারণ তিনিই তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলমান, যদি আন্তরিক হয়, তবে সকল পরিস্থিতিতে অবিচল থাকবে এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় আশীর্বাদ দেওয়া হবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তি যে পার্থিব নিয়ামত লাভ করবে তার চেয়ে বেশি।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা জরুরী যাতে এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর

নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। , সব পরিস্থিতিতে।

কথোপকথন সম্মান

উমর ইবনে খাত্তাবের কন্যা হাফসাহ যখন বিধবা হয়ে যান, তখন তিনি উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে একটি সম্ভাব্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। পরেরটি যথাক্রমে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ সে বিয়ের জন্য সঠিক অবস্থানে ছিল না। উমর তখন আবু বক্করের সাথে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যিনি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেননি। পরবর্তীতে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন এবং আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন। আবু বক্কর তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ব্যাখ্যা করলেন যে, তিনি প্রথমে উত্তর দেননি কারণ তিনি জানতেন যে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই তথ্য প্রকাশের পরিবর্তে তিনি উত্তর না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 3261 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

অনেক লোকের বিপরীতে যারা তারা যা শোনেন তা নিয়ে কথা বলার অভ্যাস রয়েছে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ব্যক্তিগত কথোপকথনকে সম্মান করতেন।

সুনানে আবু দাউদ, 4992 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে অন্যের কাছে যা কিছু শোনে তার কথা বলাই তাদের পাপ করার জন্য যথেষ্ট।

এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, একজনকে প্রথমে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা শুধুমাত্র বৈধ বক্তৃতা শুনেছে কারণ সক্রিয়ভাবে এমন একটি কথোপকথনে অংশগ্রহণ করা যা পাপপূর্ণ বক্তৃতা জড়িত উভয় জগতে তাদের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। একজন মুসলিমের উচিত অনর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় বক্তৃতা যুক্ত কথোপকথন এড়ানোর চেষ্টা করা কারণ এটি প্রায়শই পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে পরিচালিত করে এবং এটি একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে তাদের জন্য একটি বড় আফসোস হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত যে তারা যা শুনেছে তা অন্যদের সাথে না বলে কারণ এটি সহজেই গীবত এবং অপবাদের দিকে নিয়ে যেতে পারে যা বড় পাপ। এটি প্রায়শই বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভেঙে যাওয়া এবং ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলমানের কেবলমাত্র তারা যা শুনেছে তা বর্ণনা করা উচিত যদি তারা পাপ এড়াতে পারে এবং যদি তথ্য অন্যদের জন্য উপকারী হয়। উপরন্তু, তারা যে তথ্য দেয় তা অবশ্যই যাচাই করা এবং খাঁটি হতে হবে কারণ যা যাচাই করা হয়নি তা পবিত্র কুরআনের আদেশের পরিপন্থী। যে মুসলমান মানুষের উপকার করতে চায় সে এইভাবে কাজ করে তাদের ক্ষতি করতে পারে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান কর, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"

যেমন একজন মুসলিম পছন্দ করেন না যে তারা যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন তার বেশিরভাগই অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, অন্যরা যা বলে তাও এইভাবে আচরণ করা উচিত নয়।

মাইগ্রেশনের পর ৪ র্থ বছর

প্রতিশোধ ভুলে যাওয়া

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর চতুর্থ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি অমুসলিম গোত্র বনু নাদিরকে পরিদর্শন করেন, যার কাছে তিনি পূর্বে অঙ্গীকার করেছিলেন। সহায়তা এবং শান্তির সাথে, আর্থিক সহায়তার জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য। তারা উত্তর দিয়েছিল যে গোপনে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করার সময় তারা তাকে সাহায্য করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিয়ে ঐশ্বরিক ওহী পেয়েছিলেন এবং তাদের মন্দ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পাওয়ার আগেই তিনি চলে যান এবং মদিনায় ফিরে আসেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তারপর বনু নাদিরদের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করেন যাতে তারা তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে এবং সুরক্ষা দেয়। মুনাফিকরা বনু নাদিরকে থাকার জন্য অনুরোধ করল এবং তাদের সমর্থন দিল। তারা দাবি করেছিল যে, যদি বনু নাদিররা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তবে তারা তাদের সমর্থন করবে, যদি বনু নাদির যুদ্ধ করে তবে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং যদি তাদের অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হয় তবে তারা তাদের সাথে চলে যাবে। তাদের এটি বনু নাদিরকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেছিল। শেষ পর্যন্ত মুনাফিকরা কিছুই করেনি যখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাদিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, বনু নাদিরকে অবরোধ করেন, তখন তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করেছিলেন যে তারা তাদের রক্তকে বাঁচিয়ে দিন এবং পরিবর্তে তাদের নিরাপদ পথ প্রদান করুন যাতে তারা তাদের জিনিসপত্র সহ এলাকাটি খালি করতে পারে। . বনু নাদিরদের বিরুদ্ধে তাদের মন্দ পরিকল্পনার প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদেরকে অস্ত্র

ব্যতীত যা কিছু বহন করতে পারে তা নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 100-101-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

"আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন একজন মুসলমানের তাই ধৈর্য ধরে রাখা উচিত, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়, তাদের পাপ ক্ষমা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, যাদের অন্যকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং সর্বদা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং বরং তাদের প্রতিটি ছোট-খাটো পাপ যাচাই করেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমা এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বদর

উহুদের যুদ্ধ ছেড়ে যাওয়ার আগে, অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ান পরের বছর বদরে আবার মিলিত হওয়ার জন্য দুই সেনাবাহিনীর জন্য নিয়োগের ঘোষণা দেন। সময় এলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় 1500 সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন এবং অমুসলিমদের জন্য অপেক্ষা করে বদরে শিবির স্থাপন করেন। অমুসলিম সেনাবাহিনীতে প্রায় 2000 সৈন্য ছিল কিন্তু বদর থেকে দূরে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন এবং যদিও তিনি নিজেই নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন, আবু সুফিয়ান সৈন্যদের মক্কায় ফিরে যেতে উৎসাহিত করেন। মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত হতে তারা ভীত হয়ে পড়ায় তারা তার কোন বিরোধিতা না করে মক্কায় ফিরে আসেন। সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, বদরে থেকে যান এবং কিছু লাভজনক ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। আট দিন পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্ময় ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বদর ত্যাগ করেন যা আরব জনগণের হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইমাম সাফি উর রহমানের দ্য সিলড নেক্টার, পৃষ্ঠা 306-307-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাদের দৃঢ়তার কারণে, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিজয় দান করেছিলেন যা সামরিক বিজয়ের চেয়ে সারা আরব জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

এটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের ভেতরের শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত

মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি

কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

মাইগ্রেশনের পর ৫ ম বছর

আহযাবের যুদ্ধ

একটি প্রস্থান

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনার ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দক/আহজাবের যুদ্ধ শুরু হয়। যখন তাদের আক্রমণের কথা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছায়, তখন সালমান আল ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে তিনি শত্রুদের মদিনার একমাত্র পাশে একটি বিশাল পরিখা খননের নির্দেশ দেন। থেকে সেনাবাহিনী আক্রমণ করতে পারে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে এবং পরকালের পুরস্কার অন্বেষণ করতে। তারা সবাই তার পাশাপাশি কাজ করেছে। শত্রু বাহিনী মদিনা ও পরিখার কাছাকাছি পৌঁছে ক্যাম্প স্থাপন করে। মদিনার মধ্যে একটি অমুসলিম উপজাতি, বনু কুরাইজা, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে শান্তি চুক্তি করেছিল, তাদের দুর্গগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল। একজন অমুসলিম অমুসলিম সেনাবাহিনী থেকে ভ্রমণ করে বনু কুরাইজার একজন নেতা কাব বিন আসাদকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার এবং পরিবর্তে অমুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। -মুসলিম বাহিনী এবং

সাহাবীদের উপর আক্রমণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মদিনার মধ্যে থেকে যুদ্ধ শুরু হয়. কাব বিন আসাদ তখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভেঙ্গে দেন এবং যে দলিলটি লেখা ছিল তা ছিঁড়ে ফেলেন। মদিনার বাইরে ও ভিতরে শত্রুরা থাকায় উদ্বেগ ও ভয় বেড়ে গেল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণ এই যুদ্ধ জুড়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রচন্ড বাতাস প্রেরণ করলেন। অমুসলিম বাহিনী যা তাদের শিবিরকে সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলে এবং তাদের বিভ্রান্তি ও দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত করে। আবহাওয়া তাদের বিপক্ষে থাকায় অমুসলিমরা স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারা সফলভাবে পরিখা ভেদ করে মদিনায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 154-155-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অমুসলিম সৈন্যবাহিনী চলে যাবার আগে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হুদাইফা বিন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শত্রু শিবির থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু তাকে এমন কিছু না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন যা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। আমার মুখোমুখি। শত্রু শিবিরে পৌঁছে তিনি অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করলেন। হুদাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ধনুক বোঝাই করে আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে দেওয়া আদেশের কথা মনে পড়লে তিনি তাঁর হাত আটকে রাখেন। তিনি গোপনে অমুসলিমদের একটি সভায় যোগ দিয়েছিলেন এবং নিশ্চিত করেছিলেন যে তারা তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ তাদের সরবরাহ শেষ হয়ে যাচ্ছিল, মহান আল্লাহ প্রেরিত বাতাস তাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং তারা মুসলমানদের খনন করা পরিখা ভেদ করতে পারেনি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী'র দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য নবী (সাঃ) এর ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 1383-1384-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা। এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও যা অনিবার্য এবং বিপর্যয়কর বলে মনে হয়, এই মহান ঘটনার মতো, একজন মুসলমানের সর্বদা মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রাখা উচিত। মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে, মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ঐশ্বরিক উপলব্ধি সীমাহীন। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রাখা, যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি তাদের শারীরিক পথপ্রদর্শকের দিকনির্দেশনাকে বিশ্বাস করে। একজন মুসলিমের মনোভাব যাই হোক না কেন, মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দ ঘটবে তাই অধৈর্যতা দেখানোর পরিবর্তে তাঁর প্রজ্ঞার উপর আস্থা রাখা উত্তম যা কেবলমাত্র আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়।

এছাড়াও, একজন ব্যক্তির জীবনের অগণিত উদাহরণগুলি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যখন একজন ব্যক্তি কিছু পাওয়ার পরে অনুশোচনা করতে চেয়েছিলেন। এবং যখন তারা কিছু ঘটতে অপছন্দ করে শুধুমাত্র পরে তাদের মন পরিবর্তন করার জন্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যেহেতু ভাগ্য মানুষের হাতের বাইরে, তাই মুসলমানদের জন্য জরুরী যে বিষয়গুলি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যদি তারা কঠিন থেকে মুক্তি পেতে চায়, যেমন, মহান আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা। ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তিনি একজন মুসলিমকে উভয় জগতের সমস্ত অসুবিধা থেকে রক্ষা করবেন। তাদের যা করতে হবে তা হল তাঁর আনুগত্য করা। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

যে জিনিসের নিয়ন্ত্রণে নেই তার অর্থ, ভাগ্যের উপর জোর দেওয়া এবং যে জিনিসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তার প্রতি উদাসীন থাকা, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আনুগত্য করা বোকামি।

বিশ্বাসঘাতকতা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনার ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দকের যুদ্ধ শুরু হয়। মহান আল্লাহ অমুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা তাদের শান্তি ও সমর্থনের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। খন্দকের যুদ্ধের সময় পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং এর পরিবর্তে অমুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজাকে অবরোধ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন। বনু কুরাইজা একজন সাহাবী সাদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিদ্ধান্তের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি হয়েছিল, যাকে তারা মুসলিম হওয়ার আগেই ভাল করে চিনতেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের রায়ের জন্য ডেকে পাঠালেন এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে বনু কুরাইজার সৈন্যদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এবং তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর ঘোষণা করলেন যে, তিনি মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 166-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য মৃত্যুদণ্ড একটি খুব সাধারণ রায়, এমনকি এই দিন এবং যুগেও। উপরন্তু, তাদের অপরাধ ছিল একক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, পুরো জনপদে ভরা। তাদের পরিবর্তে নির্বাসিত হলে তারা আবার মদিনার সাথে যুদ্ধ করত।

যারা তার দুর্বল বান্দাদের উপর অত্যাচার করে তাদের উপর মহান আল্লাহ প্রতিশোধ নেন কারণ তারা নিজেদের রক্ষা করার বা প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে মহান আল্লাহর বান্দাদের উপর অত্যাচার করবে না, বিশেষ করে যারা প্রতিরক্ষাহীন বলে মনে হয় বাস্তবে তাদের রক্ষাকর্তা এবং প্রতিশোধদাতা হলেন মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এবং বিশেষ করে বিচার দিবসে প্রতিশোধ নেবেন। তিনি অত্যাচারীকে তাদের সৎ কাজগুলো তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপ তাদের অত্যাচারীর কাছে স্থানান্তরিত করবেন। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে । এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই স্বর্গীয় নামের উপর কাজ করতে হবে তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার মাধ্যমে, যা তাদেরকে মহান আল্লাহর কঠোর আনুগত্যের অধীন করে মন্দের দিকে অনুপ্রাণিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। . এবং একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকা সমস্ত জিনিসের প্রতিশোধ নিতে হবে।

মাইগ্রেশনের পর ৬ ষ্ঠ বছর

আগুনের দুটি জিহ্বা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে তিনি একটি অভিযান প্রেরণ করেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুরা এই অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তাদের একটি দল তৃষ্ণা নিবারণের লক্ষ্যে একটি কূপ ঘিরে ফেলে। কূপের আশেপাশের এলাকা ঠাসাঠাসি হওয়ায় দুইজন সাহাবী, একজন মদীনার এবং অন্যজন মক্কার, তাদের সাথে সামান্য ঝগড়া হয়। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই এই সুযোগটি নিয়ে আরও বিঘ্ন ঘটানোর জন্য এই দাবি করে যে, মক্কার হিজরতকারীরা তাদের সমস্যা সৃষ্টি করছে। মক্কার হিজরতকারীদের মদিনায় চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য তিনি অন্যান্য মুনাফিকদের সমালোচনা করতে শুরু করেন। যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু নামক এক শিশু তার মন্দ কথা শুনে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়েছিল। আবদুল্লাহ বিন উবাইকে তলব করা হয়েছিল কিন্তু তিনি বড় শপথ নিয়েছিলেন যে তিনি কখনও এই শব্দগুলি বলেননি। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোন পদক্ষেপ নেননি। এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ, অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 7-8 অবতীর্ণ করেছেন:

"তারা তারা যারা বলে, "যারা আল্লাহর রসূলের সাথে আছে তাদের উপর ব্যয় করো না যতক্ষণ না তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।" আর নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আমানত আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা বোঝে না। তারা বলে, "যদি আমরা আল-মদীনায়

ফিরে আসি, [ক্ষমতার জন্য] যত বেশি সম্মানিত হবে, তত বেশি বিনয়ীকে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দেবে।" আর সম্মান আল্লাহর, তাঁর রসূলের এবং মুমিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা জানে না।"

এই আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর কান ধরে সান্ত্বনা দিয়ে মন্তব্য করলেন যে, তিনিই তাঁর কান মহান আল্লাহর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। . ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 213-215-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিমুখী হওয়া ভন্ডামির লক্ষণ। এই সেই ব্যক্তি যে তাদের আচরণ পরিবর্তন করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের খুশি করার জন্য যাতে কিছু পার্থিব জিনিস লাভ করার ইচ্ছা থাকে। তারা বিভিন্ন লোকেদের প্রতি তাদের সমর্থন দেখিয়ে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং তাদের প্রতি অপছন্দকে আশ্রয় করে। তারা লোকদের প্রতি আন্তরিক হতে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যদি তারা তাওবা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা পরকালে নিজেদেরকে আগুনের দুটি জিভ দিয়ে দেখতে পাবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4873 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 14:

"যখন তারা মুমিনদের সাথে দেখা করে, তখন তারা বলে: "আমরা ঈমান এনেছি" কিন্তু যখন তারা তাদের দুষ্ট সঙ্গীদের সাথে দেখা করে (গোপনে), তারা বলে: "নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি; আমরা নিছক ঠাট্টা করছিলাম।"

আয়েশা (রাঃ) বিনতে আবু বক্কর (রাঃ) এর অপবাদ

লেটিং থিংস গো

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ বনুদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। আল মুসতালিক। তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর সাথে ছিলেন। যাত্রার সময় মহিলারা একটি ছোট বগির ভিতরে বসতেন যা একটি উটের উপর স্থাপন করা হত। সেনাবাহিনী যখন আয়েশা (রা.) শিবির স্থাপন করেছিল, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন নিজেকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য চলে যান এবং ক্যাম্পে ফিরে আসেন। ফেরার সময় সে লক্ষ্য করল তার নেকলেস হারিয়ে গেছে। তারপরে তিনি এটি না পাওয়া পর্যন্ত তার পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করেছিলেন। যখন তিনি আবার ক্যাম্পে ফিরে আসেন তখন তিনি দেখতে পান যে তারা তাকে ছাড়াই চলে গেছে। এটি ঘটেছিল যখন একটি উটের উপর তার বগি স্থাপন এবং বেঁধে রাখার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা ধরে নিয়েছিল যে সে ইতিমধ্যে ভিতরে রয়েছে। সাফওয়ান বিন আল মুআত্তাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন সাহাবী তাকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি পরিত্যক্ত শিবিরের স্থানেই ছিলেন। তাকে সেনাবাহিনী থেকে পিছিয়ে যাওয়ার এবং ভ্রমণকারী সেনাবাহিনী থেকে অজান্তে পড়ে থাকা যে কোনও লাগেজ তুলে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি আয়েশাকে চিনতে পারলেন, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, যেমনটি তিনি তাকে দেখেছিলেন ইসলামে নারীদের পর্দা করা ফরজ হওয়ার আগে। তিনি সসম্মানে তাকে তার উটটি চড়ার প্রস্তাব দিলেন যখন তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন। যখন তারা সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছল তখন লোকেরা আয়েশাকে সাক্ষী করল, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ক্যাম্পে প্রবেশ করছেন। এই সুযোগে মুনাফিকরা তার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে এবং লোকেরা ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। আল্লাহর পরে, মহান, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই অপবাদ থেকে মুক্ত করেছেন, তাঁর পিতা

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করেছেন যে তিনি এই অপবাদ ছড়ানোয় অংশ নেওয়া তাঁর আত্মীয়কে আর আর্থিকভাবে সাহায্য করবেন না। মহান আল্লাহ, তারপর অধ্যায় 24 আন নুর, 22 নং আয়াত নাজিল করেছেন, তাকে এবং সমস্ত মুসলমানকে অন্যের ভুল ক্ষমা ও উপেক্ষা করতে উত্সাহিত করেছেন:

" আর তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল ও সম্পদশালী তারা যেন তাদের আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের [সাহায্য] না করার শপথ না করে এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এরপর আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘোষণা প্রত্যাহার করেন এবং তাঁর আত্মীয়কে সাহায্য করতে থাকেন। জামে আত তিরমিযী, 3180 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক

মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন।

সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া

একবার, জুমার খুতবার সময়, কিছু সাহাবী, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে চলে গেলেন, যখন তিনি মদীনায় আগত একটি বাণিজ্য কাফেলার দিকে প্রবণতার জন্য প্রচার করছিলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন। তারপর অধ্যায় 62 আল জুমুআ, আয়াত 11, অবতীর্ণ হয়:

"কিন্তু [একটি অনুষ্ঠানে] যখন তারা কোনো লেনদেন বা বিচ্যুতি দেখতে পেল তখন তারা সেখানে ছুটে গেল এবং আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেল। বল, "আল্লাহর কাছে যা আছে তা বিমুখতা ও লেনদেনের চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।"

এটি সহীহ মুসলিমের 2000 নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও এটি একটি পাপ কিছু কম ছিল না, এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঠিক আচরণের পরিপন্থী। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 62:

"মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যখন তারা তাঁর সাথে কোন সাধারণ স্বার্থের জন্য [সাক্ষাত] করে, তখন তার

অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত প্রস্থান করে না। প্রকৃতপক্ষে, যারা আপনার [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর অনুমতি চায়, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে। সুতরাং যখন তারা তাদের কোন বিষয়ে আপনার কাছে অনুমতি চায়, তখন তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন যে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকা উপকারী জ্ঞান বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে। এটি বাণিজ্য এবং বিমুখতার চেয়ে ভাল। এর অর্থ এই নয় যে একজনকে তাদের হালাল জীবিকা পরিত্যাগ করা উচিত, বরং তাদের উচিত ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার দিকে ঝুঁকে পড়ার সময় উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। এই পদ্ধতিতে আচরণ করলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে।

জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের চেয়ে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেবে তাকে তৃপ্তি দান করা হবে, তাদের বিষয়গুলি তাদের জন্য সংশোধন করা হবে এবং তারা পাবে। সহজ উপায়ে তাদের নির্ধারিত বিধান।

হাদিসের এই অর্ধেকটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, যেমন এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি পরিহার করে বৈধ উপায়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ প্রদান করাকে তৃপ্তি দেওয়া হবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ লোভী না হয়ে এবং আরও জাগতিক জিনিস পাওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়। বাস্তবে, যে ব্যক্তি যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট সে সত্যিকারের ধনী ব্যক্তি, যদিও

তাদের কাছে সামান্য সম্পদ থাকে যদিও তারা জিনিস থেকে স্বাধীন হয়। যে কোনো কিছুর স্বাধীনতাই একজনকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

তদতিরিক্ত, এই মনোভাব একজনকে তাদের জীবনে উদ্ভূত যে কোনও জাগতিক সমস্যাগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করার অনুমতি দেবে। এর কারণ হল বস্তুজগতের সাথে যত কম যোগাযোগ করে এবং পরকালের দিকে মনোনিবেশ করে তত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে। একজন ব্যক্তি যত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে তার জীবন তত বেশি আরামদায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে একটি ঘরের অধিকারী তার কাছে দশটি ঘরের অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় একটি ভাঙা কুকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম সমস্যা থাকবে। অবশেষে, এই ব্যক্তি সহজে এবং আনন্দের সাথে তাদের হালাল রিযিক প্রাপ্ত হবে. শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাদের রিযিকের মধ্যে এমন অনুগ্রহ স্থাপন করবেন যে এটি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আবৃত করবে, অর্থাত্ তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের সন্তুষ্ট করবে।

কিন্তু এই হাদিসের অন্য অর্ধেক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের চেয়ে বস্তুগত জগতকে প্রাধান্য দেয়, নিজের কর্তব্যকে অবহেলা করে বা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়াবাড়ির জন্য চেষ্টা করে, সে দেখতে পাবে যে, পার্থিব জিনিসের জন্য তাদের প্রয়োজন, অর্থ লোভ। কখনই সন্তুষ্ট হন না যা সংজ্ঞা দ্বারা তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারাদিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য জগতে যাবে এবং তারা অনেক পার্থিব দরজা খুলে দিয়েছে বলে তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তারা তাদের নির্ধারিত রিজিক কষ্টের সাথে পাবে এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি দেবে না এবং তাদের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে হবে না। এমনকি এটি তাদেরকে হারামের দিকে ঠেলে দিতে পারে যা শুধুমাত্র উভয় জগতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

অহংকার থেকে মুক্ত

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি অহংকারবশত তাদের পোশাক/নিম্ন জামা পিছনে টেনে নিয়ে যায়, শেষ বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেছেন যে, তার পোশাক মাঝে মাঝে অনিচ্ছাকৃতভাবে পিছলে পড়ে যায় (যেহেতু এটি ঢিলে ছিল) কিন্তু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অহংকার থেকে মুক্ত করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে তিনি এমন আচরণ করেননি। গর্ব আউট পদ্ধতি সহীহ বুখারী, ৩৬৬৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে গর্ব হল যখন একজন ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করে।

অহংকারী ব্যক্তির কোন পরিমাণ ভাল কাজ উপকারে আসবে না। যখন কেউ শয়তানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন সে গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তার অগণিত বছরের উপাসনা কীভাবে তাকে উপকৃত করেনি তা খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে অবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

“ আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।”

গর্বিত সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। গর্বিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর যদিও তারা তাদের নিজেদের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। এটা হল সরল অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সবকিছু সৃষ্টি ও দান করেছেন বলে কোনো কিছু দেখে গর্ব করা বোকামি। এমনকি একজন সৎকর্মও করে থাকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান ও শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে অহংকার করা যা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্বিত হয় যা তারা এমনকি তার মালিক বা বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার মহান আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি একাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকারবশত মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিৎ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। নম্ররা সত্যই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দ থেকে তারা সুরক্ষিত রয়েছে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য অহংকারের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে

বোকা বানানো উচিত নয় যে নম্রতা অসম্মানের দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহর নম্র বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

সম্পর্ক সংশোধন

একবার, উমর ইবনে খাত্তাবের সাথে বিবাদের পর, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উমর, প্রথমে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অস্বীকার করলে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করতে গেলেন। কিছুক্ষণ পর, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন এবং আবু বক্করকে খুঁজতে যান। অবশেষে তিনি তাকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পেলেন, যিনি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে বিরক্ত ছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনাবাসীকে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ক্ষতি না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, কারণ তিনি তার ইসলামের বার্তা সহজেই গ্রহণ করেছিলেন যেখানে অন্য সবাই বিভিন্ন মাত্রার দ্বিধা দেখিয়েছিলেন এবং তিনি সমর্থন করেছিলেন। তাকে নিজের এবং তার সম্পদের সাথে। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আবার কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হননি। সহীহ বুখারী, ৩৬৬১ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল যে আবু বক্কর এবং উমর উভয়ের মধ্যে বিবাদ হওয়ার পর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ না হয়ে দ্রুত তাদের সম্পর্ক সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করা আজকাল মুসলমানদের মধ্যে খুব ব্যাপক হয়ে উঠেছে, যদিও এটা স্পষ্টভাবে ইসলামের শিক্ষা এবং সাহাবায়ে কেরামের পথের বিরোধিতা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৩৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।

এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা পার্থিব কারণে অন্য মুসলমানদের পরিত্যাগ করে। ধর্মীয় কারণে কাউকে ত্যাগ করা বৈধ হলেও তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সদয়ভাবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করা অনেক বেশি উত্তম। এই আচরণ পাপীদেরকে তাদের পরিত্যাগ করার চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করতে উত্সাহিত করতে অনেক বেশি কার্যকর হবে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কারণ ঐক্য শক্তির দিকে নিয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ থাকায় তারা সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন না করা একটি কারণ যে সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের সাধারণ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে যদিও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মের পরিণতি

আবু বক্করের একবার অন্য একজন সাহাবী রাবীআ আল আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিবাদ হয়েছিল। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে কিছু কড়া কথা বললেন এবং তিনি যা করেছেন তার জন্য তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হলেন। যখন তিনি রাবিয়াকে অনুরোধ করলেন, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, যা ঘটেছিল তার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তার সাথে অনুরূপ কথা বলার জন্য, তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বিষয়টি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হলে তিনি রাবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দেন যে, তিনি তার পরিবর্তে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। বিন্দু পরের তাদের মিটিং কাঁদতে ছেড়ে. মুসনাদে আহমদ, 4/58-59-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও এটা স্পষ্ট ছিল যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি পাপপূর্ণ এবং নোংরা কথা বলেননি, কারণ এটি তাঁর প্রকৃতির বিরুদ্ধে ছিল, কম নয়, তিনি তার কঠোরতার জন্য অনুতপ্ত ছিলেন কারণ তিনি অন্যদের প্রতি অন্যায়ের পরিণতি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। , পরিণতি, যা মুসলিমরা প্রায়ই ভুলে যায়।

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলিমকে অবশ্যই ঈমানের দুটি দিক পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে জীবন থেকে দূরে রাখে এবং অন্যদের সম্পত্তি।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু মানুষ এতটা ক্ষমাশীল নয় একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা তাদের মূল্যবান নেক আমল কিয়ামতের দিন কেড়ে নিয়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে। এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে। তাই উভয় জগতে সফলতা লাভের জন্য মুসলমানদের জন্য তাদের কর্তব্যের উভয় দিক পালনে সচেষ্ট হওয়া জরুরী।

বরকতময় কাজ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তাদের মধ্যে কে রোজা রেখেছিলেন, কে সেদিন জানাজায় অংশ নিয়েছিলেন, কে সেদিন একজন মিসকিনকে খাওয়ালেন এবং কে দেখতে গেলেন? সেদিন একজন অসুস্থ ব্যক্তি। শুধুমাত্র আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন যে, তিনি সেদিন উল্লেখিত সমস্ত বরকতময় কাজ করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যার চরিত্রের মধ্যে এই আমলগুলো একত্রিত হবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটি সহীহ মুসলিম, 2374 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের অবশ্যই আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে, সর্বদা সাগ্রহে অনুসন্ধান ও সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং এ ব্যাপারে অলস না হওয়া।

সুনানে আন নাসাই, 2219 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, রোজা ব্যতীত সমস্ত সৎ কাজ নিজের জন্য করা হয় কারণ এটি মহান আল্লাহর জন্য এবং তিনি তা করবেন। সরাসরি পুরস্কৃত করুন।

এই হাদিসটি রোজার স্বতন্ত্রতা নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করার একটি কারণ হল অন্যান্য সমস্ত সৎ কাজ লোকেদের কাছে দৃশ্যমান, যেমন

নামায, বা সেগুলি মানুষের মধ্যে থাকে, যেমন গোপন দান। যদিও, উপবাস হল একটি অনন্য ধার্মিক কাজ কারণ অন্যরা জানতে পারে না যে কেউ শুধুমাত্র তাদের পালন করে উপবাস করছে।

উপরন্তু, রোজা একটি সৎ কাজ যা নিজের প্রতিটি দিকের উপর তালা লাগিয়ে দেয়। অর্থ, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে তাকে মৌখিক ও শারীরিক গুনাহ থেকে বিরত রাখা হবে, যেমন হারাম জিনিস দেখা ও শোনা। এটি প্রার্থনার মাধ্যমেও অর্জন করা হয় তবে প্রার্থনাটি কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য করা হয় এবং অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয় যেখানে, উপবাস সারা দিন ঘটে এবং অন্যদের কাছে অদৃশ্য। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

নিচের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে যে ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত ঈমানদার হবে না কারণ দুটি সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যদি কোনো মুসলমান বৈধ কারণ ছাড়া একটি ফরজ রোজা পূর্ণ না করে তবে সে রোজা পূরণ করতে পারবে না। সারাজীবন রোজা রাখলেও সওয়াব ও আশীর্বাদ হারিয়ে যায়।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াত দ্বারা নির্দেশিত রোজা সঠিকভাবে তাকওয়া বাড়ে. অর্থ, শুধু দিনের বেলায় ক্ষুধার্ত থাকা তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে না বরং গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকাজের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নম্বর হাদিসটিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা ও কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তাহলে রোজা তাৎপর্যপূর্ণ হবে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1690 নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস সতর্ক করে যে কিছু রোজাদারদের ক্ষুধা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। যখন কেউ মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ব্যাপারে আরও সচেতন ও সতর্ক হয়ে ওঠে, তখন তারা রোজা রাখে এই অভ্যাসটি শেষ পর্যন্ত তাদের প্রভাবিত করে যাতে তারা রোজা না থাকা সত্ত্বেও একই রকম আচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রকৃত তাকওয়া।

পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াতে উল্লিখিত ধার্মিকতা উপবাসের সাথে যুক্ত কারণ উপবাস একজনের মন্দ ইচ্ছা এবং আবেগকে হ্রাস করে। এটি অহংকার এবং পাপের উৎসাহ রোধ করে। কারণ রোজা পেটের ক্ষুধা ও শারীরিক কামনা-বাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই দুটি জিনিস অনেক গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, এই দুটি জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য হারাম জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। সুতরাং যে ব্যক্তি রোজার মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে সে দুর্বল মন্দ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর করবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে রোজার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। রোযার প্রথম এবং সর্বনিম্ন স্তর হল যখন কেউ এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে যা তার রোজা ভঙ্গ করে, যেমন খাবার। পরবর্তী স্তর হল পাপ থেকে বিরত থাকা যা একজনের রোযার ক্ষতি করে যার ফলে তার রোযার সওয়াব কমে যায়, যেমন মিথ্যা বলা। সুনানে আন নাসায়ী, 2235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জড়িত রোজা পরবর্তী স্তর। এটি হল যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ গুনাহ থেকে রোজা রাখে যেমন, চোখ হারামের দিকে তাকানো থেকে, কান হারামের কথা শোনা থেকে ইত্যাদি। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ রোজা না থাকা অবস্থায়ও এইভাবে আচরণ করে । পরিশেষে, সিয়ামের সর্বোচ্চ স্তর হল এমন সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত নয়।

একজন মুসলমানের অভ্যন্তরীণভাবে রোজা রাখা উচিত যেমন তাদের শরীর পাপ বা অসার চিন্তা থেকে বিরত থেকে বাহ্যিকভাবে রোজা রাখে। তাদের ইচ্ছার প্রতি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় অবিচল থেকে রোজা রাখা উচিত এবং তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা উচিত। উপরন্তু, তারা মহান আল্লাহর আদেশকে অভ্যন্তরীণভাবে চ্যালেঞ্জ করা থেকে রোজা রাখা উচিত, এবং এর পরিবর্তে ভাগ্য ছাড়া এবং যা কিছু আল্লাহকে জানার জন্য নিয়ে আসে, মহান আল্লাহ তায়ালা কেবলমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন যদিও তারা এই পছন্দগুলির পিছনে প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের রোজা গোপন রেখে সর্বোচ্চ সওয়াবের লক্ষ্য রাখা এবং অন্যদের না জানানো যদি তা পরিহার করা যায় কারণ অন্যদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জানানো সওয়াবের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কারণ এটি প্রদর্শনের একটি দিক।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী নেক আমল হল জানাজায় অংশগ্রহণ করা।

সহীহ বুখারী, 1240 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঁচটি অধিকারের তালিকাভুক্ত করেছেন একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের উপর।

এই অধিকারগুলির মধ্যে একটি হল যে একজন মুসলমান, যখনই সম্ভব, অন্য মুসলমানদের জানাজায় উপস্থিত হওয়া উচিত কারণ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অতএব, উপস্থিতি যত বেশি মুসলমান তত ভাল। যেমন একজন চায় যে অন্যরা তাদের জানাজায় অংশ নেবে এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করবে তাদেরও অন্যদের জন্য এটি করা উচিত। এই বিশেষ কাজটি একজন মুসলমানের জন্য একটি ভাল অনুস্মারক যে তারাও শেষ পর্যন্ত মারা যাবে। আশা করা যায়, এটি তাদের আচরণকে আরও ভালভাবে পরিবর্তন করবে যাতে তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবেলা করার মাধ্যমে তাদের নিজের মৃত্যুর জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত হতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে বর্ণিত পরবর্তী নেক আমল হল একজন মিসকীনকে খাওয়ানো।

মহান আল্লাহ মানুষকে তারা যা করে তাই দান করেন। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে কেউ যদি মহান আল্লাহকে স্মরণ করে তবে তিনি তাদের স্মরণ করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

"সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব..."

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে খাওয়ানো ঠিক একই রকম। যে ব্যক্তি এই নেক আমল করবে তাকে জান্নাতের খাবার খাওয়ানো হবে এবং যে অন্যকে পান করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাত থেকে পান করানো হবে। জামি আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইসলামের সর্বোত্তম ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 6236 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, অন্যকে খাওয়ানো এবং অন্যদেরকে সদয় কথা বলে অভিবাদন করা ইসলামের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য।

মুসলমানদের উচিত এই সৎ কাজের উপর কাজ করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং অন্যদের বিশেষ করে দরিদ্রদের নিয়মিত খাওয়ানোর চেষ্টা করা। এটি একটি আশ্চর্যজনক কাজ যার জন্য খুব বেশি সম্পদের প্রয়োজন হয় না।

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যকে খাওয়ানো, যদিও তা অর্ধেক খেজুর ফলই হয়, কারণ সহীহ বুখারি, 1417 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে এটি তাদের থেকে রক্ষা করবে। বিচার দিবসে জাহান্নামের আগুন। এটি মানুষকে এই সৎ কাজ থেকে বিরত থাকার কোন অজুহাত দেয় না।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে বর্ণিত চূড়ান্ত নেক আমল হল অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া।

সহীহ মুসলিম, 6551 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে মুসলিম অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় সে জান্নাতের বাগানে থাকে যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে।

সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, এই হাদিসটি ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদিও এটি নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ, একজন মুসলমানের জন্য প্রথমে এই সৎ কাজটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা জরুরী। যদি তারা অন্য কোন কারণে যেমন লোক দেখানোর জন্য এটি করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে না।

উপরন্তু, তাদের সওয়াব পাওয়ার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অসুস্থদের দেখতে যাওয়ার আদব ও শর্ত পূরণ করতে হবে। এতে তাদের বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়, অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের আত্মীয়দের সমস্যা সৃষ্টি করে। এই দিন এবং বয়সে অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করা সহজ হয় যাতে তারা উপযুক্ত সময়ে তাদের দেখতে যান কারণ একজন

অসুস্থ ব্যক্তি সারা দিন বিশ্রামে থাকবেন। তাদের উচিত তাদের কাজ এবং কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা পরচর্চা, গীবত করা এবং অন্যদের নিন্দা করার মতো সব ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকে। তাদের উচিত অসুস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্য ধরতে উৎসাহিত করা এবং এর সাথে সম্পর্কিত পুরষ্কারগুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং সাধারণত দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষেত্রে উপকারী বিষয়ে আলোচনা করা। যদি কেউ এইভাবে আচরণ করে তখনই তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত সওয়াব লাভ করবে। যদি তারা এতে ব্যর্থ হয় তবে তারা হয় কোন পুরষ্কার পাবে না বা তারা কীভাবে আচরণ করেছে তার উপর নির্ভর করে তাদের পাপের সাথে অবশিষ্ট থাকতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই সৎ কাজটি সম্পাদন করতে উপভোগ করে কিন্তু সঠিকভাবে এর শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

স্বর্গীয় পুল

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন যে, তিনি স্বর্গীয় পুকুরে (বিচার দিবসে) তাঁর সঙ্গী এবং গুহায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন। জামে আত তিরমিযী, ৩৬৭০ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বর্গীয় পুল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেওয়া হয়েছিল, মহান আল্লাহ তায়ালা, এবং বিচারের দিনে দেখা হবে। এমন অনেক হাদিস রয়েছে যা আকাশের পুল সম্পর্কে আলোচনা করে যেমন সহীহ বুখারি, 6579 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে এটির পুরো দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে এক মাস সময় লাগে, এর গন্ধ পারফিউমের চেয়ে সুন্দর, এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং একটি যে একবার তা পান করবে সে আর কখনো পিপাসা পাবে না। শেষ বিন্দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিচার দিবসে লোকেরা চরম এবং অকল্পনীয় তৃষ্ণা অনুভব করবে। যেমন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে যার কারণে মানুষ অতিরিক্ত ঘামবে। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে এই পুকুর থেকে পান করতে চায়। কিন্তু এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমানের উচিত কেবল এটি অর্জনের আশা না করে নিজেকে এটি থেকে পান করার যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়।

উপরন্তু, মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতে হবে, বিশেষ করে সেই সমস্ত জিনিস যা মানুষকে স্বর্গীয় পুকুরে পৌঁছাতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 5996 নম্বর, সতর্ক করে যে কিছু মুসলিম যারা ইসলামে খারাপ জিনিস উদ্ভাবন করেছে তাদের আটক করা হবে এবং স্বর্গীয় পুকুরে পৌঁছাতে বাধা দেওয়া হবে। সুনান আন নাসাইতে পাওয়া আরেকটি হাদিস, 4212 নম্বর, সতর্ক করে যে যারা অন্যায়কারী শাসকদের মিথ্যা ও ভুল কাজকে সমর্থন করে এবং বিশ্বাস করে তারা স্বর্গীয় পুকুরে পৌঁছাবে না। সুতরাং, যারা স্বর্গীয় জলাশয় পর্যন্ত পৌঁছতে এবং পান করতে ইচ্ছুক মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এড়াতে এবং তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য ভালোবাসা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে, যার জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীর নাম রেখেছিলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে পুরুষদের মধ্যে কে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং তিনি তার পিতার নাম রাখলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। সহীহ বুখারী, ৩৬৬২ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আজকাল অধিকাংশ লোকের বিপরীতে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর আন্তরিকতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কারণে হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসতেন। অর্থ, তার ভালবাসা ছিল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, পার্থিব কারণের জন্য নয়।

সহীহ মুসলিম, 6548 নম্বরে পাওয়া একটি খোদায়ী হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালবাসতেন এমন দু'জনকে ছায়া দেবেন। বিচার এর দিন।

মহান আল্লাহ এই দুই ব্যক্তিকে ছায়া দিবেন যেদিন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। জামে আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মকালে মানুষ যদি সূর্যের তাপ মোকাবেলা করতে কষ্ট করে তাহলে বিচার দিবসে তাপের তীব্রতা কল্পনা করা যায় কি?

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা এমন পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায় কারণ এই আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। আর যে ব্যক্তি এটি নিয়ন্ত্রণে ধন্য হবে সে ইসলামের দায়িত্ব সরাসরি পালন করতে পারবে। এই দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই কারণেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসাকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা ভালো তা কামনা করা। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যদের আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিজের উপায় অনুসারে সমর্থন করা। একজন অন্যের জন্য যে অনুগ্রহ করে তা গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং তাদের অকৃত্রিমতাও প্রমাণ করে কারণ তারা শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালোবাসা, যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে শুধু কথার মাধ্যমে নয়। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত মুমিন হওয়ার একটি দিক।

সম্পদ উপার্জনের গুরুত্ব

যদিও আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, বেশিরভাগই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে থেকেছিলেন, তবুও এটি তাকে ব্যবসার খাতিরে ভ্রমণে বাধা দেয়নি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 173-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি একজনের বৈধ বিধানের জন্য প্রচেষ্টা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারী, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কেউ নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কিছু খায়নি।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য অলসতাকে বিভ্রান্ত না করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান একটি বৈধ পেশা থেকে দূরে সরে যায়, সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করে এবং মসজিদে বসবাস করে এবং দাবি করে যে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাদের ভরণ-পোষণের জন্য। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর মোটেই ভরসা নয়। এটা শুধুমাত্র অলসতা যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা হল, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ, মহান ব্যক্তিকে তার শারীরিক শক্তির মতো মাধ্যম ব্যবহার করা এবং তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করা। , মহান, এই

মাধ্যমে তাদের বৈধ সম্পদ প্রদান করবে. মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার লক্ষ্য হল, তাঁর সৃষ্ট উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা নয়, কারণ এটি তাদের অকেজো করে দেবে এবং মহান আল্লাহ্‌ অকার্যকর জিনিস সৃষ্টি করেন না। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উদ্দেশ্য হল সন্দেহজনক বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত রাখা। একজন মুসলিম হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের বিধান যা সম্পদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এই বরাদ্দ পরিবর্তন করা যাবে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল হালাল উপায়ে তা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। এটি সহীহ বুখারি, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলি ব্যবহার করা, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক, কারণ তিনি তাদের এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তাই একজন মুসলিমের উচিত হবে অলস হওয়া উচিত নয় যখন তারা তাদের নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে হালাল সম্পদ উপার্জনের উপায় এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রদত্ত উপায়ের মাধ্যমে সামাজিক সুবিধা লাভের মাধ্যমে মহান আল্লাহর উপর আস্থার দাবি করে।

হুদাইবিয়ার চুক্তি

ফরওয়ার্ড টিপুন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন, আল্লাহ তাদের কি করবেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দেন যে, যেহেতু তারা মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করছে না তাদের মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং যদি তাদের সেখানে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয় তবে তারা আত্মরক্ষায় যুদ্ধ করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সহীহ বুখারী, ২৭৩১-২৭৩২ নম্বরে এবং ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ১২৫-১২৬ পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি মুসলমানদের শেখায় যে যখনই তারা কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখনই তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, এই বিশ্বাসে যে তিনি তাদের এ থেকে মুক্তির পথ প্রদান করবেন যদিও সেই সময়ে এটি অসম্ভব বলে মনে হয়। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

একজন মুসলিমের বোঝা উচিত যে, আল্লাহ, মহান, তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন, যদিও অসুবিধার পিছনের জ্ঞানগুলি স্পষ্ট না হয়। এটি একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া যা হয় আশীর্বাদ বা মহান আল্লাহর ক্রোধের দিকে পরিচালিত করে। একজনকে কেবল তাদের নিজের জীবনের অগণিত উদাহরণগুলির প্রতিফলন করতে হবে যেখানে তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু খারাপ ছিল শুধুমাত্র পরে তাদের মন পরিবর্তন করার জন্য এবং এর বিপরীতে। এটি ঠিক এমনই হয় যখন একজন ব্যক্তি ডাক্তার দ্বারা নির্ধারিত তেতো ওষুধ খান। যদিও ওষুধটি তিক্ত হলেও তারা এটি গ্রহণ করে বিশ্বাস করে যে এটি তাদের উপকার করবে। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে একজন মুসলমান কীভাবে একজন ডাক্তারকে বিশ্বাস করতে পারে যার জ্ঞান সীমিত এবং যিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত নন যে তিক্ত ওষুধ তাদের উপকার করবে এবং মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হবে, যার জ্ঞান অসীম এবং যখন তিনি কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম নির্ধারণ করেন।

একজন মুসলিমের উচিত ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং মহান আল্লাহর উপর আস্থার মধ্যে পার্থক্য বোঝা। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে না, এবং তারপর তার কাছে তাদের সাহায্যের আশা করে সে একজন ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল। যিনি মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ করবেন, যা এই মহান ঘটনায় ইঙ্গিত করা হয়েছে, তিনি সেই ব্যক্তি যিনি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করেন, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। ধৈর্য ধরুন এবং তারপরে তাঁর পছন্দের অভিযোগ বা প্রশ্ন না করে তাঁর রায়ে বিশ্বাস করুন।

বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) তখন দলটিকে মক্কায় একটি বিকল্প রাস্তা নিতে নির্দেশ দেন যা ছিল রুক্ষ এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। অবশেষে, যখন তারা হুদাইবিয়ার নিকটে পৌঁছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উটটি বসল এবং আর যেতে অস্বীকার করল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে এই এলাকার মধ্যে থাকাই তাদের জন্য সর্বোত্তম। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে মক্কার অমুসলিম নেতারা সেদিন তাঁর কাছ থেকে যা অনুরোধ করবেন তা তিনি গ্রহণ করবেন যতক্ষণ না তা মহান আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী না হয়। . মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বলার জন্য এবং মক্কায় আসার জন্য তাঁর উদ্দেশ্য নির্ণয় করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। মক্কার অমুসলিম নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন উরওয়া বিন মাসউদ। সাহাবীদের সাক্ষ্য দেওয়ার পর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, এবং তারা গোত্র, জাতি এবং সামাজিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে কতটা বৈচিত্র্যময় ছিল, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে যদি মক্কার অমুসলিমরা তাদের সাহাবীদের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, পালিয়ে যাবে উরওয়া বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র লোকেরা যারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে থাকবে এবং যুদ্ধ করবে তারাই হবে তার নিজের গোত্রের লোকেরা। তিনি এবং আরও অনেকে এটি বিশ্বাস করেছিলেন কারণ উপজাতীয় সংযুক্তি তাদের কাছে সবকিছু বোঝায়। উরওয়ার চিন্তাভাবনা শোনার পর, আবু বক্কর

রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তিরস্কার করলেন এবং স্পষ্ট করে দিলেন যে, কোন সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, কখনোই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিত্যাগ করবেন না। এটি ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 226-এ আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারি, 2731-2732 নম্বরে পাওয়া হাদিসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে একসময় তাদের দৃঢ় সংযোগ হারায়। এর অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি। এটি সাধারণত জানা যায় যে যখন একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন ভবনটি সময়ের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এমনকি ধসে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষকে সংযুক্ত করার বন্ধনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যকার বন্ধনগুলি অবশেষে দুর্বল বা এমনকি ভেঙ্গে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন। যেখানে, বেশিরভাগ মুসলমান আজ উপজাতীয়তা, ভ্রাতৃত্বের জন্য এবং অন্যান্য পরিবারকে দেখানোর জন্য লোকদের একত্রিত করে। যদিও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগকারী বন্ধনের ভিত্তি ছিল যথার্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন শক্তিশালী থেকে শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও আজকাল অনেক মুসলমান রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সময়ের সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যদি তাদের বন্ধন টিকে থাকার এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জনের ইচ্ছা থাকে তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল মানুষ কেবল

একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং একসাথে এমনভাবে কাজ করে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

রিদওয়ানের অঙ্গীকার

দাসত্বের অঙ্গীকার

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপনের পর, মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বলার জন্য পাঠান, যাতে তার মক্কায় আসার উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার অমুসলিম নেতাদের কাছে তাঁর দূত হিসেবে তাঁর শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বার্তাটি দেওয়ার পর তাকে মক্কার অমুসলিমরা আটক করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়েছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তারা মক্কা ত্যাগ করবেন না, কারণ তিনি কেবল নিরস্ত্র অবস্থায়ই মক্কায় প্রবেশ করেননি বরং মহানবী (সা.)-এর দূত হিসেবেও প্রবেশ করেছিলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাষ্ট্রদূতদের সবসময় সম্মানের সাথে আচরণ করা হয় এবং তাদের ক্ষতি করা যুদ্ধ ঘোষণা। এই দিন এবং যুগেও এটি সত্য। অঙ্গীকারের সময় মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক

হাত অন্য হাতে রেখে মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর হাতটি উসমান (রা.)-এর হাতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার। মহিমান্বিত, এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই বিষয়ে, মহান আল্লাহ অসংখ্য আয়াত নাযিল করেছেন, যেমন অধ্যায় 48 আল ফাত, আয়াত 10:

"নিশ্চয়ই, যারা আপনার কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে, তারা আসলে আল্লাহর কাছে আনুগত্য করছে। তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত। সুতরাং যে তার কথা ভঙ্গ করে সে কেবল নিজেরই ক্ষতির জন্য তা ভঙ্গ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে, তিনি তাকে মহাপুরস্কার দেবেন।

এবং অধ্যায় 48 আল ফাত, আয়াত 18:

"*নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল এবং তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জানতেন, তাই তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং তাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়ের পুরস্কৃত করেছেন।*"

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 227-228 এবং সহীহ বুখারি, 4066 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর সাথে তারা যে অঙ্গীকার করেছিল তা পূরণ করা মানবতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা পবিত্র কুরআনের 7 অধ্যায় আল আরাফের 172 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানদের থেকে - তাদের কোমর থেকে - তাদের বংশধরদের নিয়েছিলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে বলেছিলেন], "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি। [এটি] - পাছে কেয়ামতের দিন আপনি বলতে না পারেন, "নিশ্চয়ই আমরা এ সম্পর্কে বেখবর ছিলাম।"

সমস্ত মানুষকে উদ্‌ভূত করা হয়েছিল যাতে তারা মহান আল্লাহর কাছে এই অঙ্গীকার নিতে পারে। এই ঘটনার পিছনে যে শিক্ষা রয়েছে তা হল, সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসেবে মেনে নিয়েছিল। অর্থ, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের টিকিয়ে রেখেছেন এবং যিনি বিচার দিবসে তাদের কর্মের বিচার করবেন। মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এই অঙ্গীকার পূরণ করা সকল মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। .

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করেননি যে তারা তার বান্দা কিনা, বরং তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি তাদের প্রভু কিনা। এটি একটি ইঙ্গিত যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা সর্বদা একজন ব্যক্তির ইচ্ছা ও ইচ্ছার আগে আসা উচিত। যদি একজন মুসলমানের আল্লাহ, মহান বা অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার মধ্যে একটি পছন্দ থাকে তবে এই অঙ্গীকারটি তাদের মনে করিয়ে দেবে যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি সবার আগে আসতে হবে।

এই প্রশ্নটিও মহান আল্লাহর অসীম রহমতের ইঙ্গিত, কারণ তিনি সৃষ্টির প্রতি উত্তরের ইঙ্গিত দিয়েছেন শব্দের মাধ্যমে। এটি মুসলমানদেরকে দেখায় যে যদিও আল্লাহ, মহান, প্রভু যিনি তাদের কাজের বিচার করবেন, তিনি অসীম দয়ালুও।

এই চুক্তির প্রভাব সমস্ত মানবজাতির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতিরই ইঙ্গিত সহীহ মুসলিমের ৬৭৫৫ নম্বর হাদিসে পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের জন্য আগে থেকে মন স্থির করে সত্যের সন্ধান না করে প্রমাণের সন্ধান করা জরুরি। যা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে সমর্থন করে। শুধুমাত্র তারাই যারা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাদের মন খোলে তারা এই চুক্তিটি আনলক করবে যা তাদের হৃদয়ের গভীরে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, শুধুমাত্র বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয় সমস্ত বিষয়ে খোলা মন থাকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে সত্য এবং সর্বোত্তম পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করে। এই মনোভাব সমাজকে শক্তিশালী করে এবং সর্বদা মানুষের মধ্যে শান্তিকে উৎসাহিত করে। কিন্তু যারা তাদের পছন্দগুলি পূর্বনির্ধারণ করে তাদের একগুঁয়েমি সর্বদা একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে কীলক তৈরি করবে যা জাতীয় স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। মুসলমানদের জন্য এটা জরুরী যে তারা সবসময় জাগতিক বিষয়ে সঠিক বলে বিশ্বাস না করা অন্যথায় তারা এই একগুঁয়ে মনোভাব গ্রহণ করবে। এটি তাদের অন্যের মতামত গ্রহণ করতে বাধা দেবে যা তর্ক, শত্রুতা এবং সম্পর্ক ভাঙার দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, এই মনোভাব যেকোন মূল্যে পরিহার করা উচিত।

পরিশেষে, এই চুক্তিটি যে একজন ব্যক্তির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে তা ইঙ্গিত করে যে এটি উন্মোচন করা মুসলমানদের কর্তব্য। এটি একজনকে বিশ্বাসের নিশ্চিততার দিকে নিয়ে যাবে যা শোনার অর্থের উপর ভিত্তি করে

বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, একজনের পরিবারের দ্বারা বলা হয় যে তারা একজন মুসলিম। বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজন মুসলমানকে তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের সময় এই পৃথিবীতে সফলভাবে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে দেয়। একজন শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে পরীক্ষা এবং তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ হয়। ঈমানের নিশ্চিততা কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

সন্দেহ হলে দৃঢ় থাকা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপনের পর মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলার জন্য এবং মক্কায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পাঠান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। কিছু ঘটনার পর অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতারা সুহাইল বিন আমরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, যাতে তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করা যায় তবে কিছু শর্ত স্থির করা হয়। যার মধ্যে একটি ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে বছর সফর (ওমরা) করবেন না এবং তার পরিবর্তে তিনি পরের বছর ফিরে আসবেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, অন্যান্য অনেক সাহাবীর মতো, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ তারা বাহ্যিকভাবে মক্কার অমুসলিমদের পক্ষপাতী বলে মনে হয়েছিল। তাই তিনি এ বিষয়ে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কথা বললেন এবং তিনি তাঁকে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের উপর অটল থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করেন এবং পরবর্তীতে ঘোষণা করেন যে তিনি মহান আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করবেন না এবং তিনি কখনও তাঁর মিশনে যেতে দেবেন না। ব্যর্থ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমরকে ঠিক একই জবাব দিয়েছিলেন যেমনটি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 228-229-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উত্তর এবং মনোভাব তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের ইঙ্গিত দেয়। ঈমানের নিশ্চিততা অর্জনের জন্য মুসলমানদের অবশ্যই তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে এবং ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, কারণ এটি একজনকে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের পথে বড় বাধা হল ঈমানের দুর্বলতা। এটি একটি দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়, যেমন নিজের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া, অন্যকে ভয় করা, মানুষের আনুগত্যকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপরে রাখা, এর জন্য চেষ্টা না করে ক্ষমার আশা করা এবং অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত। বৈশিষ্ট্য ঈমানের দূর্বলতার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা হল যে এটি একজনকে পাপ করতে দেয়, যেমন ফরজ কর্তব্যে অবহেলা করা। ঈমানের দুর্বলতার মূল কারণ ইসলামের অজ্ঞতা।

ঈমানকে মজবুত করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। সময়ের সাথে সাথে তারা অবশেষে বিশ্বাসের নিশ্চিততায় পৌঁছে যাবে যা এত শক্তিশালী যে এটি একজন ব্যক্তিকে সমস্ত পরীক্ষা এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে রক্ষা করে এবং নিশ্চিত করে যে তারা তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দায়িত্ব পালন করে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস অধ্যয়ন করলে এই জ্ঞান পাওয়া যায়। বিশেষ করে, যে শিক্ষাগুলো আনুগত্যকারীদের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং যারা মহান আল্লাহর অবাধ্য তাদের জন্য শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করে। এটি একজন মুসলমানের হৃদয়ে শাস্তির ভয় এবং পুরস্কারের আশা তৈরি করে যা মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে টান ও ধাক্কা দেওয়ার প্রক্রিয়ার মতো কাজ করে।

স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্টির উপর প্রতিফলন করে কেউ তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে। সঠিকভাবে করা হলে এটি স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্ব, মহান এবং তাঁর অসীম ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মুসলমান রাত ও দিন নিয়ে চিন্তা করে এবং তারা কতটা নিখুঁতভাবে সুসংগত হয় এবং তাদের সাথে যুক্ত অন্যান্য জিনিসগুলি তারা সত্যই বিশ্বাস করবে যে এটি কোনও এলোমেলো জিনিস নয় যার অর্থ, একটি শক্তি রয়েছে যা নিশ্চিত করে যে সবকিছু ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে। এটি মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা। উপরন্তু, যদি কেউ রাত এবং দিনের নিখুঁত সময় নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে একমাত্র আল্লাহ, মহান আল্লাহ। একাধিক ঈশ্বর থাকলে প্রত্যেক ঈশ্বরই রাত ও দিন তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটতে চান। এটি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলতার দিকে পরিচালিত করবে কারণ একজন ঈশ্বর সূর্যের উদয় হতে চাইতে পারেন যেখানে অন্য ঈশ্বর রাত্রি অব্যাহত রাখতে চান। মহাবিশ্বের মধ্যে পাওয়া নিখুঁত নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, নাম আল্লাহ, মহান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

আরেকটি জিনিস যা একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে তা হল সৎকর্মে অবিচল থাকা এবং সমস্ত পাপ থেকে বিরত থাকা। বিশ্বাস যেহেতু কর্ম দ্বারা সমর্থিত বিশ্বাস তাই পাপ সংঘটিত হলে এটি দুর্বল হয়ে যায় এবং যখন ভাল কাজ করা হয় তখন তা শক্তিশালী হয়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সুনানে আন নাসাই, 5662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মুসলিম যখন মদ পান করে তখন সে বিশ্বাসী হয় না।

একটি পরিষ্কার বিজয়

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপনের পর মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলার জন্য এবং মক্কায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পাঠান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। কিছু ঘটনার পর অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দ সুহাইল বিন আমরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করার জন্য কিন্তু কিছু শর্ত স্থির করেন যার সবগুলোই বাহ্যিকভাবে অ-মুসলিমদের পক্ষে ছিল বলে মনে হয়। মক্কার মুসলমান। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ, তাদের উপর সন্তুষ্ট, চুক্তির অংশ ছিল (ওমরা) না করেই মদিনায় ফিরে আসেন। দশ বছরের শান্তির এই চুক্তি বাস্তবে মুসলমানদের পক্ষে ছিল। এই চুক্তির আগে যখনই মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে মিলিত হতো তখন প্রায়ই কোনো না কোনো যুদ্ধ হতো কিন্তু চুক্তির কারণে যুদ্ধ শেষ হলে যখনই এই লোকেরা মিলিত হতো তারা কেবল কথা বলতো। অমুসলিমদের কাছে ইসলামের ব্যাখ্যা দিলে তারা তা গ্রহণ করতে শুরু করে। ইসলাম তার আগমনের পরের আগের বছরগুলোর তুলনায় পরবর্তী দুই বছরে অনেক বেশি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। এই সুস্পষ্ট বিজয় মহান আল্লাহ কর্তৃক স্বীকৃত ছিল, যিনি চুক্তি স্বাক্ষরের পর অধ্যায় 48 আল-ফাত প্রকাশ করেছিলেন। অধ্যায় 48 আল ফাতহ, আয়াত 1:

"নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়"

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 231-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বহু বছর পর, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন যে, ইসলামে হুদাইবিয়ার চুক্তির চেয়ে বড় কোন বিজয় নেই। যদিও মানুষ তখন এর সুফল উপলব্ধি করতে পারেনি, তবুও তাদের অদূরদর্শিতার কারণে মহান আল্লাহ ইসলামের জন্য পর্যায়ক্রমে বিজয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, বিদায়ী পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় তিনি সুহায়ল বিন আমর (রা.)-এর ভক্তি ও আনুগত্য দেখেছিলেন, যিনি শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যদিও হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় তিনি হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিরোধিতা করেছিলেন। তার উপর হতে আবু বক্কর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন, তারপরে তার ইসলাম গ্রহণের জন্য এবং মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহ, ইসলাম দান করার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করেন।

এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে দেওয়া হয়েছিল, কারণ তারা সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেছিলেন। সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের শক্তি কমেছে। প্রতিটি মুসলমান তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে বিশ্বাস করে এবং সন্দেহ করে যে এটি তাদের বিশ্বাস হারাতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য লাভের চাবিকাঠি দিয়েছেন যা সারা বিশ্বে মুসলিমরা যে দুর্বলতা ও শোক অনুভব করছে তা দূর করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

" সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে যদি তোমরা [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উভয় জগতে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য অর্জনের জন্য মুসলমানদেরকে প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে। প্রকৃত বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন অন্যের জন্য ভালোবাসা, যা নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য একজনকে ইসলামিক শিক্ষা ও আমল করতে হবে। শিক্ষা এই মনোভাবের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আর মুসলমানরা যদি তা অর্জন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই এই সঠিকভাবে পরিচালিত মনোভাবের দিকে ফিরে আসতে হবে। যেহেতু মুসলমানরা পবিত্র কোরআনে বিশ্বাস করে তাদের উচিত এই সহজ শিক্ষাটি বোঝা এবং এর উপর আমল করা।

মন্দ চক্রান্ত ব্যর্থ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপনের পর, মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বলার জন্য পাঠান, যাতে তার মক্কায় আসার উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। কিছু ঘটনার পর, অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতারা সুহাইল বিন আমরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, তাঁর সাথে সন্ধি করার জন্য কিন্তু কিছু শর্ত স্থির করেন, যার সবগুলোই বাহ্যিকভাবে অনুগ্রহ করে বলে মনে হয়। মক্কার অমুসলিমরা। যার একটি ছিল মক্কা থেকে ইসলাম গ্রহণকারী কেউ মদিনায় পালিয়ে গেলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গেলে তাদের মদিনায় ফেরত পাঠানো হবে না। এটা স্পষ্ট ছিল যে মক্কার অমুসলিমরা শুধুমাত্র এই দাবি করেছিল কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে এটি তাদের ঐক্য ভেঙে মুসলিম জাতিকে দুর্বল করবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মদিনায় ফিরে আসেন। একজন সাহাবী, আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার বন্দীদশা থেকে রক্ষা পেয়ে মদিনায় পালিয়ে যান। মক্কার অমুসলিম নেতারা মদিনা থেকে আবু বাসির (রাঃ) কে উদ্ধার করার জন্য দু'জন লোককে পাঠিয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তিকে সম্মান জানিয়ে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর জন্য হস্তান্তর করেন। মক্কায় ফেরার পথে আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু পালিয়ে যান এবং অবশেষে মদীনা ও মক্কা থেকে দূরে অন্য এক নির্জন এলাকায় পালিয়ে যান। এই ঘটনার পর, যখনই কোন সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মক্কায় তাদের কারাগার থেকে পালিয়ে যান, তখনই

তারা আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যোগ দেন। তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে শেষ পর্যন্ত তারা মক্কার অমুসলিম নেতাদের বণিক কাফেলাকে লুটপাট করতে শুরু করে, কারণ শান্তি চুক্তিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, শুধুমাত্র মদিনার নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এতে মক্কাবাসীদের জন্য মারাত্মক আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়। তারা অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে একটি বার্তা পাঠান, তাঁর কাছে আবূ বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর বাহিনীকে মদিনায় ডাকার জন্য অনুরোধ করেন যাতে অভিযান ও লুটপাট বন্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মত হন এবং এই ব্যক্তিরা শান্তিপূর্ণভাবে মদিনায় হিজরত করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 240-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজনের কখনই একটি মন্দ কাজ করার ষড়যন্ত্র করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপর পাল্টা আঘাত করবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী বিশ্বে বিলম্বিত হয় তবে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের মুখোমুখি হবে। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর ভালোবাসা, সম্মান ও স্নেহ কামনা করে তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের ষড়যন্ত্র তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 18:

“এবং তারা তার শার্টের উপর মিথ্যা রক্ত নিয়ে এসেছিল। [জ্যাকব] বললেন, "বরং, তোমার আত্মা তোমাকে কিছুতে প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্য্য সবচেয়ে উপযুক্ত..."

একজন যত বেশি মন্দ ষড়যন্ত্র করবে, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের ইচ্ছা অর্জন করে, মহান আল্লাহ, তারা যে জিনিসটি চেয়েছিলেন তা উভয় জগতে তাদের

জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবেন যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?

মাইগ্রেশনের পর ৭ ম বছর

খায়বারের যুদ্ধ

পরামর্শ গ্রহণ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর সপ্তম বছরে তাকে মদিনার নিকটবর্তী খায়বারে বসবাসকারী একটি অমুসলিম উপজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মক্কার অমুসলিম নেতাদের সাথে ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের যে শান্তিচুক্তি ছিল তা তারা অবিরাম ভঙ্গ করার কারণে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। খায়বার অবরোধের সময় কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, খায়বারবাসীদের কিছু ফল ধারণকারী গাছ কেটে ফেলার অনুমতি চাইলেন, যাতে তাদের আত্মা ভেঙ্গে যায়। কিছু গাছ কোরবানি গ্রহণযোগ্য বলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মত হন। শত্রুর চেতনা ভাঙলে উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা কমবে। অর্থ, কিছু গাছ সংরক্ষণের চেয়ে মানুষের জীবন রক্ষা করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু যা ঘটছিল তা প্রত্যক্ষ করার পর, তারপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুরোধ করলেন, ভবিষ্যতের জন্য অবশিষ্ট ফল-বহনকারী গাছগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য তাঁর সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে দিতে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন এবং যথাযথ নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ তাদের শত্রুর চেতনা ভাঙার প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ১৩২-১৩৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের উচিত তাদের বিষয়ে কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করা। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"...সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতে স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যেমন তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকা হবে, তেমনি একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা।

উপরন্তু, একজন মুসলিম শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

খ্যাতি খুঁজছেন

ধাত আস সালাসিলের সামরিক অভিযানের সময়, যা সপ্তম বছরের পর ঘটেছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মদিনায় হিজরত করার পর, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, অন্য একজন সাহাবী কিছু সাধারণ পরামর্শ চেয়েছিলেন। রাফাই ইবনে আমর রা. তিনি তাকে নেতা না হওয়ার পরামর্শ দেন, এমনকি দুই জনের উপরেও। তিনি আরও বলেন, এমন সময় আসবে যখন নেতৃত্বের লাগাম ছিন্নভিন্ন মানুষের হাতে ছড়িয়ে পড়বে। যখন এই লোকেরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে না, মহান আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে সঠিক প্রতিশোধ নেবেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ১৩৪-১৩৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহিহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা কামনা করে, তাকে নিজেরাই এটি মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এ দুটি জিনিস যা তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমানকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা

সপ্তম বছর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধাত আস সালাসিলে একটি সামরিক অভিযানের নেতা নিযুক্ত করা হয়। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অন্যান্য অনেক সিনিয়র সাহাবীকে সাধারণ সৈনিক হিসাবে অভিযানে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। একটি শীতল রাতে আমর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তার লোকদেরকে কোন আগুন না জ্বালাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ তিনি চাননি যে শত্রুরা তাদের দেখতে পাবে। এর ফলে শত্রুপক্ষের অপ্রত্যাশিত আক্রমণ হতে পারে। কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাঁর আদেশের পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে পারেননি এবং তাঁর প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন, যেমন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। কিন্তু আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের শান্ত করেন এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের নেতা নিযুক্ত করেছেন কারণ তিনি যুদ্ধ সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নেতার প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছিলেন।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা । এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের

সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে , এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

সফর (ওমরা)

দুর্বলতা ছাড়া নম্রতা

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর সপ্তম বছরে, তিনি সফর (ওমরা) পালনের জন্য মক্কার দিকে রওনা হন, যেমনটি আগের বছর মক্কার অমুসলিম নেতাদের সাথে একমত হয়েছিল। তাঁর কাছে খবর পৌঁছল যে, মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দ এই খবর প্রচার করছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অত্যন্ত কষ্ট ও কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। অমুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে প্রত্যক্ষ করার জন্য মহান আল্লাহর ঘর, কাবাঘরের কাছে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারপর যারা সেদিন শক্তি প্রদর্শন করেছিল তাদের উপর মহান আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য, তারা আংশিকভাবে আল্লাহর ঘর, মহান, কাবা প্রদক্ষিণ করার সময় চারপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 308-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি কোন ঘাটতি অর্থ, দুর্বলতা ছাড়া নম্রতা অবলম্বন করে তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন। নম্র ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহকে বশ্যতা স্বীকার করে, গ্রহণ করে এবং আমল করে এবং এর মাধ্যমে তার দাসত্ব প্রমাণ করে। সত্যকে যখন তাদের কাছে পেশ করা হয় তখন তারা তা সহজেই গ্রহণ করে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে এবং কে তাদের কাছে তা পৌঁছে দেয় তা

নির্বিশেষে। অর্থ, তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না এই বিশ্বাস করে যে তারা ভাল জানে। তারা অন্যদেরকে অবজ্ঞা করে দেখে না যে তারা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে যে তারা তাদের কাছে কোন পার্থিব জিনিস রয়েছে বা তাদের আনুগত্যের কারণে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য রয়েছে, কারণ তারা বুঝতে পারে যে তাদের চূড়ান্ত পরিণতি বা অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি তাদের অজানা। অর্থাৎ, তারা মারা যেতে পারে যখন মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন। এই বাস্তবতা একজন ব্যক্তিকে অহংকারের মারাত্মক পাপ থেকে বিরত রাখতে হবে। একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার অর্থ হল একজন মুসলমান সর্বদা অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে কিন্তু প্রয়োজনে নিজেকে রক্ষা করতে ভয় পায় না বা তাদের নম্রতা তাদের অপমানিত এবং অসম্মানিত বলে মনে করে না।

মাইগ্রেশনের ৪ ম বছর

মক্কা বিজয়

নিখুঁত বিশ্বাস

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় সম্পাদিত শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে অন্য একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে মিত্র ছিল এমন একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দ অবগত হওয়ার পর যে এই খবর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছেছে, তখন তারা তাদের একজন নেতা আবু সুফিয়ানকে মদিনায় প্রেরণ করে, যাতে তারা চুক্তিটি পুনঃনিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করে। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি নিয়ে চিন্তিত। আবু সুফিয়ান অনেক প্রবীণ সাহাবীর সাথে কথা বলেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাদের অনুরোধ করেছিলেন পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাঁর পক্ষে সুপারিশ করার জন্য। তিনি উপজাতি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককে জয় করার জন্য তাদের সাথে তার বিভিন্ন অনুষঙ্গ তালিকাভুক্ত করেছিলেন কিন্তু তারা সবাই একইভাবে উত্তর দিয়েছিল। তারা তাকে খুশি করার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে অস্বীকার করেছিল এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুক্তিটি পুনর্নবীকরণ করতে বা এটি পুনর্নবীকরণ করতে রাজি হতে চায়নি। তারা পরিবর্তে সিদ্ধান্ত তাদের নেতার উপর ছেড়ে দিয়েছিল যে তার ঐশ্বরিক নির্দেশিত পছন্দের উপর আস্থা রেখেছিল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 381-382-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিশেষভাবে, আবু সুফিয়ান যখন আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, যে ব্যক্তি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করবে, সেও রক্ষা করবে। তিনি আরো বলেন, একটি পিঁপড়া মক্কার অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ১৩৯-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর প্রতিক্রিয়া তাঁর নিখুঁত বিশ্বাসের ইঙ্গিত দেয়, কারণ তিনি মহান আল্লাহর জন্য ভালোবাসতেন এবং ঘৃণা করতেন।

সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করে।

প্রথমটি হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা। এর মধ্যে পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা উত্তম তা কামনা করা অন্তর্ভুক্ত। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যদের আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিজের উপায়ে সমর্থন করা। অন্যের প্রতি অনুগ্রহ গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ভালবাসার অভাবকেও প্রমাণ করে, কারণ এই ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালবাসা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে শুধু কথার মাধ্যমে নয়। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার একটি দিক।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা। এর অর্থ হল যে মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন, যেমন তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করা উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে ঘৃণা করা উচিত কারণ মানুষ মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। বরং একজন মুসলিমের উচিত সেই গুনাহকে অপছন্দ করা যা তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তারা তা পরিহার করে এবং অন্যকেও এর বিরুদ্ধে সতর্ক করে। মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া, কারণ এই সদয় আচরণ তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। এর মধ্যে নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে কিছু অপছন্দ না করা, যেমন একটি কাজ, যা বৈধ। পরিশেষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজনের অপছন্দের প্রমাণ এই যে, তারা যখন তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের অপছন্দ প্রকাশ করে তখন তা কখনই

ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী হবে না। অর্থ, কোনো কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের কখনোই কোনো গুনাহের কারণ হবে না কারণ এটি প্রমাণ করে যে কোনো কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের নিজেদের স্বার্থে।

ব্যক্তিগত কথোপকথন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে মিত্র ছিল অন্য একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যুদ্ধবিরতি মাত্র 18 মাস স্থায়ী হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি প্রায়শই মদিনা শহর রক্ষা করার জন্য সাধারণ জনগণের কাছ থেকে সামরিক কৌশলগত তথ্য গোপন রাখতেন তাই তিনি তার স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার অভিযানের জন্য খাবার প্রস্তুত করার জন্য জানিয়েছিলেন কিন্তু তাকে এটি গোপন রাখতে বলেছিলেন। যখন তার পিতা, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর কন্যাকে দেখতে গেলেন যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়েছিলেন, তখন তিনি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে দেখেছিলেন, তিনি খাবার তৈরি করছেন। তিনি তাকে তার ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন কিন্তু তিনি নীরব ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করতে থাকেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে একটি অভিযানের জন্য রওনা হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং অনেক স্থানের তালিকা করা হয়েছিল। কিন্তু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ থাকলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 382-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1959 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে ব্যক্তিগত কথোপকথন একটি আমানত যা অবশ্যই রক্ষা করা উচিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে, অনেকেরই লোকেদের ব্যক্তিগত কথোপকথন অন্যদের কাছে প্রকাশ করার বদ অভ্যাস রয়েছে। এটি একটি অবিশ্বাস্যভাবে খারাপ বৈশিষ্ট্য যা একজন প্রকৃত মুসলমানের মনোভাবের সাথে সাংঘর্ষিক। অনেকে তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে এটি করেন যে এটি গ্রহণযোগ্য যখন স্পষ্টতই নয়। একজন মুসলমানের সবসময় কথোপকথনে উচ্চারিত শব্দগুলি গোপন রাখা উচিত যদি না তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হয় যে তারা যার সাথে কথোপকথন করেছে সে তথ্যটি তৃতীয় পক্ষের কাছে উল্লেখ করার বিষয়ে কিছু মনে করবে না। যদি তারা তা করে তাহলে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে যা তাদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার পরিপন্থী। সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূল হাদিসের উপর আমল করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি গীবত ও পরচর্চার মতো পাপ থেকে রক্ষা করে এবং একে অপরের প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি হতে বাধা দেয়। এই সব শুধুমাত্র ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে। যদি কেউ তাদের জীবনের প্রতি সৎভাবে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে বেশিরভাগ লোকের প্রতি তারা নেতিবাচক অনুভূতি অনুভব করেছে তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল তার কারণে ঘটেছে, যা তারা সরাসরি দেখেছিল না। ব্যক্তিগত কথোপকথন প্রকাশ করা মানুষের মধ্যে বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে ঐক্যকে বাধা দেয়। এবং ইসলামের অনেক শিক্ষায় ঐক্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেমন সহীহ বুখারি, ৬০৬৫ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি ঘোষণা। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৫৮:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ আপনাকে আমানত প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছেন যাদের কাছে তারা প্রাপ্য..."

জিনিস সহজ করুন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে মিত্র ছিল অন্য একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যুদ্ধবিরতি মাত্র 18 মাস স্থায়ী হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিশাল মুসলিম বাহিনী যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিল, তখন সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল যে তারা সেদিন মক্কা জয় করবে। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আসতে দেখে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি তাঁর বৃদ্ধ বাবাকে বাড়িতে রেখে যাননি এবং তিনি নিজেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন যে, তাঁর পিতার জন্য নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসা অধিকতর সঙ্গত ছিল, তারপর অন্যভাবে। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 398-399-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্য কথা বলেছেন, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদের জন্য সহজ করার গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলমান সর্বদা তাদের সম্পূর্ণ অধিকার এবং অন্যদের কাছ থেকে আরও কিছু আদায় করার চেষ্টা করে। এই দিন ও যুগে অজ্ঞতার কারণে পিতামাতার মতো মানুষের অধিকার পূরণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। যদিও একজন মুসলমানের কাছে কোনো অজুহাত নেই কিন্তু সেগুলো পূরণ করার জন্য চেষ্টা করা মুসলমানদের একে অপরের প্রতি করুণাময় হওয়া জরুরি। সহীহ বুখারি, 6655 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন যারা অন্যদের প্রতি করুণাময়।

এই করুণার একটি দিক হল একজন মুসলমান অন্যের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি না করা। পরিবর্তে, তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করতে এবং অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তির মতো উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে, যখন একজন মুসলমান অন্যদের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে এবং তারা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাদের শাস্তি হতে পারে। অন্যদের প্রতি করুণাময় হওয়ার জন্য তাদের তাই কিছু ক্ষেত্রে তাদের অধিকার দাবি করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের অন্যের অধিকার পূরণের জন্য চেষ্টা করা উচিত নয় বরং এর অর্থ হল যে তাদের অধিকার রয়েছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে মাফ করে দিতে পারেন এবং যদি তারা নিজেরা কষ্ট না করে তা করার উপায় রাখে, বিশেষ করে যদি তারা কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা ও করুণা শুধু মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও করুণাময় করে তুলবে না বরং এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে সে পাপী নয় তবে তারা এইভাবে আচরণ করলে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করা এবং আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া এবং পরকালে সবকিছু সহজ করে দেবেন।

হুনাইনের যুদ্ধ

অসুবিধায় অবিচল

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী অভিভূত হয় এবং কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, সাময়িকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা তাঁর অবস্থানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। অবশেষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে তাদের ডেকে আনার পর, তারা সবাই এগিয়ে গেল যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 451 এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, 141 পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর

দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে।

নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

জাস্ট হচ্ছে

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী অভিভূত হয় এবং কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, সাময়িকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা তাঁর অবস্থানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। অবশেষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে তাদের ডেকে আনার পর, তারা সবাই এগিয়ে গেল যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 451 এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, 141 পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

যুদ্ধের সময় আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু শত্রু সৈনিককে হত্যা করেছিলেন। বিজয়ের পরে তাদের বলা হয়েছিল যে যে কেউ প্রমাণ করতে পারবে যে সে একজন শত্রু সৈনিককে হত্যা করেছে তাকে তাদের অস্ত্রের মতো জিনিসপত্র নিতে দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে, কেউ আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘটনাটি যাচাই করেনি, যতক্ষণ না অন্য একজন নিশ্চিত করে যে তিনি যে শত্রু সৈনিককে হত্যা করেছিলেন তার সম্পদ তার কাছে ছিল। এই লোকটি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সম্পদ হস্তান্তর না করে তাকে রাখার অনুমতি দেন। আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তাকে সম্পত্তি রাখার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় যখন তারা যথাযথভাবে আল্লাহর সিংহের একজন, যার অর্থ, আবু কাতাদাহ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর সম্পদ আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই হস্তক্ষেপ স্পষ্টভাবে তাঁর ন্যায় ও ন্যায্য প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময় ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয় । এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। [1] *তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও...”*

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

তায়েফ অবরোধ

নম্রতা এবং দ্বিতীয় সম্ভাবনা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। হুনাইনের বিজয়ের পর কিছু অমুসলিম শত্রু তায়েফ শহরে পশ্চাদপসরণ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর তায়েফের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। তায়েফের অমুসলিমরা প্রায় 30 দিন অবরুদ্ধ ছিল কিন্তু তারা পরাজিত হয়নি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরপর মুসলিম বাহিনীকে তায়েফ থেকে সরে যেতে নির্দেশ দেন এবং তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য দোয়া করেন। সম্ভবত, মহান আল্লাহ তায়েফের মুসলমানদেরকে তায়েফ জয় করতে বাধা দিয়েছিলেন, কারণ মদিনায় হিজরতের আগে, যেখানে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তায়েফবাসীদের ধ্বংস করার বিকল্প দেওয়া হয়েছিল কারণ তার সাথে তাদের দুর্ব্যবহার। কিন্তু তিনি এই বিকল্পটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পরিবর্তে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে তারা শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করবে। এটি সহীহ বুখারি, 3231 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। সুরক্ষার এই পছন্দটি অব্যাহত ছিল এবং মুসলমানদের তায়েফ জয় করতে বাধা দেয়।

উপরন্তু, তায়েফের লোকেরা শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের দেওয়া এই দ্বিতীয় সুযোগটি গ্রহণ করে সত্যকে গ্রহণ করার জন্য এবং

মদিনায় একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করতে এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। . ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 476-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তার জন্য শাস্তি ত্বরান্বিত করেন না যে এটির যোগ্য নম্রতার কারণে। পরিবর্তে তিনি তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের আচরণ সংশোধন করার সুযোগ দেন। যে মুসলমান এটি বুঝতে পারে সে কখনই মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়বে না, তবে সীমা অতিক্রম করবে না এবং মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা অবলম্বন করবে না, তাদেরকে কখনই শাস্তি দেবে না। তারা বুঝতে পারে যে শাস্তি কেবল বিলম্বিত হয় যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় তবে পরিত্যাগ করা যায় না। তাই এই ঐশী নাম একজন মুসলমানের মধ্যে আশা ও ভয়ের সৃষ্টি করে। একজন মুসলমানের উচিত এই বিলম্বকে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য এবং ভাল কাজের দিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবহার করা।

একজন মুসলমানের উচিত এই স্বর্গীয় গুণাবলীর উপর কাজ করা উচিত মানুষের সাথে নম্র হয়ে বিশেষ করে যখন তারা খারাপ চরিত্র প্রদর্শন করে। তাদের উচিত অন্যদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা যেমন তারা মহান আল্লাহকে তাদের উদাসীনতার মুহুর্তে তাদের সাথে নম্র হতে চায়। কিন্তু একই সাথে তাদের নিজেদের খারাপ বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের নমনীয় হওয়া উচিত নয় যে পাপের শাস্তি বিলম্বিত হয় তা স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করা হয় না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দিয়ে তাদেরও নম্রতায় অবিচল থাকতে হবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

“এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।”

মাইগ্রেশনের পর 9 ম বছর

তাবুকের যুদ্ধ

সত্য ভক্তি

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যেমন খবর পৌঁছায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রচণ্ড গরম ও অস্বস্তির সময়ে তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। উপরন্তু, যাত্রা দীর্ঘ এবং অত্যন্ত কঠিন হবে. এই অভিযানে মোট 30,000 সৈন্য তার সাথে যোগ দেয় কিন্তু কেউ কেউ অবহেলা বা ভন্ডামি থেকে পিছিয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ তাদের সমালোচনা করে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত নাজিল করেছেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 1 এ আলোচনা করা হয়েছে।

এই মহান অভিযানে রওয়ানা হওয়ার আগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনাবাসীকে এতে আর্থিকভাবে অবদান রাখতে উৎসাহিত করেছিলেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অর্ধেক সম্পদ দান করেন। অথচ, আবু

বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি তার পরিবারের জন্য কী রেখে গেছেন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি মহান আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের জন্য রেখে গেছেন। জামে আত তিরমিযী, ৩৬৭৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92 এর সাথে যুক্ত:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে একজন ব্যক্তি প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না যার অর্থ, তারা তাদের বিশ্বাসে ত্রুটি ধারণ করবে, যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পছন্দের জিনিসগুলিকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হয়। যদিও অনেকে বিশ্বাস করে যে এই আয়াতটি সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ আরও অনেক বেশি। এটি প্রত্যেকটি দোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজন মুসলিম পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানরা তাদের মূল্যবান সময়কে তাদের খুশি করার জন্য উত্সর্গ করতে পেরে খুশি। কিন্তু তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দিতে অস্বীকার করে, বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বাইরে যা দিনে এক বা দুই ঘন্টা লাগে। অগণিত মুসলমান এখনও বিভিন্ন আনন্দদায়ক কার্যকলাপে তাদের শারীরিক শক্তি উৎসর্গ করতে পেরে খুশি, তাদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় উপবাসের মতো মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এটি উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে। সাধারণভাবে, লোকেরা এমন জিনিসগুলিতে চেষ্টা করতে পেরে খুশি যা তারা কামনা করে যেমন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা যা তাদের প্রয়োজন হয় না

যদিও এর অর্থ তাদের অতিরিক্ত সময় করতে হবে এবং তাদের ঘুম ত্যাগ করতে হবে তবুও কতজন আল্লাহর আনুগত্যের জন্য এইভাবে চেষ্টা করে। তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে উচুঁ? কতজন স্বেচ্ছায় নামাজ পড়ার জন্য তাদের মূল্যবান ঘুম ছেড়ে দেয়?

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলিমরা এখনও বৈধ পার্থিব এবং ধর্মীয় আশীর্বাদ চায়, একটি সাধারণ সত্য উপেক্ষা করে। যে তারা কেবল তখনই এই জিনিসগুলি লাভ করবে যখন তারা তাদের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে উৎসর্গ করবে। কিভাবে তারা তাঁর কাছে ন্যূনতম জিনিস উৎসর্গ করতে পারে এবং এখনও তাদের সমস্ত স্বপ্ন অর্জনের আশা করতে পারে? এই মনোভাব সত্যিই অদ্ভুত.

শ্রেষ্ঠ হও

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যেমন খবর পৌঁছায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রচণ্ড গরম ও অস্বস্তির সময়ে তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। উপরন্তু, যাত্রা দীর্ঘ এবং অত্যন্ত কঠিন হবে. এই অভিযানে মোট 30,000 সৈন্য তার সাথে যোগ দেয় কিন্তু কেউ কেউ অবহেলা বা ভন্ডামি থেকে পিছিয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ তাদের সমালোচনা করে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত নাজিল করেছেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 1 এ আলোচনা করা হয়েছে।

যখন সেনাবাহিনী থানিয়াতুল ওয়াদাতে পৌঁছেছিল, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই মহান অভিযানের জন্য তাঁর সেনাপতিদের বেছে নেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ব্যানার দিলেন এবং সবচেয়ে বড় ব্যানারটি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে তিনি নির্দেশকদের নেতা ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ১৪৭ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যান্য অনেকের মতো এই ঘটনাটিও আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উচ্চ মর্যাদা নির্দেশ করে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ, মহানবী (সা.)-এর পর সৃষ্টি হওয়া সর্বোত্তম দল। তারা যে শারীরিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জীবদ্দশায় পর্যবেক্ষণ করেছেন তা অবশ্যই একটি বিষয়। কিন্তু যে কেউ তাদের জীবন এবং তাদের সৎকর্ম সম্পর্কে জানে সে বোঝে যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই অনন্য এবং মহান কাজের চেয়েও বেশি কিছু।

তাদের শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রধান কারণ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে জড়িত একটি হাদীসে দেখানো হয়েছে, যা সহীহ মুসলিমের ৬৫১৫ নম্বরে পাওয়া যায়। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সওয়ার ছিলেন। মরুভূমিতে তার পরিবহনে যখন তিনি একজন বেদুইনকে দেখতে পেলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেদুইনকে অভিবাদন জানালেন, বেদুঈনের মাথায় তার পাগড়ী রাখলেন এবং বেদুইনকে তার বাহনে আরোহণের জন্য জোর দিলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হয়েছিল যে তিনি বেদুইনকে যে সালাম দিয়েছিলেন তা যথেষ্ট ছিল কারণ বেদুইনরা মহান সাহাবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সন্তুষ্ট হতেন। , তাকে অভিবাদন। তবুও, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যান এবং বেদুইনদেরকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেন যে, তিনি এটা করেছেন শুধুমাত্র কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে সম্মান করতে পারে এমন একটি সর্বোত্তম উপায় হল তাদের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা। পিতামাতার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন যে, বেদুঈনের পিতা তাঁর পিতার বিশ্বস্ত সেনাপতি উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন।

এই ঘটনাটি সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

তারা কেবল বাধ্যতামূলক দায়িত্বই পালন করেনি এবং সমস্ত পাপ পরিহার করেনি বরং তাদের জন্য সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মাত্রায় সুপারিশ করা সমস্ত কাজ সম্পূর্ণরূপে পূরণ করেছে। তাদের আত্মসমর্পণ তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে একপাশে রেখে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করতে বাধ্য করেছিল। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, বেদুইনকে সহজেই উপেক্ষা করতে পারতেন কারণ তার করা কোনো কাজই এখনও বাধ্যতামূলক ছিল না, এই অজুহাত ব্যবহার করে এমন অনেক মুসলমানের বিপরীতে, তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি যেভাবে করেছিলেন সেভাবে কাজ করেছিলেন। .

ইসলামের শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের অভাবই মুসলমানদের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিয়েছে। কেউ কেউ শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং অন্যান্য সৎ কাজ থেকে দূরে সরে যায়, যেমন স্বেচ্ছায় দাতব্য, যা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী বলে দাবি করে যে কাজগুলি বাধ্যতামূলক নয়। সমস্ত মুসলমান পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে শেষ হতে চায়। কিন্তু তাদের পথ বা পথে না চললে এটা কিভাবে সম্ভব? কোন মুসলমান যদি তাদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে তাহলে তারা তাদের সাথে শেষ পর্যন্ত কিভাবে যাবে? তাদের সাথে শেষ করতে তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু এটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে যেমনটি তারা করেছিল, তার পরিবর্তে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার পরিবর্তে।

একটি ধন্য কবর

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যেমন খবর পৌঁছায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। অভিযানের সময় একজন সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে আলো দেখতে পেলেন। যখন তিনি অনুসন্ধানের জন্য সেখানে যান তখন তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), আবু বক্কর এবং উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পান, তিনি একজন সাহাবী যুল বিজাদায়েনের জন্য একটি কবর খনন করছেন। তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, যিনি মারা গেছেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কবরে ছিলেন তখন আবু বক্কর ও উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যুল বিজাদায়েন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃতদেহকে কবরে নামিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দেহকে কবরে সঠিকভাবে স্থাপন করার পর তিনি মহান আল্লাহকে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যেভাবে তিনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায়ই বলতেন যে, তিনি তাঁর কবর হতে চান। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 22-23-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2460 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কবর হল জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত। এই হাদিসটি আরও ব্যাখ্যা করে যে যখন একজন সফল মুমিনকে তাদের কবরে স্থাপন করা হয় তখন তা তাদের জন্য প্রশস্ত এবং আরামদায়ক হয়ে ওঠে

যেখানে একজন পাপী ব্যক্তির কবর তাদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষতিকারক হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় তখন তাদের সাথে জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত নিয়ে যায় অর্থাৎ তাদের আমল। একজন মুসলমান যদি মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়, তাহলে এটি নিশ্চিত করবে যে তারা প্রয়োজনীয় কাজগুলো প্রস্তুত করবে। তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন। কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তাহলে তাদের পাপ জাহান্নামের গর্ত তৈরি করবে যে তারা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বিশ্রাম পাবে।

অতএব, মুসলমানদের আজই কাজ করতে হবে এবং এই প্রস্তুতিতে দেরি না করে কারণ মৃত্যুর সময় অজানা এবং প্রায়শই হঠাৎ আসে। আগামীকালের জন্য দেরি করা একটি বোকামি এবং এটি কেবল অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের ঘরকে সুন্দর করার জন্য অনেক শক্তি এবং সময় ব্যয় করে তাদের অবশ্যই তাদের কবরকে সুন্দর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে কারণ সেখানে যাত্রা অনিবার্য এবং সেখানে দীর্ঘ সময় থাকা। এবং যদি কেউ তাদের কবরে কষ্ট পায় তবে এর পরে যা হবে তা আরও খারাপ হবে। সুনানে ইবনে মাজা, 4267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সত্যের প্রতি অন্ধ

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যেমন খবর পৌঁছায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রচণ্ড গরম ও অস্বস্তির সময়ে তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। উপরন্তু, যাত্রা দীর্ঘ এবং অত্যন্ত কঠিন হবে. এই অভিযানে মোট 30,000 সৈন্য তার সাথে যোগ দেয় কিন্তু কেউ কেউ অবহেলা বা ভন্ডামি থেকে পিছিয়ে পড়ে। যাত্রাকালে সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছিল। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দো'আ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তার প্রার্থনা থেকে হাত নামানোর আগেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, উল্লেখ্য যে এটি কেবল তাদের শিবিরে বৃষ্টি হয়েছিল এবং এর বাইরে নয়। যখন একজন মুনাফিককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি এর পরেও ইসলামের আরও প্রমাণ চান কি না তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে এটি কেবল একটি ক্ষণস্থায়ী মেঘ। ইমাম ইবনে কাথির, দ্য লাইফ অফ দ্যা প্রফেট, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 10-11 এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, 148-149 পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন মানবজাতিকে শিক্ষা দেয় যে কিছু কিছু মানুষ বস্তুগত জগতে এতটাই ডুবে আছে যে তাদের অন্তরে কোন উপদেশ প্রবেশ করবে না। পবিত্র

কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে এই দলটির হৃদয় পাথরের চেয়েও কঠিন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 74:

"অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, পাথরের মত বা তার চেয়েও কঠিন..."

এই মুহুর্তে যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চায় তাদের উচিত এই ধরণের লোক থেকে আলাদা হয়ে অন্যের দিকে মনোনিবেশ করা। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ , এমনকি এই ক্ষেত্রেও একজন মুসলিমকে সর্বদা পাপীদের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত কারণ তারা যে কোনো সময় অনুতপ্ত হতে পারে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত ৬৩:

"... এবং যখন অজ্ঞরা তাদের [কঠোরভাবে] সম্বোধন করে, তখন তারা [শান্তির কথা] বলে।"

একইভাবে পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন মহিমান্বিত, যে উপদেশ যখন একটি সীমা পৌঁছে যায় তখন একগুঁয়ে এবং বিপথগামী লোকদের আলাদা করা এবং ছেড়ে দেওয়াই উত্তম তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের কাছে। নিঃসন্দেহে এমন একটি দিন আসবে যখন আল্লাহ তায়ালা উন্নত, মানবজাতিকে অবহিত করবে কে সৎপথে ছিল এবং কে হারিয়েছিল অন্ধকারে। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 55:

"এবং যখন তারা মন্দ কথা শোনে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, "আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হবে, আমরা অজ্ঞদের সন্ধান করি না।"

মুসলমানদের কখনই হতাশাগ্রস্ত এবং বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় যখন তাদের ভাল পরামর্শ অন্যদের প্রভাবিত করে না। কিছু ক্ষেত্রে, এই মানুষ গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত হয় এমন পরিমাণে তাদের অন্তর আবৃত হয়ে যায়। এই পর্দা তাদের প্রভাবিত করা ভাল উপদেশ বাধা দেয় একটি ইতিবাচক উপায়ে। একটি হাদিস পাওয়া গেছে সুনানে ইবনে মাজা, 4244 নম্বর , কিভাবে একটি পাপ ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ তৈরি করে। একজন যত বেশি পাপ করে ততই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় এই অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 14:

" না! বরং দাগ তাদের অন্তরকে ঢেকে দিয়েছে যা তারা উপার্জন করছিল।"

এটি অন্য আয়াতের অনুরূপ যেখানে আল্লাহ , মহিমান্বিত, ঘোষণা করে যে তাদের কান, চোখ এবং হৃদয় সত্য থেকে আড়াল করা হয়েছে এবং তাই তারা সত্যের দিকে পরিচালিত হতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 7:

" আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের শ্রবণের উপর মোহর স্থাপন করেছেন এবং তাদের দৃষ্টির উপর একটি পর্দা রয়েছে..."

দোষ ইসলামের বাণীর নয়, বিপথগামীদের অন্তরে। ঠিক যেমন দোষ একজন অন্ধ ব্যক্তির চোখে, উজ্জ্বল সূর্যের নয়। দুর্ভাগ্যবশত, তার একগুঁয়ে মনোভাব একটি ব্যাপক সমস্যা হয়ে উঠেছে সমাজের মধ্যে। এর মধ্যে কিছু লোক ইসলামে বিশ্বাস করে তবুও পবিত্র কোরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদিসের শিক্ষার জন্য তাদের হৃদয় ও মন বন্ধ করে রেখেছে । এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। তারা এমন কোন ভাল উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যা তাদের উভয় জগতের জন্য উপকৃত হয় ।

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে বেছে নেয় তাদের বুঝতে হবে যে দুই ধরনের মানসিকতা মানুষ গ্রহণ করতে পারে। প্রথমটি হল যখন কেউ একটি সমস্যা সম্পর্কে আগে থেকেই তাদের মন তৈরি করে এবং তারপরে শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলি অনুসন্ধান করে এবং গ্রহণ করে যা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে সমর্থন করে। যেখানে , সঠিক মনোভাব হল বিভিন্ন বিষয়ে জোরালো প্রমাণ অনুসন্ধান ও গ্রহণ করে খোলা মন নিয়ে জীবনযাপন করা। প্রথম মানসিকতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্তর থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সমস্যা সৃষ্টি করবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই কিভাবে কিছু দিক মিডিয়া কাজের. তারা পূর্বনির্ধারিত তারা যে তথ্য প্রকাশ করতে চায়, দুর্বল সমর্থনকারী প্রমাণের বিটগুলি খুঁজে বের করে এবং তারপর বিশ্বের দেখার জন্য অনুপাতের বাইরে এটি গাট্টা. যারা ইসলামের বাণী প্রচার করছে তাদের উচিত প্রথম ধরণের লোকদের এড়িয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় দলকে সত্যের দিকে দাওয়াত দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করা।

তাবুকের নবীর খুতবা

একটি ব্যাপক পরামর্শ

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যেমন খবর পৌঁছায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। অভিযানটি যখন তাবুকে পৌঁছে, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নোক্ত ভাষণ দেন: "হে মানুষ, সবচেয়ে সত্য কথা হল মহান আল্লাহর কিতাবের। বন্ধনের দৃঢ়তম হল শব্দ (বিশ্বাসের সাক্ষ্য)। সর্বোত্তম ধর্ম হলো হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম। জীবনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। সর্বোত্তম বাণী হল মহান আল্লাহর স্মরণ। সর্বোত্তম বর্ণনা হল পবিত্র কুরআন। সর্বোত্তম অভ্যাস হল যেগুলো মহান আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত। অভ্যাস খারাপ যারা উদ্ভাবিত হয়. সর্বোত্তম পথনির্দেশ হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সবচেয়ে মহৎ মৃত্যু হচ্ছে শহীদ হিসেবে। সবচেয়ে অন্ধ হচ্ছে হেদায়েতের পর পথভ্রষ্ট হওয়া। সর্বোত্তম আমল হল সেই কাজ যা উপকারী। সর্বোত্তম নির্দেশনা হল যা অনুসরণ করা হয় (উদ্ভাবিত নয়)। সবচেয়ে খারাপ অন্ধত্ব (আধ্যাত্মিক) হৃদয়ের। উপরের হাত (দানকারী) নীচের হাতের চেয়ে উত্তম (যে ব্যক্তি দান করে)। যা সামান্য হলেও যথেষ্ট তা তার চেয়ে উত্তম যা অনেক কিন্তু অপচয়কারী। মৃত্যু যখন সামনে থাকে তখন সবচেয়ে খারাপ ক্ষমা চাওয়া হয়। বিচার দিবসে এর চেয়ে খারাপ অনুতাপ। এমন লোক আছে যারা শুধুমাত্র জুমার নামাজের শেষে অংশ নেয়। এমন কিছু লোক আছে যারা শুধু মহান আল্লাহকে অযথাই স্মরণ করে। গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জিহ্বা হল মিথ্যা

কথা বলা। সর্বোত্তম সম্পদ হল আত্মার (তৃপ্তি)। সর্বোত্তম গুণ হল তাকওয়া। জ্ঞানের পরাক্রম হল মহান আল্লাহকে ভয় করা। অন্তরের মধ্যে সর্বোত্তম গুণ হল নিশ্চিততা (বিশ্বাস)। সন্দেহ করা কুফর থেকে। শোকে বিলাপ করা জাহেলিয়াতের যুগ (প্রাক-ইসলামী যুগ) থেকে একটি কাজ। জালিয়াতি জাহান্নামে ছড়িয়ে মাটির হয়. (বেশিরভাগ) কবিতা শয়তান থেকে আসে। মদ পাপের সমষ্টি। নারী (পুরুষের জন্য এবং নারীর জন্য পুরুষ) শয়তানের ফাঁদ। যৌবন হল উন্মাদনার একটি শাখা (নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণে)। সবচেয়ে খারাপ আয় সুদ থেকে। নিকৃষ্ট খাদ্য এতিমের সম্পদ গ্রাস করছে। সুখী মানুষ হল সেই ব্যক্তি যাকে অন্যের (কর্ম) দ্বারা সতর্ক করা হয়। তোমাদের একজনকে পরকালের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য (মৃত্যুর) জন্য চার হাত দূরে সরে যেতে হবে। একটি কর্মের মৌলিকতা তার ফলাফল দ্বারা নির্ধারিত হয়। আখ্যানের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল অসত্য। যা আসতে হবে সবই হাতের কাছে। মুমিনের নামে শপথ করা একটি ক্ষোভ। মুমিনের সাথে যুদ্ধ করা কুফর। তার গোশত খাওয়া (গীবত) মহান আল্লাহর অবাধ্যতা। তার সম্পত্তির পবিত্রতা তার রক্তের পবিত্রতার মতো। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নামে (মিথ্যা) শপথ করে, সে তার প্রতি মিথ্যারোপ করে। যে তার ক্ষমা চাইবে তাকে ক্ষমা করা হবে। যে ক্ষমা করবে, মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি রাগকে দমন করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা পুরস্কার দেবেন। যে ব্যক্তি বিপদাপদে অটল থাকবে, মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষতিপূরণ দেবেন। যে ব্যক্তি খ্যাতি কামনা করে, মহান আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন। যে ব্যক্তি অটল থাকবে, মহান আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অমান্য করবে, মহান আল্লাহ পাক তিনি শাস্তি দেবেন। হে মহান আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। হে মহান আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। হে মহান আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। আমি নিজের জন্য এবং আপনার জন্য ক্ষমা চাই।" ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 16-17 এ আলোচনা করা হয়েছে।

ভাল সমর্থন

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে তাকিফের অমুসলিম গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে দেখা করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর এবং আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুরোধে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একজন গোত্রীয়কে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন, উসমান বিন আবু আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। তার সাথে সন্তুষ্ট। তিনি এটি করেছিলেন যদিও তিনি সর্বকনিষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে একজন ছিলেন, কারণ তিনি পবিত্র কুরআন বোঝার প্রবল আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে অনেক বেশি পছন্দ করেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর পৃষ্ঠা 40, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 145-146 এ আলোচনা করা হয়েছে।

উসমানকে মনোনীত করার মাধ্যমে, আবু বক্কর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সমাজকে যা ভাল তা সমর্থন করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি তাকে মনোনীত করেননি পার্থিব কারণে, যেমন পারিবারিক বংশ বা বিনিময়ে কিছু ফিরে পাওয়ার আশায়।

ধার্মিক পূর্বসূরিদের মৃত্যুর পর থেকে মুসলিম জাতির শক্তি নাটকীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা যৌক্তিক যে একটি দলে যত বেশি লোকের সংখ্যা তত বেশি হবে সেই দলটি তত শক্তিশালী হবে কিন্তু মুসলিমরা কোনো না কোনোভাবে এই যুক্তিকে অস্বীকার করেছে। মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মুসলিম জাতির

শক্তি কমেছে। এটি হওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2 এর সাথে সংযুক্ত:

"... আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে কোনো ভালো বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কোনো বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন না করতে। ধার্মিক পূর্বসূরিরা এটিই করেছে কিন্তু অনেক মুসলিম তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক মুসলমান এখন তারা কী করছে তা দেখার পরিবর্তে কে একটি কাজ করছে তা পর্যবেক্ষণ করে। যদি ব্যক্তিটি তাদের সাথে সংযুক্ত থাকে, উদাহরণস্বরূপ, একটি আত্মীয়, তারা তাদের সমর্থন করে যদিও জিনিসটি ভাল না হয়। একইভাবে, যদি ব্যক্তির সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক না থাকে তবে জিনিসটি ভাল হলেও তারা তাদের সমর্থন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই মনোভাব ধার্মিক পূর্বসূরিদের ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা এটি করছে তা নির্বিশেষে তারা ভালভাবে অন্যদের সমর্থন করবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের উপর আমল করতে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে তারা এমনকি তাদের সমর্থন করবে যেগুলিকে তারা মেনে নিতে পারেনি যতক্ষণ না এটি একটি ভাল জিনিস ছিল।

এর সাথে যুক্ত আরেকটি বিষয় হল যে অনেক মুসলিম একে অপরকে ভালোভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা যাকে সমর্থন করছে তাদের থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে। এই অবস্থা এমনকি পণ্ডিত এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করেছে। তারা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য না করার জন্য খোঁড়া অজুহাত তৈরি করে কারণ তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই এবং তারা ভয় করে যে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভুলে যাবে এবং

তারা যাদের সাহায্য করবে তারা সমাজে আরও সম্মান অর্জন করবে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ সত্যকে পর্যবেক্ষণ করতে ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা হয়, ততক্ষণ অন্যদের ভাল কাজে সহায়তা করা সমাজে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে আনবেন যদিও তাদের সমর্থন অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সহজেই খিলাফতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন এবং তাঁর পক্ষে প্রচুর সমর্থন পেতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, আবু বক্কর সিদ্দিককে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত করা। উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তিনি অন্য ব্যক্তিকে সমর্থন করলে সমাজের দ্বারা ভুলে যাওয়া নিয়ে চিন্তা করেননি। তিনি পরিবর্তে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের আদেশ পালন করেছেন এবং যা সঠিক তা সমর্থন করেছেন। সহীহ বুখারি নম্বর 3667 এবং 3668 তে পাওয়া হাদিসগুলিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্মান ও সম্মান শুধুমাত্র এই কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যারা সচেতন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট।

মুসলমানদের অবশ্যই এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে এবং যারাই এটি করছে তা নির্বিশেষে অন্যদের ভালো করতে সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং তাদের সমর্থন তাদের সমাজে বিস্মৃত হওয়ার ভয়ে পিছপা হবে না। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো বিস্মৃত হবে না। প্রকৃতপক্ষে উভয় জগতেই তাদের সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

পবিত্র তীর্থযাত্রাকে শুদ্ধ করা

জ্ঞানের গুরুত্ব

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র একজন মুসলমান পবিত্র ইবাদতে অংশ নিতে পারবে। সেই বছরের পর তীর্থযাত্রা। এর আগে অমুসলিমরা পবিত্র তীর্থযাত্রা করত কিন্তু তাদের নিজস্ব ভ্রান্ত রীতিনীতি অনুযায়ী। এই ঘোষণার পূর্বে এবং সে বছর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পবিত্র তীর্থযাত্রার দায়িত্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে নিযুক্ত করেন। ইমাম ইবনে কাথির, দ্য লাইফ অফ প্রফেট, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 48-49 এবং ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, 150-151 পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, ইসলাম সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞানের কারণে পবিত্র তীর্থযাত্রার দায়িত্বে নিযুক্ত হন, কারণ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনেক আইনি সমস্যা মোকাবেলা করতেন এবং নিয়মিতভাবে তীর্থযাত্রীদের সাথে কথা বলতেন। এটি ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

এটি একটি ভৌত পথ নির্দেশ করে যে কেউ জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন বক্তৃতা এবং ক্লাসে অংশ নেওয়া এবং এমন একটি পথ যেখানে কেউ শারীরিক ভ্রমণ ছাড়াই জ্ঞানের সন্ধান করে। এটি জ্ঞানের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন জ্ঞান সম্পর্কে শোনা, পড়া, অধ্যয়ন করা এবং লেখা। জান্নাতে যাওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা একজন মুসলিমকে সেখানে পৌঁছাতে বাধা দেয়। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছতে পারবে, যার কাছে এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে এবং কীভাবে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। উপরন্তু, এটি সহজেই বোঝা যায় যে একজন ব্যক্তি এই বিশ্বের একটি শহরে তার অবস্থান এবং এটির দিকে নিয়ে যাওয়া পথ না জেনে পৌঁছাতে পারে না। অনুরূপভাবে জান্নাত লাভ করা যায় না এ বিষয়গুলো সম্পর্কে না জেনে যেমন তার দিকে নিয়ে যাওয়া পথ।

কিন্তু লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, একজন মুসলিমের জ্ঞান অন্বেষণ এবং তার উপর কাজ করার উদ্দেশ্য হতে হবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। যে ব্যক্তি জাগতিক কারণে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন প্রদর্শন, তারা যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয় তবে সে জাহান্নামে যাবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার নেই। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে পূর্ণ এলাকায় অবস্থান করে। এই কারণেই

জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার মহান আল্লাহর প্রতি কারো আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি করবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা এমন গাধার মত যা বই বহন করে যা উপকারী নয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"... অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

আন্তরিকতা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র একজন মুসলমান পবিত্র ইবাদতে অংশ নিতে পারবে। সেই বছরের পর তীর্থযাত্রা। এর আগে অমুসলিমরা পবিত্র তীর্থযাত্রা করত কিন্তু তাদের নিজস্ব ভ্রান্ত রীতিনীতি অনুযায়ী। এই ঘোষণার পূর্বে এবং সে বছর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পবিত্র তীর্থযাত্রার দায়িত্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে নিযুক্ত করেন। ইমাম ইবনে কাথির, দ্য লাইফ অফ প্রফেট, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 48-49 এবং ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, 150-151 পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘোষণাটি সর্বজনীন করার জন্য আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তীর্থযাত্রীদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁকে তাঁর কাছ থেকে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়েছে নাকি বার্তা দেওয়ার জন্য। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন যে, তাঁকে শুধুমাত্র একজন রসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে। সুনানে আন নাসায়ী, 2996 নম্বরে একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিস্থাপনে কোনো সমস্যা ছিল না কারণ তিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক ছিলেন। অর্থ, তিনি নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না, বরং তিনি কেবল মহান আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করতে চেয়েছিলেন। এই আন্তরিকতাই ঈমানের মূল কথা।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল আল্লাহ, মহান, তাঁর গ্রন্থ, অর্থ, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদের প্রতি আন্তরিকতা। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যীনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত

হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। নিষ্ঠাবান মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের

মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"... আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাই] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

পার্থিব লাভের লক্ষ্যে

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে একটি প্রতিনিধি দল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করেন। তাদের মধ্যে মুসাইলিমা, মিথ্যাবাদী, যিনি মদিনায় আসার পর বলেছিলেন যে তিনি কেবলমাত্র মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুসরণ করবেন, যদি তিনি তাঁর পরে ইসলামী জাতির নেতা নিযুক্ত হন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে সতর্ক করা হয়েছিল যে, মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা অবশেষে মিথ্যাভাবে নবুওয়াত দাবি করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শাস্তি না দিয়ে কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 66-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা যখন ইয়ামামায় ফিরে আসেন, অবশেষে তিনি নবুওয়াত ঘোষণা করেন এবং জাগতিক জিনিসের লোভে, তার অনেক লোক তাকে গ্রহণ করে। তারপর তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে একটি চিঠি লিখে তাঁর ঘোষণার কথা জানিয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে আপোষ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তারা শাসনের বিষয়ে অংশীদার হবে। পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 7 অধ্যায় আল আরাফ, আয়াত 128 উদ্ধৃত করার সময় তাঁর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন:

"...প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"

ইমাম সাফি উর রহমানের দ্য সিলড নেক্টার, পৃষ্ঠা ৪৫২-৪৫৪-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসাইলিমা, মিথ্যাবাদী, পবিত্র কুরআনের সাথে মিলে যায় এমন আয়াত রচনা করার চেষ্টা করেছিল যার ফলে তিনিও ঐশ্বরিক ওহী পেয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করতে অন্যদের বোকা বানানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই বিষয়ে, মহান আল্লাহ, অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 93 নাজিল:

"এবং তার চেয়ে বড় জালেম কে হবে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে বা বলে, "এটি আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে," অথচ তার প্রতি কিছুই ওহী করা হয়নি এবং যে বলে, "আমি [কিছু] প্রকাশ করব যা আল্লাহ নাযিল করেছেন।" আর যদি তুমি দেখতে পারো যখন জালেমরা মৃত্যুর প্রবল যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে যখন ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে, [বলে], "তোমাদের আত্মাকে মুক্তি দাও, আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে [চরম] অপমানের শাস্তি যা তোমরা বলতে। সত্য ব্যতীত আল্লাহর বিরুদ্ধে এবং [যে] তোমরা তাঁর আয়াতের প্রতি অহংকারী ছিলে।"

যখন তিনি এটি করার চেষ্টা করেছিলেন তখন সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের কাছে তাঁর মূর্খতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ তাঁর রচিত কবিতা অর্থহীন বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে যা কারও উপকারে আসেনি। তিনি অন্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে এবং তাদের সম্পদ ও কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুসারী অর্জন করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 480 এবং ইমাম ওয়াহিদীর, আসবাব আল নুজুল, 6:93, পৃষ্ঠা 77-78-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তার খিলাফতকালে, আবু বকর, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মুসাইলিমা, মিথ্যাবাদীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। ওয়াশী ছিলেন জুবায়ের ইবনে মুতআমের মুক্তকৃত দাস। উহুদ যুদ্ধের সময়, যেটি তৃতীয় বছরে ঘটেছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করেন, ওয়াশী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন. কয়েক বছর পর, ওয়াশি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মিথ্যাবাদী মুসাইলিমার বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন সেরা ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য। যুদ্ধের সময়, ওয়াশি মিথ্যাবাদী মুসাইলিমার দিকে বর্শা চালায় এবং তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। অন্য একজন সাহাবী, আবু দুজানাহ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তারপর মুসায়লিমা, মিথ্যাবাদীকে শেষ করলেন। এটি সহীহ বুখারী, 4072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসাইলিমার মত, মিথ্যাবাদী, একজন ব্যক্তিকে সমস্ত বৈধ সীমা অতিক্রম করতে উত্সাহিত করা যেতে পারে যখন তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি চরম ভালবাসা থাকে।

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

এটা দেখায় যে, কোন মুসলমানের বিশ্বাস নিরাপদ থাকে না যদি তারা এই পৃথিবীতে সম্পদ ও খ্যাতির জন্য আকাঙ্খা করে, ঠিক যেমন খুব কমই কোনো ভেড়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লালসার কুফলের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষার প্রথম প্রকারটি হল যখন একজন ব্যক্তি সম্পদের প্রতি চরম ভালবাসা রাখে এবং তা বৈধ উপায়ে অর্জনের জন্য ক্লান্তি ছাড়াই চেষ্টা করে। এমন আচরণ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষণ নয় কারণ একজন মুসলমানের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের বিধান তাদের জন্য নিশ্চিত এবং এই বরাদ্দ কখনই পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে প্রমাণিত। এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তাদের দায়িত্বে অবহেলা করবে কারণ তারা সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত। যে শরীর সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত সে কখনই পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তি সম্পদ অর্জনের জন্য এত বেশি পরিশ্রম করবে যে তারা এটি উপভোগ করার সুযোগও পাবে না। পরিবর্তে, তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে এবং এটিকে অন্য লোকেদের উপভোগ করার জন্য রেখে যাবে যদিও তারা এর জন্য দায়ী হবে। এই ব্যক্তি বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করতে পারে কিন্তু তারা এখনও মানসিক শান্তি পাবে না কারণ তারা যতই অর্জন করুক না কেন তারা কেবল আরও বেশি কামনা করবে। এই ব্যক্তি অভাবী এবং তাই, প্রকৃত দরিদ্র, এমনকি যদি তাদের অনেক সম্পদ থাকে।

একমাত্র লোভ যা উপকারী তা হল সত্যিকারের সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য আকাঙ্ক্ষা, যথা, সৎকর্মের জন্য নিজের প্রত্যাবর্তনের দিনের জন্য প্রস্তুত করা।

দ্বিতীয় প্রকারের ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা প্রথম প্রকারের মতই কিন্তু তা ছাড়াও এই ধরনের ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে এবং মানুষের অধিকার যেমন ফরজ সদকা পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদীসে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিসে, 6576 নম্বর, তিনি সতর্ক করেছিলেন যে এই মনোভাব অতীতের জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছে কারণ তারা হারাম জিনিসগুলিকে হালাল করেছে, অন্যের অধিকার হরণ করেছে এবং অতিরিক্ত সম্পদের জন্য অন্যকে হত্যা করেছে। এই ব্যক্তি যে সম্পদের অধিকারী নয় তার জন্য চেষ্টা করে যা অসংখ্য বড় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যখন কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করে তখন তারা তীব্র লোভী হয়ে ওঠে। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন, লোভী ব্যক্তি আল্লাহ থেকে অনেক দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসাইতে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 3114, সতর্ক করে যে চরম লোভ এবং সত্যিকারের বিশ্বাস একজন সত্যিকারের মুসলমানের হৃদয়ে কখনই একত্রিত হবে না।

কোনো মুসলমান যদি এ ধরনের লালসা অবলম্বন করে তাহলে একজন অশিক্ষিত মুসলমানের জন্যও এর চরম বিপদ স্পষ্ট। এটি তাদের ঈমানকে ধ্বংস করবে যতক্ষণ না সামান্য ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট না থাকে ঠিক যেমনটি আলোচিত প্রধান হাদিসটি সতর্ক করে যে একজনের বিশ্বাসের এই ধ্বংসটি ভেড়ার পালকে ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের চেয়েও মারাত্মক। এই মুসলমান তাদের মৃত্যুর মুহূর্তে তাদের সামান্য বিশ্বাস হারানোর ঝুঁকি নেয়, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি। খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহিহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা কামনা করে, তাকে নিজেরাই এটি মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এ দুটি জিনিস যা তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমানের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

হারাম এড়িয়ে চলা

হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার তাঁর এক খাদেম খাবার দিয়েছিলেন। এর উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার আগে, যা তার স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল, তিনি ক্ষুধার্ত থাকায় একটি কামড় খেয়েছিলেন। যখন ভৃত্যটি অবশেষে তাকে বলল যে কিছু মূর্তিপূজারী যারা একটি বিবাহ উদযাপন করছিল খাবারটি দিয়েছিল, তখন আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং খাবারটি তার জন্য হারাম হওয়ার ভয়ে বমি করতে লাগলেন। এরপর তিনি উপদেশ দেন যে, তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, যে শরীর হারাম জিনিসে পুষ্ট হয়েছে সে জাহান্নামে যাবে। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৪৮ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হারাম ব্যবহার করা একটি বড় গুনাহ। এর মধ্যে রয়েছে বেআইনি সম্পদ ব্যবহার, বেআইনি জিনিস ব্যবহার করা এবং বেআইনি খাবার খাওয়া। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে নির্দিষ্ট জিনিসগুলিকে ইসলাম হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে যেমন অ্যালকোহল শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলিই হারাম নয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি হালাল জিনিসগুলিও হারাম হয়ে যেতে পারে যদি সেগুলি হারাম জিনিসের মাধ্যমে লাভ করা হয়। যেমন, হালাল খাদ্য হারাম হয়ে যেতে পারে যদি তা হারাম সম্পদ দিয়ে কেনা হয়। তাই, মুসলমানদের জন্য এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কেবলমাত্র হালাল জিনিসগুলির সাথেই লেনদেন করে কারণ এটি কাউকে ধ্বংস করতে হারামের একটি উপাদান লাগে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সহীহ মুসলিম, 2346 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে

ব্যক্তি হারাম ব্যবহার করবে তার সমস্ত প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হবে। যদি তাদের দোয়া মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে কি তাদের কোনো ভালো কাজ কবুল হওয়ার আশা করা যায়? প্রকৃতপক্ষে এর উত্তর সহীহ বুখারি, 1410 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদীসে পাওয়া গেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহই কেবল হালালকে গ্রহণ করেন। অতএব, অবৈধ সম্পদের সাথে পবিত্র তীর্থযাত্রা করার মতো যে কোনো কাজ যা হারামের ভিত্তি রয়েছে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 3118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, বিচারের দিন এই ধরনের ব্যক্তিকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

" এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না বা শাসকদের কাছে [ঘুষের মাধ্যমে] পাঠাও না যাতে [তারা সাহায্য করতে পারে] জনগণের সম্পদের একটি অংশ পাপে ভোগ করতে, যদিও তোমরা জান [এটি অবৈধ।]"

মাইগ্রেশনের পর দশম বছর

বিদায়ী পবিত্র তীর্থযাত্রা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ্জ) করার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 152-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 1773 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র তীর্থযাত্রার পুরস্কার জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র তীর্থযাত্রার আসল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে তাদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলমান পবিত্র তীর্থযাত্রা করার জন্য তাদের বাড়ি, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা রেখে যায়, এটি তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে যখন তারা তাদের পরকালের শেষ যাত্রা করবে। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ভাল-মন্দ, তাদের সাথে থাকে।

যখন একজন মুসলমান তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় এটি মনে রাখে তখন তারা এই দায়িত্বের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবে। এই মুসলিম একটি পরিবর্তিত ব্যক্তি হিসাবে দেশে ফিরে আসবে কারণ তারা এই জড় জগতের অতিরিক্ত দিকগুলিকে একত্রিত করার চেয়ে পরকালে তাদের চূড়ান্ত যাত্রার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। তারা মহান আল্লাহর হুকুম পালনে সচেষ্ট থাকবে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের পূর্ণ করার জন্য দুনিয়া থেকে নেয়া। প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন অপচয়, অত্যধিকতা বা বাড়াবাড়ি ছাড়া।

মুসলমানদের পবিত্র তীর্থযাত্রাকে ছুটির দিন এবং কেনাকাটা করার জায়গা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় কারণ এই মনোভাব এর উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেয়। এটা অবশ্যই মুসলমানদের পরকালে তাদের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে যে যাত্রার কোনো প্রত্যাবর্তন নেই এবং দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই। শুধুমাত্র এটিই একজনকে পবিত্র তীর্থযাত্রা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে।

মাইগ্রেশনের 11 তম বছর

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর শেষ অসুস্থতা

একটি সূক্ষ্ম পছন্দ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি জনসাধারণ খুতবা দিয়েছিলেন যেখানে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মহান আল্লাহর একজন বান্দাকে পৃথিবীতে যা আছে এবং মহান আল্লাহর কাছে যা আছে তার মধ্যে একটি পছন্দ দেওয়া হয়েছে, এবং বান্দা আল্লাহর কাছে যা আছে তা বেছে নিয়েছিল। হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন কেঁদে ফেললেন কারণ তিনি জানতেন যে বান্দা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যে কথাটি উল্লেখ করছেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 328-329 এবং সহীহ বুখারি, 3654 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের একটি মূল ধারণা বোঝা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যথা, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করতে দোষ নেই, তবে সেগুলি পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য এড়িয়ে চলাই উত্তম। কারণ এই ধরনের মুসলিমরা প্রায়শই শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং মসজিদে বসবাস করে যখন তারা পার্থিব জিনিস কামনা করে। কিন্তু যদি তারা

তাদের গ্রহণ না করে তবে তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং বিরক্ত হয়ে যায় যার কারণে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করা বন্ধ করে দেয়। অথবা যদি তারা সেগুলি পায় তবে তাদের আনন্দ প্রায়শই তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে তারা যা চেয়েছিল তা অর্জন করেছে তাই মহান আল্লাহকে আর মান্য করার দরকার নেই। এই মুসলমানরা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, মানে, তারা মহান আল্লাহকে মান্য করে, শুধুমাত্র তখনই যখন এটি তাদের ইচ্ছা অনুসারে হয়। আর এই মনোভাবের কারণে তারা বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

এই মুসলিমরা দাবী করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর ইবাদত করছে, কিন্তু বাস্তবে তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং তারা যে উপহার ও আশীর্বাদ পেয়েছে তার পূজা করছে।

জান্নাতের মতো ধর্মীয় আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা প্রশংসনীয়, যেমনটি ইসলামী শিক্ষা দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা অনেক শ্রেয়, কারণ তিনিই এর যোগ্য এবং সৃষ্টিকর্তা তাঁর বান্দা।

যদি একজন মুসলমানের অবশ্যই উপহার এবং আশীর্বাদ কামনা করতে হয় তবে ধর্মীয় আশীর্বাদের লক্ষ্য করা সর্বোত্তম কারণ পার্থিব আশীর্বাদের লক্ষ্য একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে পারে যাতে তারা দাতার পরিবর্তে উপহারের উপাসনা করে।

সঠিকভাবে মানে ব্যবহার করা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি জনসাধারণের খুতবা দিয়েছিলেন যেখানে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে কেউ তাকে তাদের নফস ও ধন-সম্পদের জন্য বেশি অনুগ্রহ করে না। সহীহ বুখারী, ৩৬৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের দেওয়া নেয়ামত থেকে উপকৃত হওয়ার একমাত্র উপায় হল সেগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং একজন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

কেউ সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতে পারে যখন তারা এই দোয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

একজন মুসলমানের কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই কেবল একটি উপায় যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এটা নিজেই শেষ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ধন-সম্পদ হল এমন একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মাধ্যমে। এটি নিজেই একটি শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

এটি শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে না বরং যখনই তারা পার্থিব আশীর্বাদ হারাবে তখন এটি তাদের সাহায্য করে। যখন একজন মুসলমান প্রতিটি পার্থিব নিয়ামত যেমন একটি শিশুকে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিরাপদে পরকালে পৌঁছায় তখন তা হারানো তাদের উপর তেমন ক্ষতিকর

প্রভাব ফেলবে না। তারা দু: খিত হতে পারে, যা একটি গ্রহণযোগ্য আবেগ, কিন্তু তারা শোকগ্রস্ত হবে না যা অধৈর্যতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যা যেমন বিষণ্নতার দিকে নিয়ে যায়। এর কারণ হল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব নিয়ামত শুধুমাত্র একটি উপায় ছিল তাই এটি হারানো চূড়ান্ত লক্ষ্যে ক্ষতির কারণ হয় না, যেমন জান্নাত, যার ক্ষতি বিপর্যয়কর। অতএব, এখনও ধারণ করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা তাদের শোকগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপরন্তু, তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে জিনিসটি হারিয়েছে তা কেবল একটি উপায় ছিল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং পূরণ করার জন্য অন্য একটি উপায় সরবরাহ করবে। এটি তাদের শোক থেকেও রক্ষা করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে উপায়ের পরিবর্তে শেষ বলে বিশ্বাস করে, সে যখন তা হারাবে তখন তার পুরো উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গেছে বলে তিনি তীব্র দুঃখ অনুভব করবেন। এই শোক বিষণ্ণতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় নিজেরাই শেষ হিসাবে। এভাবেই একজন ব্যক্তি তাদের দ্বারা আবিষ্ট না হয়েও জিনিসপত্রের অধিকারী হতে পারে। এভাবেই তারা পার্থিব জিনিস তাদের হাতে রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়।

একজন উত্তরসূরি

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি জনসাধারণের খুতবা দিয়েছিলেন যেখানে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মসজিদের সমস্ত দরজা, যা লোকেরা নিজেদের জন্য তৈরি করেছিল, আবু বক্করের দরজা ব্যতীত, আল্লাহ তাআলার দরজাটি সিল করে দেওয়া উচিত। তার সাথে সন্তুষ্ট হন। সহীহ বুখারী, ৩৬৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রকাশ্য ঘোষণা ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরসূরি কে হবেন তার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। মসজিদে সরাসরি প্রবেশাধিকার নামাজের নেতার জন্য সংরক্ষিত, যিনি একই ব্যক্তি ছিলেন যিনি জনগণকে পরিচালনা করতেন এবং নেতৃত্ব দিতেন, ঠিক যেমন পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) করেছিলেন।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ভূমিকার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন কারণ তিনি সর্বোচ্চ সম্ভাব্য উপায়ে মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের দূত হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন করে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। মুসলমানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই দায়িত্ব পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর পছন্দের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া। ইসলাম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে কারণ ধার্মিক পূর্বসূরিরা এই দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল। যখন তারা উপকারী জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং তার উপর কাজ করেছিল তখন বহির্বিশ্ব তাদের আচরণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা

স্বীকার করেছিল। এর ফলে অগণিত মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। দুর্ভাগ্যবশত, আজকে অনেক মুসলিম বিশ্বাস করে যে ইসলাম সম্পর্কে অন্যদের দেখানো কেবল একজনের চেহারা, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা। এটি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার একটি দিক মাত্র। পবিত্র কুরআনে আলোচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবলম্বন করা এবং তাঁর ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় অংশ। শুধুমাত্র এই মনোভাব নিয়েই বহির্বিশ্ব ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ অবলোকন করবে। একজন মুসলমানের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতাকারী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে ইসলামিক চেহারা গ্রহণ করা শুধুমাত্র বহির্বিশ্বে ইসলামকে অসম্মান করার কারণ হয়। তাদের এই অসম্মানের জন্য দায়ী করা হবে কারণ তারা এর কারণ। তাই একজন মুসলমানের উচিত ইসলামের বাহ্যিক রূপের পাশাপাশি ইসলামের অন্তর্নিহিত শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামের প্রকৃত দূত হিসেবে আচরণ করা।

উপরন্তু, এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানটি মুসলমানদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং বিচার দিবসে তারা এই ভূমিকা পালন করেছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। যেভাবে একজন বাদশাহ তাদের কূটনীতিক ও প্রতিনিধির উপর ক্রুদ্ধ হবেন যদি তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহান আল্লাহ সেই মুসলিমের উপর ক্রুদ্ধ হবেন যারা ইসলামের দূত হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়।

একটি ব্যবহারিক রোল মডেল

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। তার অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করলে তিনি একজন সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে জামআ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে আদেশ দেন যে, তিনি যেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জামাতের ইমামতি করতে বলেন। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন তিনি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে খুঁজে পেলেন না এবং সালাত দেরি করতে না চাইলে তিনি উমর ইবনে খাত্তাবকে বললেন তাকে, পরিবর্তে প্রার্থনা নেতৃত্ব. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন প্রার্থনা শুরু করেন তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্ঠস্বর শুনে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ, মহান এবং মুসলমানরা আবু বক্কর (রাঃ) ছাড়া অন্য কাউকে প্রত্যাখ্যান করেন না। তাকে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন উপস্থিত হলেন এবং লোকদের সাথে সালাত আদায় করলেন। পরবর্তীতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ বিন জামা'আ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমালোচনা করেন, যেহেতু তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিশ্বাস করতেন, তাঁকে নামাযের ইমামতি করার নির্দেশ দেন, অন্যথায় তিনি কখনই নামায পড়তেন না। তাই করেছে আবদুল্লাহ, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, ক্ষমা চেয়েছিলেন কিন্তু যোগ করেছিলেন যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সময় মসজিদ থেকে অনুপস্থিত ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে আবু বকরের পরে উমরের চেয়ে নামাজের ইমামতি করার যোগ্য আর কেউ নেই। , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন. ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 332-333-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, এই ঘটনাটি, অন্য অনেকের মতো, স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের প্রথম খলিফা হওয়ার পছন্দের পছন্দ ছিলেন। উপরন্তু, এই বিশেষ ঘটনাটি এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যে এটি

এমনকি ইঙ্গিত দেয় যে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে হবে।

লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই ধার্মিক আত্মাদের নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল কারণ তারা একজন ভাল নেতার গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই গুণটি সকল মুসলমানেরই গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত কারণ প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমান এবং অমুসলিমদের জন্য ইসলামের প্রতিনিধি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামী জ্ঞানের সমাবেশে যোগদানের জন্য একজনকে কয়েকদিন ভ্রমণ করতে হতো কিন্তু এখন অনলাইনে অসংখ্য বক্তৃতা পাওয়া যায়। তথাপি, ধার্মিক পূর্বসূরিদের চলে যাওয়ার পর থেকে সঠিক পথ সম্পর্কে অজ্ঞতা বেড়েছে। এর কারণ হল, কেউ কেউ পবিত্র কুরআনের আয়াত ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস মুখস্থ করে জ্ঞান অর্জন করেছেন, কিন্তু তাদের চরিত্র পরিশুদ্ধ করতে ব্যবহার করেননি। অর্থ, তারা তাদের জ্ঞানের উপর আমল করেনি। যারা এরূপ কাজ করবে তারা তাদের উপদেশের মাধ্যমে অন্যের হৃদয়ে প্রভাব ফেলার শক্তি হারাবে। কিছু লেকচারার হল নিউজ বুলেটিনগুলির মতো যেগুলি অন্যদেরকে কাজ করার জন্য উদ্দীপিত না করে শুধুমাত্র তথ্য প্রদান করে যার ফলে তাদের ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে অন্যদেরকে গাইড করার দায়িত্বে ব্যর্থ হয়। অমুসলিমরা মূলত একজন সফল মুসলমানের বাস্তব উদাহরণ না দেখে ইসলামের নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করছে। যারা ইসলাম প্রচার করতে চায় তাকে জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের চরিত্র পরিশুদ্ধ করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

যখন কেউ এইভাবে কাজ করে তখন একটু সঠিক জ্ঞান নিজের এবং অন্যদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। যদিও, যারা এই সঠিক মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের কাছে আরও জ্ঞান থাকতে পারে তবে এটি কারও উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। পবিত্র কুরআনে এই ধরনের ব্যক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

সবচেয়ে জ্ঞানী

আবু বক্কর, সমস্ত সাহাবীদের মত, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর কাজ করার জন্য নিবেদিত ছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তিনি এই এবং অন্যান্য অনেক আশীর্বাদপূর্ণ জিনিসগুলিতে তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, আবু বক্কর এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত অন্য কেউ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় আইনগত বিধান জারি করবেন না। তাকে। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা 18-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বক্কর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে তাঁর অন্তিম অসুস্থতার সময় জামাতের নামাজের ইমামতি করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন তাও প্রমাণ করে যে তিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। হযরত আবু বক্কর (রাঃ) জামাতের নামাজের ইমামতি করার বিষয়ে অনেক হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি, নং 682। একটি হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে, 1532 নম্বরে বলা হয়েছে যে, যিনি পবিত্র কুরআনে সর্বাধিক পারদর্শী (জ্ঞানী) তাকেই নামাজের ইমামতি করাতে হবে। আর যদি এই পদ্ধতিতে মানুষ সমান হয়, তাহলে যিনি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী তিনিই নামাজের ইমামতি করবেন। এটি ইঙ্গিত করে যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলিম ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে, তারা যে কল্যাণ কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই হাদিসটি এটাকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই প্রকৃত স্থায়ী কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল উপকারী পার্থিব জ্ঞান যেখানে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানে ভাল মিথ্যা তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কতজন মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও অনেক কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা জাগতিক জিনিসের উপর তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং বিশ্বাস করে যে সেখানে সত্য ভাল পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের কেবলমাত্র মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজ কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল

তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন ও আমল করার জন্য সংগ্রাম করবে।

সত্য নিশ্চিত করা

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, নিশ্চিত করেছেন যে নিম্নলিখিত আয়াতটি মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং বিশেষভাবে আবু বক্কর (রাঃ) এবং সাধারণভাবে অন্যদেরকে বোঝায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 33:

"এবং যিনি সত্য নিয়ে এসেছেন [হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং [যারা] তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন [আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু] - তারাই সৎকর্মশীল।"

ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৮ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি সর্বদাই তাঁর সকল বিষয়ে সত্যবাদিতা অবলম্বন করতেন, তাই তিনি ইসলামের সত্যকে অনায়াসে গ্রহণ করেছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা

ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। অধিকাংশ মৌখিক পাপ সংঘটিত হয় কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের

আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

পারস্পরিক পরামর্শ

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে নিম্নলিখিত আয়াতটি বিশেষভাবে আবু বক্কর এবং উমর ইবনে খাত্তাবকে নির্দেশ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং সাধারণত অন্যদের জন্য। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

"সুতরাং আল্লাহর রহমতে, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], আপনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন... এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করুন..."

ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৮ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত তাদের বিষয়ে কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করা। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতে স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যেমন তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকা হবে, তেমনি একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা।

উপরন্তু, একজন মুসলিম শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

জবাবদিহিতার ভয়ে

বলা হয়েছে যে, নিম্নোক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে অন্যদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। অধ্যায় 55 আর রহমান, আয়াত 46:

"কিন্তু যে তার রবের অবস্থানকে ভয় করে তার জন্য দুটি উদ্যান।"

ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৮-২৯ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তায়ালার অবস্থান বলতে বোঝানো যেতে পারে যখন বিচার দিবসে কেউ তাঁর সামনে দাঁড়াবে।

মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজের বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে পাপ করে। এই ব্যক্তি

কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসায়িক মাথা সঠিক পথে নিশ্চিত করবে এবং তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্টগুলি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করেছে তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

“সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

নবুওয়াতের হেফাজত করা

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, নিম্নোক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে আবু বকর এবং উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সাধারণভাবে অন্যদের জন্য। অধ্যায় 66 তাহরীমে, আয়াত 4:

"...কিন্তু যদি তুমি তার [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর বিরুদ্ধে সহযোগিতা কর - তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তার অভিভাবক, জিব্রাইল এবং মুমিনদের সৎকর্মশীল..."

ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৮-২৯ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করার সারমর্ম হল আন্তরিকতা।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান,

উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"... আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাই] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

অভিভাবকদের সম্মান করা

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছেন যে, নিম্নোক্ত আয়াতগুলো বিশেষভাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে অন্যদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 15-16:

“আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের সাথে বহন করেন এবং কষ্ট সহ্য করে তাকে প্রসব করেন এবং তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ মাস। [তিনি বড় হতে থাকেন] যতক্ষণ না, যখন সে পরিণত হয় এবং [বয়স] চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, "হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে এবং আমার পিতামাতার প্রতি আপনার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ হতে এবং সৎকাজ করতে সক্ষম করুন। যাকে আপনি আমার জন্য সৎ করে দেবেন এবং আমার সন্তানদের জন্যে আমি আপনার কাছে তওবা করেছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। তারাই তারা যাদের কাছ থেকে আমরা তাদের সর্বোত্তম কাজটি গ্রহণ করব এবং তাদের অপকর্ম উপেক্ষা করব, [তাদের] জান্নাতের সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত। [এটি] সত্যের প্রতিশ্রুতি যা তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা 29-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও অনেক পাঠ আলোচনা করা যেতে পারে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আচার-আচরণ থেকে একজন প্রধান বিষয় যা শিখতে পারে তার মধ্যে একটি হল পিতামাতার সম্মান করা।

পিতামাতার প্রতি সদয় হওয়া মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত বৈশিষ্ট্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের ১৭ অধ্যায় আল ইসরা, আয়াত 23-এর মতো অনেক জায়গায় পিতামাতার প্রতি সদয় হওয়াকে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার পাশে রেখেছেন:

" আর তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। আপনার সাথে থাকা অবস্থায় তাদের একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হউক, তাদের [এতটা] বলবেন না, "উফ," [1] এবং তাদের তাড়িয়ে দিও না, বরং তাদের সাথে ভালো কথা বল।"

প্রকৃতপক্ষে এই একই আয়াত মুসলমানদেরকে তাদের পিতামাতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে নিষেধ করে। পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাকে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে একত্রিত করেছেন। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 14:

"... আমার এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও..."

যদিও, পিতামাতার সাথে সদয় আচরণ করার আদেশ দেওয়ার জন্য অসংখ্য হাদিস রয়েছে, সুনানে ইবনে মাজা, 3662 নম্বরে পাওয়া একটি মাত্র হাদিসই এর গুরুত্ব বোঝার জন্য যথেষ্ট। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন একজনকে উত্তর দিয়েছিলেন যিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে তারা সন্তানের জান্নাত বা জাহান্নাম ঘোষণা করে পিতা-মাতার অধিকার কী। অর্থ, কেউ যদি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পিতামাতার সাথে সদয় আচরণ করে, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে । কিন্তু যারা তাদের পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তারা এর কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

যদিও, পিতামাতার আনুগত্য করা, যতক্ষণ না এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে জড়িত না হয়, এটি খুব কঠিন, বিশেষ করে, এই দিন এবং যুগে মুসলমানদের ধৈর্য ধরে থাকার চেষ্টা করা উচিত এবং তাদের পিতামাতার সাথে তর্ক না করা উচিত। যদি কোন মুসলমান তাদের সাথে একমত না হয় তবে তারা সর্বদা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখতে পারে এবং এখনও করা উচিত।

একটি মহৎ প্রত্যাবর্তন

এক অনুষ্ঠানে, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর কিছু সাহাবীর উপস্থিতিতে পাঠ করা হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন: অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 27- 30:

"[ধার্মিকদের বলা হবে], "হে নিশ্চিন্ত আত্মা। তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও, সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট হয়ে। এবং আমার [ধার্মিক] বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে এই প্রত্যাবর্তন যাত্রা সত্যিই সুন্দর ছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উত্তর দিলেন যে একজন ফেরেশতা তার মৃত্যুর সময় তাকে এই কথাগুলো বলবেন। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, ৩৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আশ্বস্ত আত্মার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি, যা এই আয়াতগুলি এবং আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চরিত্র দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, মহান আল্লাহর আদেশ ও পছন্দের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হওয়া, যার ফলে একজন ব্যক্তিকে বজায় রাখা। সমস্ত পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য। এই বরকতময় স্তরটি অর্জন করার জন্য একজনকে অবশ্যই ইসলামিক জ্ঞান শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে যাতে বোঝা যায়

যে, মহান আল্লাহ সর্বদা মানুষের জন্য সর্বোত্তম কী তা নির্ধারণ করেন, যদিও তাঁর পছন্দের পিছনে প্রজ্ঞা সুস্পষ্ট না হয়।

উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা প্রায়শই জিনিসগুলি কেড়ে নেয় বা তাদের বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য অস্বাস্থ্যকর খাবারের মতো কিছু জিনিস পেতে বাধা দেয়। এই আচরণটি প্রায়ই শিশুকে দুঃখিত বা রাগান্বিত করে কারণ তারা তাদের পিতামাতার কর্মের পিছনে প্রজ্ঞা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকে। এই পিতামাতার আচরণ এমন কিছু যা সমাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় এবং সঠিকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে এটি একটি ভাল এবং দায়িত্বশীল পিতামাতার বৈশিষ্ট্য। একইভাবে, জীবনে মানুষ প্রায়শই মহান আল্লাহ কর্তৃক কিছু পার্থিব জিনিস পেতে হারায় বা বাধা দেয়। একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে পিতামাতারা তাদের সন্তানদের কাছ থেকে ক্ষতিকারক জিনিসগুলিকে দূরে রাখে যদিও তাদের সন্তানরা তাদের পছন্দের কারণ বুঝতে পারে না, একইভাবে মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও জ্ঞান অনুসারে এই পদ্ধতিতে কাজ করেন তাঁর সুরক্ষার জন্য। ভৃত্য এমনকি যদি মানুষ তার পছন্দের পিছনে প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে. অতএব, যখনই একজন মুসলিম নিজেকে এই পরিস্থিতিতে দেখতে পায় তাদের উচিত এই সহজ উদাহরণের প্রতি চিন্তা করা, যা তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে কেউ প্রত্যাখ্যান করবে না, যাতে তারা ধৈর্য ধরে থাকতে এবং মহান আল্লাহ তায়ালার খোদায়ী সুরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত হয়। তাদের মঞ্জুর করেছেন। তাদের রাগ এবং অধৈর্য হয়ে অপরিণত শিশুর মতো আচরণ করা উচিত নয় কারণ প্রাপ্তবয়স্করা শিশুদের চেয়ে ভাল আচরণ করার জন্য বোঝানো হয়। প্রকৃতপক্ষে, বাচ্চাদের এমন আচরণ থেকে মাফ করা হয় কারণ তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের এটির অভাব হওয়া উচিত নয় এবং তাই উভয় জগতে তাদের আচরণের জন্য দায়বদ্ধ হবে।

সম্পূর্ণ ভক্তি

নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু বক্কর (রাঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন যে, তিনি যদি তাকে আত্মহত্যার নির্দেশ দিতেন তবে তিনি তা করতেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘোষণা সত্য বলে নিশ্চিত করেছেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 66:

"এবং যদি আমরা তাদের উপর আদেশ দিতাম, "নিজেদের হত্যা কর" বা "নিজের বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাও", তবে তাদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া তারা তা করত না। কিন্তু যদি তারা তা করত যা তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তবে এটি তাদের জন্য আরও ভাল এবং [বিশ্বাসে তাদের জন্য] আরও শক্ত অবস্থান হত।"

ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, ৩৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুমের প্রতি তাঁর পূর্ণ ভক্তি এবং তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে। যার ঈমান যত মজবুত হবে, তারা তত বেশি আন্তরিকভাবে ইসলামের আদেশ-নিষেধের প্রতি আনুগত্য করবে।

সকল মুসলমানেরই ইসলামে বিশ্বাস আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের শক্তি ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে কারণ তাদের পরিবার তাদের বলেছিল যে তারা প্রমাণের মাধ্যমে এটিকে বিশ্বাস করে তার মতো নয় । যে ব্যক্তি কোন কিছুর কথা শুনেছে সে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না যেভাবে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এর একটি কারণ হল একজন মুসলমান ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে এটাই সর্বোত্তম উপায়। এটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততা যত বেশি শক্তিশালী তারা সঠিক পথে অবিচল থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, বিশেষত যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয়। উপরন্তু, সুনানে ইবনে মাজা, 3849 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন একটি সর্বোত্তম জিনিস হিসাবে বিশ্বাসের নিশ্চিত হওয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্ঞানটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শুধু একটি সত্য ঘোষণা করেননি বরং উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রমাণও দিয়েছেন। অতীতের জাতির মধ্যে যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায় তা নয়, উদাহরণগুলি যা নিজের জীবনে স্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো একজন ব্যক্তি কোনো জিনিসকে ভালোবাসে যদিও তা পেয়ে গেলে তাকে কষ্ট দেয়। একইভাবে, তারা একটি জিনিস ঘৃণা করতে পারে যখন তাদের জন্য অনেক ভাল লুকিয়ে আছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ইতিহাসে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে যেমন হুদাইবার চুক্তি। কিছু মুসলিম বিশ্বাস করেছিল যে এই চুক্তিটি, যা মক্কার অমুসলিমদের সাথে করা হয়েছিল, সম্পূর্ণভাবে পরবর্তী গোষ্ঠীর পক্ষে হবে। তবুও, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষপাতী ছিল। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, 2731 এবং 2732 নম্বরে পাওয়া হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ যদি তাদের নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা অনেক উদাহরণ পাবে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি তাদের জন্য খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে। এই উদাহরণগুলি এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা (বিচার দিবস) দেখবে যেদিন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে কিভাবে বড় বড় সাম্রাজ্য এসেছে এবং গেছে। কিন্তু যখন তারা চলে গেল তখন এমনভাবে চলে গেল যেন

তারা ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতেই ছিল। তাদের কয়েকটি চিহ্ন বাদে সবগুলি এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে যেন তারা পৃথিবীতে প্রথম স্থানে ছিল না। একইভাবে, যখন কেউ তাদের নিজের জীবনের প্রতি চিন্তাভাবনা করে তখন তারা বুঝতে পারে যে তারা যতই বয়সী হোক না কেন এবং নির্দিষ্ট কিছু দিন যতই ধীরগতির মনে হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন এখন পর্যন্ত ঝাঁকুনিতে কেটে গেছে। এই আয়াতের সত্যতা বোঝা একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততাকে শক্তিশালী করে এবং এটি তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এ ধরনের উদাহরণে পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে এই খোদায়ী শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবং জান্নাতের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া পথে অবিচল থাকবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

মহৎ চরিত্র

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার বলেছিলেন যে 360টি ভাল গুণ রয়েছে। আর যখনই মহান আল্লাহ কোন বান্দার জন্য মঙ্গল কামনা করেন তখনই তিনি তাদেরকে এই গুণাবলীর মধ্যে একটি দিয়ে দান করেন এবং এর মাধ্যমে তারা জান্নাতে প্রবেশ করে। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করেছিলেন যে, তাঁর মধ্যে এই সব ভালো গুণ আছে কি না, যার প্রতি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন যে সে সবই তাঁর আছে। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজনকে অবশ্যই আবু বক্করের আচরণ অনুকরণ করতে হবে, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং কাজ করে যাতে তারা তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে এবং তাদের ভাল গুণাবলী দিয়ে প্রতিস্থাপন করে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি মানুষের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম মহান আল্লাহকে সম্মান করার জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে দ্বিতীয় দিকটিকে অবহেলা করে। তারা এর গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। অর্থ, একজন ব্যক্তি যেভাবে সদয় আচরণ করতে চায় তাকেও অন্যদের

সাথে ভাল আচরণ করতে হবে অন্যথায় তারা সফল হবে না কারণ একমাত্র প্রকৃত সফল ব্যক্তিরাই বিশ্বাসী।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে এবং তাদের সম্পদকে তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 3318 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারণ সে একটি বিড়ালের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিল যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল। এবং সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মানুষকে ক্ষমা করা হয়েছিল কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ায়। এটা যদি ভালো চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় এবং পশুদের প্রতি খারাপ চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় তাহলে আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র দেখানোর গুরুত্ব কি কেউ কল্পনা করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, আলোচিত প্রধান হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী সে মুসলিমের মতো পুরস্কৃত হবে যে অবিরতভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিয়মিত রোজা রাখে।

কোনো ঈর্ষা নেই

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমাবেশগুলো দেয়ালের মতো না হওয়া পর্যন্ত আঁটসাঁট হয়ে থাকত। কিন্তু হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আসনটি, যেটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে ছিল, সর্বদা তাঁর জন্য খালি থাকত এবং কেউ তা কামনা করবে না। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এই মজলিসে যোগ দিতেন তখন তিনি তাঁর জায়গায় বসতেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখোমুখি হতেন এবং তাঁর বক্তৃতা তাঁর দিকে নির্দেশ করতেন, অন্যরা মনোযোগ সহকারে শুনতেন। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৪০-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বর্ণনাটি হিংসা এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি স্পষ্ট ছিল যে সাহাবীগণের কেউই, আল্লাহ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন না। বরং মহান আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে যে মর্যাদা দিয়েছেন তাতে তারা সন্তুষ্ট ছিল।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4210 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে হিংসা ভাল কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

হিংসা করা একটি গুরুতর এবং বড় পাপ কারণ হিংসাকারীর সমস্যা অন্য ব্যক্তির সাথে নয় বাস্তবে এটি মহান আল্লাহর সাথে, কারণ তিনিই সেই নিয়ামত যিনি ঈর্ষা করা হয় তাকে দিয়েছেন। সুতরাং একজন ব্যক্তির হিংসা শুধুমাত্র

মহান আল্লাহর বরাদ্দ এবং পছন্দের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ একটি ভুল করেছেন যখন তিনি তাদের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ বরাদ্দ করেছিলেন।

কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকার হল যখন হিংসাকারী আশীর্বাদ না পেলেও মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং মালিকের আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই প্রকারটি পাপ নয়, এটি অপছন্দনীয় বলে বিবেচিত হয় যদি হিংসা পার্থিব আশীর্বাদের উপর হয় এবং যদি তা ধর্মীয় আশীর্বাদের উপর হয় তবে প্রশংসনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যায় সে হল সেই ব্যক্তি যে বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং ব্যয় করে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যেতে পারে সেই ব্যক্তি যিনি তাদের জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করেন এবং অন্যকে তা শেখান।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত হিংসা করা ব্যক্তির প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঘোষণা করেছিলেন যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৪০-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালোবাসার নিদর্শন, মহান আল্লাহ তায়ালা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যারা ভালোবাসেন তাদের সকলকে ভালোবাসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, যদিও এটি তাদের সম্পর্কে কারও ব্যক্তিগত মতামতের বিরোধিতা করে। এই ভালবাসা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কথার মাধ্যমে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে ভালবাসা ঘোষণা করে। উদাহরণ স্বরূপ, এটা সকলের কাছে সুস্পষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নেককার পূর্বসূরিগণ এই প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা সেই ব্যক্তির উপর কর্তব্য যে মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। এটি অনেক হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যেমন সহীহ বুখারী, 17 নম্বরে পাওয়া একটি। এটি পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যকারীদের প্রতি ভালবাসা, অর্থাত্ পবিত্র নগরী মদিনার বাসিন্দারা। ঈমানের একটি অংশ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা ভন্ডামীর লক্ষণ। জামে আত তিরমিযী, 3862 নম্বরে পাওয়া অন্য একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে তারা যেন কোন সাহাবীর সমালোচনা না করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের ভালবাসা একটি চিহ্ন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা এবং তাদের ঘৃণা করা মহানবী (সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মহান আল্লাহকে ঘৃণা করার লক্ষণ। এই ব্যক্তি সফল হবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সুনানে ইবনে মাজা, 143 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বরকতময় পরিবার সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

যদি একজন মুসলিম অযৌক্তিকভাবে এমন কোন মুসলিমের সমালোচনা করে যারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করে, তাহলে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাব প্রমাণ করে। একজন মুসলমান যদি পাপ করে তবে অন্য মুসলমানদের পাপকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের উচিত হবে পাপী মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে কারণ তাদের আল্লাহ, মহানবী ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। অন্যদের ভালবাসার লক্ষণ হল তাদের সাথে সদয় এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত সেই সমস্ত লোকদের অপছন্দ করা যারা আল্লাহ, মহান এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবাসে তাদের প্রতি অপছন্দ দেখায়, সে ব্যক্তি আত্মীয় বা অপরিচিত নির্বিশেষে। একজন মুসলমানের অনুভূতি কখনই তাদের আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার এই নিদর্শন পূরণে বাধা দেবে না। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের ক্ষতি করবে বরং তাদের এটা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত যে, যারা মহান আল্লাহ ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে তাদের ঘৃণা করা অগ্রহণযোগ্য। যদি তারা এই বিপথগামী মনোভাবের উপর অটল থাকে তবে তাদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

পরিশেষে, আবু বক্কর এবং বাকি সাহাবীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের আত্মত্যাগকে সম্মান করা জড়িত মুসলমানদের নির্দেশের এই দুটি উৎসকে উপেক্ষা না করে শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে কেউ এটি অর্জন করতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যু

আল্লাহর প্রতি ভক্তি (SWT)

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। তাঁর অসুস্থতার আগে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে কোন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যু দ্বারা গৃহীত হবে না যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে তাঁর বিশ্রামের স্থান দেখতে পান এবং জীবনের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয়। এবং মৃত্যু। তার শেষ মুহুর্তে তিনি আকাশের দিকে তার দৃষ্টি তুলে ধরেন এবং সর্বোচ্চ সঙ্গী অর্থ, মহান আল্লাহর কাছে ঘোষণা করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 343-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কেন তারা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যখন কেউ মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিস লাভের জন্য তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে

পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যখন তারা তাদের গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা প্রায়ই ক্ষুব্ধ হয় যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা বাস্তবে মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের বিরোধিতা করে।

যদিও, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, তবুও যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা এই আয়াতে উল্লেখিত মত হয়ে যেতে পারে। পরকালে নাজাত পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক উত্তম। এই ব্যক্তি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, কারণ তিনিই তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলমান, যদি আন্তরিক হয়, তবে সকল পরিস্থিতিতে অবিচল থাকবে এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় আশীর্বাদ দেওয়া হবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তি যে পার্থিব নিয়ামত লাভ করবে তার চেয়ে বেশি।

মুসলমানদের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। পরিস্থিতি

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষণস্থায়ী আবাস থেকে চিরতরে স্বস্তিতে নিয়ে গিয়েছিলেন জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু ও সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ স্তরে একটি উঁচু স্থানে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

"... আশা করা যায় যে তোমার প্রভু তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

এবং অধ্যায় 93 আদ দুহা, আয়াত 4-5:

" এবং পরকাল তোমাদের জন্য প্রথম জীবনের চেয়ে উত্তম। আর তোমার প্রতিপালক তোমাকে দিবেন এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে।"

তিনি তার দায়িত্ব সম্পন্ন করার পর মহান আল্লাহ তাকে অর্পণ করেছিলেন। তিনি তার জাতিকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং উভয় জগতের সর্বোত্তম দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং পৃথিবীতে ও আখেরাতে যা তাদের ক্ষতি করতে পারে তা থেকে তাদের বিরত রেখেছিলেন। সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক আল্লাহর শেষ রাসুল, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

সাঃ) এর মৃত্যুর পরের জীবন

বাধ্য থাকা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর মদিনাবাসী চরম উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। অতঃপর হযরত আবু বক্কর (রাঃ) মসজিদে নববীতে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 144 পাঠ করলেন:

"মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া নন। [অন্যান্য] রসূল তার পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তবে আপনি কি ফিরে যাবেন [অবিশ্বাসের দিকে]? আর যে তার গোড়ালিতে ফিরে যায় সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না..."

অতঃপর নিম্নোক্ত কথাটি বললেন: "আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবন দান করেছেন এবং তাঁকে জীবিত রেখেছেন যতক্ষণ না তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করেন। সুউচ্চ, সরল, তাঁর বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন এবং আপনাকে পথের উপর ছেড়ে দিলেন। এবং স্পষ্ট নিদর্শন এবং ব্যথা ছাড়া কেউ ধ্বংস হবে না. যাদের রব আল্লাহ, পরাক্রমশালী তাদের জানা উচিত যে, মহান

আল্লাহ জীবিত এবং কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। আর যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত করত, তাদের জানা উচিত যে তিনি মারা গেছেন। মহান আল্লাহকে ভয় কর হে মানুষ! তোমার দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং তোমার প্রভুর উপর ভরসা কর। মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। মহান আল্লাহর বাণী সম্পূর্ণ। মহান আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাকে সমর্থন করে এবং যারা তার ধর্মকে সম্মান করে। মহান আল্লাহর কিতাব আমাদের মাঝে রয়েছে। এটি আলো এবং নিরাময় উভয়ই। এর দ্বারা মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়েত দান করেছেন। এতে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ কী হালাল মনে করেন আর কোনটি হারাম। সৃষ্টির মধ্য থেকে কে আমাদের উপর (আমাদের আক্রমণ করার জন্য) অবতীর্ণ হয় তা আমরা পরোয়া করব না। যারা আমাদের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে আমরা জোরালোভাবে লড়াই করব যেভাবে আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে লড়াই করেছি। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 348-349-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বকর (রাঃ)- প্রথম খলিফা

সত্যকে সমর্থন করা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর মদিনাবাসী চরম উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। এ সময় মক্কা ও মদিনা থেকে আগত সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করতে সম্মত হন। সহীহ বুখারী, 3667 এবং 3668 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হল ভাল বিষয়ে অন্যদের সমর্থন করার গুরুত্ব। এটি এবং অন্যান্য হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে তাদের খলিফা হিসেবে অন্য কাউকে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এমনকি উমর বিন খাতাব নাম রেখেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর জন্য এটি ছিল কোনো যুক্তি বা সমস্যা ছাড়াই মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার উপযুক্ত সুযোগ। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সঠিক কাজটি করতে বেছে নেন এবং ভূমিকার জন্য সেরা ব্যক্তিকে নিয়োগ করে মুসলিম জাতিকে সাহায্য করেন। তিনি চিন্তা করেননি যে তিনি অন্য কাউকে সমর্থন করলে তার পদমর্যাদা এবং সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পাবে বা তাকে ভুলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, এই সঠিক পছন্দের পরেই তার সম্মান এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এমনকি ইসলামী প্রতিষ্ঠানও এইভাবে আচরণ করে না। যারা ভালো কিছু করে তাকে সাহায্য করার পরিবর্তে তারা প্রায়শই শুধুমাত্র যাদের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদের সমর্থন করে। তারা এমন আচরণ করে যেন অন্যদের ভালো কাজে সহযোগিতা করলে তাদের সামাজিক মর্যাদা কমে যায়। কেউ কেউ আরও নীচে নেমে গেছে এবং তাদের বন্ধু এবং আত্মীয়দের খারাপ কাজে সমর্থন করে এবং অপরিচিতদের যারা ভাল করছে তাদের সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ইসলামী সম্প্রদায় দুর্বল হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু অন্য কিছুর চিন্তা না করে সর্বদা কল্যাণের বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন করে তাদের দায়িত্ব পালন করতেন। মুসলমানদের অবশ্যই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে যদি তারা উভয় জগতে শক্তি ও সম্মান চায়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

উপরন্তু, যদিও এটা স্পষ্ট ছিল যে আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, এমনকি মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দের পছন্দ ছিল, তবুও তিনি তাকে স্পষ্টভাবে মনোনীত করেননি। এর একটি কারণ হল, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু এবং নতুন নেতা মনোনীত করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা ছিল। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, নেতৃত্বের জন্য তর্ক করবেন এবং লড়াই করবেন নাকি মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করবেন এবং ভূমিকার জন্য সেরা ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন কিনা তা দেখার জন্য একটি পরীক্ষা। ইতিহাস পরিষ্কারভাবে

দেখায়, তারা উড়ন্ত রঙের সাথে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। অতএব, এটি তাদের জন্য একটি পরীক্ষা ছিল, এবং ভবিষ্যতের মুসলমানদের জন্য একটি পাঠ ছিল যে তারা সর্বদা অন্যদের ভাল কাজে সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হয়। উপরন্তু, যদি তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিযুক্ত হন, তবে ভবিষ্যতে কিছু লোক সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁর নিয়োগে সর্বসম্মতভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তারা কেবলমাত্র তারা এটা মেনে নিয়েছে কারণ তারা তা করতে আদেশ করেছিল। অতএব, একটি সুস্পষ্ট আদেশ এড়ানোর অনুমতি দেওয়া এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে বাধা দেয় কারণ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, এই অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতগুলির অধীনে তাদের নেতা নির্বাচন করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের প্রথম খলিফা হতে হবে। . এটি খলিফা হিসাবে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অধিকারকে আরও বৃদ্ধি করেছিল, যেমনটি তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক স্বাধীনভাবে নিযুক্ত ছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। .

নবী মুহাম্মদ (সা.) এর দাফন

জান্নাতের শ্রেষ্ঠ উদ্যান

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কে কোথায় দাফন করবেন তা নিয়ে অনিশ্চিত ছিলেন। কেউ মদিনায় তাঁর মসজিদের পরামর্শ দিয়েছেন এবং কেউ কেউ মদিনার প্রধান কবরস্থানের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি ঘোষণা দিয়ে তাদের একত্রিত করেছিলেন যে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একই স্থানে সমাহিত করা হয়েছে। মারা গেছে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এটি গ্রহণ করলেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে দাফন করা হয়েছিল যেখানে তিনি মারা গিয়েছিলেন: তাঁর স্ত্রীর ঘর, মুমিনদের মা আয়েশা রা. তার সাথে সন্তুষ্ট সুনানে ইবনে মাজা, 1628 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যানের মধ্যে রয়েছে। তাই তাদের কবরে নামার সময় তাদের জান্নাতের বাগানে রাখা হবে নাকি জাহান্নামের গর্তে রাখা হবে তা চিন্তা করা উচিত এবং তাই তারা যা চায় সে অনুযায়ী কাজ করে।

জামে আত তিরমিযী, 2460 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কবর হল জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত। এই হাদিসটি আরও ব্যাখ্যা করে যে যখন একজন সফল মুমিনকে তাদের কবরে স্থাপন করা হয় তখন তা তাদের জন্য প্রশস্ত এবং আরামদায়ক হয়ে ওঠে যেখানে একজন পাপী ব্যক্তির কবর তাদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষতিকারক হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় তখন তাদের সাথে জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত নিয়ে যায় অর্থাৎ তাদের আমল। একজন মুসলমান যদি মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়, তাহলে এটি নিশ্চিত করবে যে তারা প্রয়োজনীয় কাজগুলো প্রস্তুত করবে। তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন। কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তাহলে তাদের পাপ জাহান্নামের গর্ত তৈরি করবে যে তারা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বিশ্রাম পাবে।

অতএব, মুসলমানদের আজই কাজ করতে হবে এবং এই প্রস্তুতিতে দেরি না করে কারণ মৃত্যুর সময় অজানা এবং প্রায়শই হঠাৎ আসে। আগামীকালের জন্য দেরি করা একটি বোকামি এবং এটি কেবল অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের ঘরকে সুন্দর করার জন্য অনেক শক্তি এবং সময় ব্যয় করে তাদের অবশ্যই তাদের কবরকে সুন্দর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে কারণ সেখানে যাত্রা অনিবার্য এবং সেখানে দীর্ঘ সময় থাকা। এবং যদি কেউ তাদের কবরে কষ্ট পায় তবে এর পরে যা হবে তা আরও খারাপ হবে। সুনানে ইবনে মাজা, 4267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

ঐক্য

ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত হওয়ার পর, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু নেতৃত্বের কোনো ইচ্ছা না থাকায় তিনি পদত্যাগ করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রকাশ্যে এই আবেদন করেছিলেন এবং এটি ছিল আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, যিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কেউ তার পদত্যাগ চায়নি এবং তারা তার পদত্যাগ গ্রহণ করবে না। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে কিভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে সকল পরিস্থিতিতে অন্য সকলের চেয়ে এগিয়ে রেখেছিলেন, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময় জামাতের নামাজের নেতৃত্ব দেওয়া। এটি অনেক হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারিতে পাওয়া একটি, নম্বর 682। সমস্ত সাহাবী আলীর সাথে একমত হন এবং আবু বকরকে জোর দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের নেতৃত্ব দিন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 212-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বহু বছর পরে, তাঁর খিলাফতের সময়, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বেছে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রত্যেকেই তাদের ধর্মে (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম অসুস্থতার সময় তাদের জামাতের নামাজে নেতৃত্ব দিয়ে) এবং তাই সমস্ত সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের পার্থিব বিষয়ও। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা 5 এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বারা কল্যাণের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। মুসলমানদের অবশ্যই এই শিক্ষাগুলো গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে যাতে তারাও মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে একত্রিত হয়।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ

মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলিমকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যার প্রতি ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের অন্তর থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের

বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সম্মান ও সদয় আচরণ করে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করার জন্য কিন্তু তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসতে থাকা উচিত।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট আলেমকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তাদের উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করে। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন নির্দিষ্ট আলেমের অনুসারী মুসলমানের এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদেরকে অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে আলেমকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, মুসলমানদের একে অপরের থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে

ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরের বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানের উচিত অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়ানো যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্যান্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাজায় অংশ নেওয়া এবং তাদের উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের

উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

সুনানে আবু দাউদ 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমকে লাঞ্ছিত করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলিমকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান

আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তাই, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা মহান আল্লাহর সাথে যেভাবে যোগাযোগ করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপ অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জীবন, সম্পদ ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলিমকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিম সহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে ব্যবহার করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

আরও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা

ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে আবু বক্কর (রা.) এর মনোনীত সবসময়ই অনেক বিতর্কের বিষয়। সুন্নি ও শিয়া এই দুটি দলকে সত্যের উপর একত্রিত করার জন্য ইসলামের প্রথম খলিফা হওয়ার তার অধিকারের অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ নিয়ে সঠিকভাবে পরিচালিত পণ্ডিতরা প্রায়শই প্রচুর আলোচনা করেছেন। যদিও এটি একটি যোগ্য লক্ষ্য, তবুও গড়পড়তা মুসলমানদের এই আলোচনা বা অন্যান্য অনুরূপ আলোচনা যেমন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না, কারণ এই বিষয়গুলি মহান আল্লাহ তায়ালা করবেন। বিচার দিবসে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। এই বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 141:

"এটি এমন একটি জাতি যা অতিক্রম করেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

একজন মুসলমানকে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সঠিকভাবে পরিচালিত ছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ, তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 100:

“আর মুহাজিরগণ (মক্কা থেকে হিজরতকারী) এবং আনসার (মদিনার অধিবাসী) মধ্যে [ঈমানে] প্রথম অগ্রগামী এবং যারা সদাচরণে তাদের অনুসরণ করেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে উদ্যান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই বড় প্রাপ্তি।"

যেহেতু বিচার দিবসে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না, তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই বিচার দিবসে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে সেগুলিতে মনোনিবেশ করতে হবে। একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার এবং তার উপর আমল করার পরেই কি তাদের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের অধিকার রয়েছে। যেহেতু কার্যত কেউই এই স্তরে পৌঁছায়নি, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করবে, অর্থাত্ যে বিষয়গুলি নির্ধারণ করবে তারা জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে।

আবু বক্কর (রাঃ) এর খেলাফত

আবু বকর (রাঃ) এর প্রথম খুতবা

কর্তৃপক্ষের মধ্যে ন্যায়বিচার

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর মদিনাবাসী চরম উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করতে সম্মত হন। তাঁর প্রথম খুতবায় তিনি নিম্নলিখিতটি বলেছিলেন: “হে লোকসকল, আমি কর্তৃত্ব গ্রহন করেছি যদিও আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই (এটি সাহাবায়ে কেরাম হিসাবে তাঁর বিনয় প্রদর্শন, আল্লাহ তাদের বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তাদের মধ্যে সেরা)। যদি আমি ভাল করি, তাহলে আমাকে সাহায্য করুন। যদি আমি ভুল করি, তাহলে আমাকে সোজা করুন। সততা হল আনুগত্য; অসততা হল প্রতারণা। তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তারাই আমার দৃষ্টিতে শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তাদের দুর্বলতা দূর করতে পারি। তোমাদের মধ্যে শক্তিশালী তারাই দুর্বল যতক্ষণ না আমি তাদের কাছ থেকে মানুষের পাওনা আদায় করতে পারি, যদি মহান আল্লাহ তা চান। কোন মানুষই মহান আল্লাহ ব্যতীত মহান আল্লাহর পথে লড়াই ত্যাগ করে না, তাদেরকে অধঃপতনে আক্রান্ত করে। মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন সম্প্রদায়ের উপর কখনই বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে না, যার ফলে তারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আমার আনুগত্য করো যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মহান আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করি। আমি যদি মহান আল্লাহ ও তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবাধ্যতা করি,

তাহলে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো আনুগত্য আশা করব না। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 355-356-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজ বিমুখ হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করেছে। সহীহ বুখারি 6787 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের শাস্তি দিত যখন তারা আইন ভঙ্গ করত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নিজের মেয়ে অপরাধ করলে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি কার্যকর করবেন। যদিও সাধারণ জনগণের সদস্যরা তাদের নেতাদের তাদের ক্রিয়াকলাপে ঠিক থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে তবে তারা তাদের সমস্ত লেনদেন এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 3544 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথে লেনদেন করুক না কেন তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ স্বতন্ত্র স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে তবে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী অবস্থানে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা চান বা না চান তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবে।

তাঁর বক্তৃতার শেষ অংশটি নির্দেশনার দুটি উৎস যথা, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের আন্তরিকভাবে আনুগত্য ও অনুসরণের গুরুত্ব নির্দেশ করে, এটি ছাড়া একজন ব্যক্তি বা একটি সমাজও উন্নতি করতে পারে না। .

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলিম তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার এই দুটি সূত্রের ভিত্তি নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে এই দুটি দিকনির্দেশনার উত্স শিখতে এবং কাজ করতে মুসলিমদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই দুটি পথ নির্দেশনা শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে এবং শুধুমাত্র তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকাজের উপর কাজ করতে হবে যদি তাদের সময় ও শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

একটি সরল জীবন

হযরত আবু বক্কর (রা.) খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর, তাকে নিজের এবং তার পরিবারের জন্য রিজিক উপার্জনের জন্য বাজারে যেতে দেখা যায়। যেহেতু তার মনোযোগ এবং শক্তি জাতির বিষয়ে প্রয়োজন ছিল, তাই সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তার জন্য একটি সামান্য মজুরি নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 270-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ের রাজনীতিবিদদের মতই, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, বিলাসবহুল মজুরি দাবি করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা থেকে বিরত ছিলেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণে একটি সরল জীবনধারা অবলম্বন করেন।

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে তত কম তারা পার্থিব জিনিসের উপর চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি আখেরাতের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে তারা তত বেশি চাপ দেবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে।

একজন ন্যায্য নেতা

একবার, যখন মদিনাবাসীদের জন্য দান-খয়রাত বণ্টনের সময় এল, তখন হযরত আবু বক্কর (রা) লোকদের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত দাতব্য ভবনে প্রবেশ না করার নির্দেশ দেন। এক ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করল এবং এর ফলে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং লোকটি যে লাগামটি বহন করছিল তা নিয়ে তাকে আঘাত করল। পরে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে ডেকে পাঠালেন এবং তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে বললেন, যদিও লোকটি তার স্পষ্ট আদেশ অমান্য করেছিল। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সুপারিশ করলেন এবং লোকটিকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকারি কোষাগার থেকে কিছু দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 257-258-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যদের ক্ষতি করার পরিণাম সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। একটি সত্য, মুসলমানদেরও নিজেদেরকে পরিচিত করতে হবে।

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলিমকে অবশ্যই ঈমানের দুটি দিক পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে জীবন থেকে দূরে রাখে এবং অন্যদের সম্পত্তি।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু মানুষ এতটা ক্ষমাশীল নয় একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা তাদের মূল্যবান নেক আমল কিয়ামতের দিন কেড়ে নিয়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে। এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে। তাই উভয় জগতে সফলতা লাভের জন্য মুসলমানদের জন্য তাদের কর্তব্যের উভয় দিক পালনে সচেষ্ট হওয়া জরুরী।

একজন বিনয়ী নেতা

খলিফা হওয়ার পূর্বে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতিবেশীদের ছাগল দোহন করতেন। তারা ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি তার নিয়োগের পরে তাদের জন্য এটি করা বন্ধ করবেন কিন্তু তিনি তা করেননি এবং খলিফা হওয়ার আগে তিনি যে সৎকর্ম করেছিলেন তা চালিয়ে যান। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 273-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি তার অবস্থানকে তাকে অহংকারী করতে দেননি বরং তিনি তার নম্রতা বজায় রেখেছিলেন সারা জীবন। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 63:

"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে সহজে চলাফেরা করে..."

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়, সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ

তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয় জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজন হাঁটার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

"আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি

তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অভাবীদের সাহায্য করা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মদীনার এক বৃদ্ধা অন্ধ মহিলার প্রতিদিনের কাজকর্ম সেরে গোপনে তার দেখাশোনা করতেন। মাঝে মাঝে সে তার কাছে আসত এবং দেখতে পেত যে সমস্ত কাজ ইতিমধ্যে অন্য কেউ করেছে। এক অনুষ্ঠানে, তিনি তাড়াতাড়ি এসেছিলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন কে সেই অপরিচিত ব্যক্তি যিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন কারণ এটি অন্য কেউ নয়, তৎকালীন খলিফা হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা পৃষ্ঠা ৬৮-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি দরিদ্রদের সাহায্য করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

এটি শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্য নয় অন্যদের সাহায্য করার সব ধরনের অন্তর্ভুক্ত। অন্যের যেকোনো ধরনের বৈধ প্রয়োজন নিজের শক্তি অনুযায়ী পূরণ করা উচিত এবং যদি কোনো মুসলমান দেখতে পায় যে তারা এই সাহায্য প্রদান করতে পারে না, তাহলে তাদের উচিত একজন অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারে এমন কাউকে নির্দেশ করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্যকারীর মতো একই পুরস্কার পাবে। জামি আত তিরমিযী, 2671 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে অবশ্যই অন্যদেরকে এমনভাবে সাহায্য করতে হবে যাতে তাদের উপকার হয় শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান কামনা না করে কারণ এটি শুধুমাত্র তাদের পুরস্কার বাতিলের দিকে পরিচালিত করে। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

সহজভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমান যদি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবে তাদের প্রয়োজনের সময় অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা অন্যদের সাহায্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা তাদের প্রয়োজনের সময় আটকা পড়ে যেতে পারে।

মুসলমানরা যদি মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়, যাতে তারা আশীর্বাদ বৃদ্ধি পায়, তাহলে তাদের অবশ্যই ইসলামের নির্দেশ অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এর একটি দিক হল ভালো উপদেশের মতো যা কিছু আছে তা দিয়ে অভাবীদের সাহায্য করা।

একজনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা উচিত যা তাদের গর্বিত হতে বাধা দেবে। যথা, তারা অভাবীকে যে সাহায্য দেয় তা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাই মহান আল্লাহর মালিকানাধীন, এবং তাই তাদের অবশ্যই প্রকৃত মালিকের ইচ্ছানুযায়ী গরীবদের সাহায্য করার মাধ্যমে এটি ব্যবহার করতে হবে। বাস্তবে, দরিদ্ররা তাদের সাহায্যকারীকে একটি উপকার করছে কারণ তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে। প্রয়োজনে কেউ না থাকলে মানুষ অনেক পুরস্কার লাভের এই পদ্ধতিটি হারিয়ে ফেলত।

সমতা

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমাজের সকল সদস্যকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সমানভাবে ব্যবহার করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর খিলাফতকালে তিনি প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে সমান পরিমাণ সম্পদ বণ্টন করেছিলেন, তারা স্বাধীন হোক বা দাস। ইসলামের জন্য যারা সেবা ও ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদেরকে কেন তিনি বেশি কিছু দেননি এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, তাদের পুরস্কার মহান আল্লাহর কাছে, কিন্তু জীবিকা নির্বাহ ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে মানুষ তাঁর দৃষ্টিতে সমান। . ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 259-260-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোনো কাজ করার সময় একজন মুসলিমকে সর্বদা তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা উচিত, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের পুরস্কৃত করবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করবে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলিম সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে এই ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের থেকে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়ার অর্থ, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাই একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যে তার অধিকার এবং মানুষের অধিকার পূরণের মাধ্যমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের কিছু আছে বা তাদের আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

একটি দেহ

তাঁর খিলাফতকালে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু গরিব-দুঃখীদের প্রতি কড়া নজর রাখতেন। উদাহরণস্বরূপ, শীত মৌসুমে তিনি সরকারি তহবিল থেকে বিপুল পরিমাণ শীতবস্ত্র ক্রয় করতেন এবং মদিনার বিধবাদের মধ্যে বিতরণ করতেন। তার দুই বছরের রাজত্বকালে সরকারী কোষাগার থেকে প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করা হয়েছিল, যার সবই তিনি অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ২৬১-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সত্যই ইসলামের শিক্ষার উপর কাজ করেছিলেন যা একজনকে অন্যের অসুবিধার জন্য অনুভব করতে উত্সাহিত করে এবং তাই তাদের সামর্থ্য অনুসারে তাদের সহায়তা করে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোনো অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ তার ব্যথায় অংশ নেয়।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, নিজের জীবনে এতটা আত্মমগ্ন না হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে এমন আচরণ করা হয় যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘুরছে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যাগুলির উপর এত বেশি মনোযোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে যে তারা বড় চিত্রের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলে যা

অধৈর্যতার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি গাফিলতি করে যার ফলে তাদের উপায় অনুসারে অন্যদের সমর্থন করার ক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমানের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরেও প্রসারিত এবং এতে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য যেমন ভালো এবং আন্তরিক পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমানদের উচিত নিয়মিত সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা এবং যারা সারা বিশ্বে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে। এটি তাদের আত্মকেন্দ্রিক হওয়া এড়াতে এবং পরিবর্তে অন্যদের সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে সে একটি পশুর চেয়েও নিচু হয়, এমনকি তারা তাদের সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানকে তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্যদের জন্য কার্যত যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুদের চেয়ে উত্তম হওয়া উচিত।

যদিও একজন মুসলিম পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারে না কিন্তু তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন এবং আশা করেন।

সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা মেনে চলার জন্য উৎসাহিত করতেন এবং পার্থিব বিষয়ে সাহায্য করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 105 ব্যাখ্যা করে ভাল আদেশ এবং মন্দ নিষেধের গুরুত্ব নির্দেশ করেছিলেন:

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদেরই দায়িত্ব তোমাদের উপর। যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তুমি হেদায়েত পাবে..."

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মানুষ যদি সামর্থ্যের সময় একজন অন্যায়কারীকে বাধা না দেয় তবে মহান আল্লাহ সবাইকে শাস্তি দেবেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4338 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে। তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ভাল কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা ছেড়ে না দেওয়া। একজন মুসলমানের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলমান অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, শেষ পর্যন্ত তাদের নেতিবাচক আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম বা আপাত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফিল হয়ে গেলেও তাদের পরিবারের মতো তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ কেবল তাদেরই বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত তাদের নম্র উপায়ে পরামর্শ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেবলমাত্র এইভাবে তারা তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

শান্তি ছড়িয়ে দেওয়া

আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁর কর্তৃত্বের অবস্থানকে কখনই তাঁর সাথে অন্য সবার থেকে আলাদা আচরণ করার অনুমতি দেননি। উদাহরণ স্বরূপ, একবার এক ব্যক্তি মুসলমানদের একটি সমাবেশের কাছে এসে কেবলমাত্র আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন জানিয়েছিলেন। হযরত আবু বক্কর (রাঃ) সেই ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যেন সমাবেশে উপস্থিত সকলকে শান্তির শুভেচ্ছা জানানো হয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 280-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 12 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের মধ্যে পাওয়া একটি ভাল গুণের পরামর্শ দিয়েছেন। যথা, চেনা ও অপরিচিত লোকেদের কাছে শান্তির ইসলামি অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া।

এই ভাল বৈশিষ্ট্যের উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকাল মুসলমানরা প্রায়শই কেবল তাদের পরিচিতদের কাছে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা প্রচার করে। এটি সবার কাছে ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মানুষের মধ্যে ভালবাসার দিকে নিয়ে যায় এবং ইসলামকে শক্তিশালী করে। প্রকৃতপক্ষে, এই বৈশিষ্ট্যটি সহীহ মুসলিম, 194 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

একজন মুসলিমের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তারা অন্যদের কাছে প্রসারিত শান্তির প্রতিটি শুভেচ্ছার জন্য ন্যূনতম দশটি পুরস্কার পাবে এমনকি অন্যরা তাদের উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেও। সুনানে আবু দাউদ, 5195 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত শান্তির ইসলামী অভিবাদনকে সঠিকভাবে পূরণ করা উচিত অন্যদের প্রতি তাদের অন্যান্য বক্তব্য ও কর্মে এই শান্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে দূরে রেখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুসলিম এবং মুমিনের সংজ্ঞা।

সমস্যা ছোট করা

তিনি যতই ব্যস্ত ছিলেন, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা অন্যদের কষ্ট অনুভব করতেন এবং তাদের দুঃখ ও কষ্টের সময়ে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী কঠোর পরিশ্রম করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার একজন শোকাহত ব্যক্তিকে তাদের মনে করিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে ধৈর্য্যের মধ্যে কোন ক্ষতি নেই এবং অধৈর্যের কোন লাভ নেই। সেই মৃত্যু তার আগে যা আসে তার চেয়ে কম গুরুতর এবং তার পরে যা আসে তার চেয়ে বেশি গুরুতর ছিল (একজন সঠিক পথপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য)। তিনি আরো বলেন, তারা যেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ক্ষতির কথা স্মরণ করে এবং এর ফলে তাদের কষ্ট তাদের কাছে সামান্য মনে হয় এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের পুরস্কার বাড়িয়ে দেন। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৮৯-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অসুবিধার মধ্য দিয়ে ধৈর্য অর্জনের একটি উপায় হল সবসময় তাদের কঠিন এবং আরও গুরুতর অসুবিধার সাথে তুলনা করা। যখন কেউ এটি করে তখন এটি তাদের সমস্যাটিকে ছোট এবং কম তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করবে। ফোকাসের এই পরিবর্তন একজন মুসলিমকে ধৈর্য ধরতে এবং মহান আল্লাহর প্রতি বাধ্য থাকতে সাহায্য করতে পারে। এটি একটি জাগতিক উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একজন গুরুতর মাইগ্রেনে আক্রান্ত ব্যক্তি এমনভাবে প্রভাবিত হতে পারে যে তাদের কাছে মনে হয় পৃথিবী তাদের চারপাশে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু এই একই ব্যক্তি যদি একটি জাহাজে থাকে যেটি একটি বরফখণ্ডে আঘাত হানে এবং একটি জমাট সাগরের মাঝখানে ডুবে যেতে পারে তবে তাদের গুরুতর মাইগ্রেনকে বড় ব্যাপার বলে মনে হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা সম্ভবত এটির দ্বারা মোটেও প্রভাবিত হবে না কারণ তাদের পুরো মনোযোগ আসন্ন জীবন-হুমকির বিপদের দিকে স্থানান্তরিত হবে, যেমন ডুবে যাওয়া জাহাজ। বিপদের সময় মুসলমানের এমনই আচরণ করা উচিত।

যখন তারা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে এটি আরও খারাপ হতে পারে এবং তারা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তার উপর ফোকাস করার চেষ্টা করে। এটি তাদের থেকে আরও কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা অন্যদের পর্যবেক্ষণ করে অর্জন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি পিঠের ব্যথায় ভুগছেন তিনি শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির বিষয়ে চিন্তা করতে পারেন। অথবা তারা মৃত্যু এবং বিচার দিবসের মতো অনেক বড় সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে পারে। এই তুলনা তাদের অসুবিধা এবং এর প্রভাবের তাত্পর্যকে কমিয়ে দেবে, যার ফলে তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ধৈর্য্য ও অবিচল থাকতে সাহায্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

ভাল উত্সাহিত

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রাসঙ্গিক এবং উপকারী বিষয়গুলির উপর জনসাধারণের সাথে সম্বোধন করতেন। তিনি সর্বদা অন্যদেরকে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং দয়া ও সম্মানের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে উত্সাহিত করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার একটি উপদেশ দিয়েছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পাঁচটি অন্ধকার বিষয় এবং পাঁচটি প্রদীপ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ২৮২-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি দুনিয়ার ভালোবাসাকে অন্ধকার এবং ধর্মপ্রাণকে প্রদীপের মতো বর্ণনা করেছেন।

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুগত জগত যা থেকে একজনকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত তা আসলে একজনের ইচ্ছাকে বোঝায়। এটি পাহাড়ের মতো ভৌত জগতের উল্লেখ করে না। এটি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, 14 নং আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে:

"মানুষের জন্য শোভিত হল সেই ভালবাসা যা তারা কামনা করে - নারী ও পুত্রের, সোনা ও রৌপ্যের স্তূপ, সূক্ষ্ম দানাদার ঘোড়া এবং গবাদি পশু এবং চাষের জমি। এটাই পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন [অর্থাৎ জান্নাত]।

এই জিনিসগুলি মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত এবং এর দ্বারা মানুষ পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত হয়। যখন কেউ তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকে তখন তারা বস্তুগত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই কারণেই যে মুসলমানের কাছে পার্থিব জিনিস নেই, তাকে তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার কারণে দুনিয়াবী বলে গণ্য করা যেতে পারে। অথচ, একজন মুসলমান যে জাগতিক জিনিসের অধিকারী, কিছু ধার্মিক পূর্বসূরিদের মতো, তাকে জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্ন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে কারণ তারা তাদের মন, হৃদয় এবং কর্ম তাদের সাথে কামনা করে না এবং দখল করে না। পরিবর্তে তারা চিরন্তন পরকালে মিথ্যা কামনা করে।

বিরত থাকার প্রথম স্তর হল অবৈধ ও অসার কামনা-বাসনা থেকে দূরে সরে যাওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত নয়। এই ব্যক্তি আখেরাতের দিকে মনোনিবেশ করার সময় তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। তারা এমন জিনিস এবং লোকদের থেকে দূরে সরে যায় যারা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পূরণ করতে বাধা দেয়।

পরিহারের পরবর্তী পর্যায় হল যখন কেউ তার প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য জড়জগত থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গ্রহণ করে। তারা এমন কিছুতে তাদের সময় ব্যয় করে না যা তাদের পরবর্তী জগতে লাভবান হবে না। সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া এক হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উপদেশ দিয়েছেন। তিনি একজন মুসলিমকে এই জড় জগতে একজন অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মানুষই তাদের গন্তব্য অর্থাৎ পরকাল নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করবে। তাদের মৃত্যু এবং পরকালের গমন কতটা নিকটবর্তী তা বোঝার মাধ্যমে একজন মুসলিম এটি অর্জন করতে পারে। মৃত্যু যে কোন সময় একজন ব্যক্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তা নয়, একজন দীর্ঘ জীবন যাপন করলেও মনে

হয় যেন তা এক মুহূর্তে চলে যায়। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে একজন ব্যক্তি চিরন্তন পরকালের জন্য মুহূর্তটি উৎসর্গ করে। এই জড়জগতে দীর্ঘ জীবনের আশা সংক্ষিপ্ত করা তাদেরকে সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করবে, তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং অন্য সব কিছুর চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। যে দীর্ঘায়ু কামনা করে সে বিপরীত আচরণে উদ্‌বুদ্ধ হবে।

বস্তুজগতে যিনি সত্যিকার অর্থে বর্জন করেন, তিনি একে দোষ দেন না, প্রশংসা করেন না। তারা যখন এটি লাভ করে তখন তারা আনন্দ করে না এবং যখন এটি তাদের অতিক্রম করে তখন তারা দুঃখিত হয় না। এই ধার্মিক মুসলমানের মন লোভের সাথে ক্ষুদ্র বস্তুজগতকে লক্ষ্য করার জন্য চিরন্তন পরকালের দিকে নিবদ্ধ।

বিরত থাকা বিভিন্ন স্তর নিয়ে গঠিত। কিছু মুসলমান তাদের অন্তরকে সমস্ত নিরর্থক ও অনর্থক পেশা থেকে মুক্ত করার জন্য বিরত থাকে যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারে এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 257 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় , যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের পার্থিব বিষয়ের যত্ন নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবেন। কিন্তু যে শুধু পার্থিব বিষয় নিয়েই চিন্তিত সে তাদের যন্ত্রের কাছে চলে যাবে এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের আধিক্য, যেমন অতিরিক্ত সম্পদের পেছনে ছুটবে, সে দেখতে পাবে যে তাদের উপর এর ন্যূনতম প্রভাব এই যে, এটি তাদের মহান আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করে। এটি এখনও সত্য এমনকি যদি একজন ব্যক্তি বস্তুজগতের অতিরিক্ত দিকগুলির সাধনায় কোনও পাপ না করে।

কেউ কেউ বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা হালকা করার জন্য দুনিয়া থেকে বিরত থাকে। একজনের কাছে যত বেশি সম্পত্তি থাকবে তত বেশি তাদের জবাবদিহি করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা যাদের ক্রিয়াকলাপ যাচাই-বাছাই করবেন, বিচারের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ বুখারি, ৬৫৩৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজনের জবাবদিহিতা যত কম হবে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা তত কম। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যারা পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে অধিকারী তারা কিয়ামতের দিনে খুব কম কল্যাণের অধিকারী হবে যারা উৎসর্গ করে। তাদের মাল ও সম্পদ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, কিন্তু এগুলো সংখ্যায় অল্প। এই দীর্ঘ জবাবদিহিতার কারণেই বিচারের দিন ধনী বা দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তিই কামনা করবে যে, পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাদের প্রতিদিনের রিজিক দেওয়া হয়েছে। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4140 নম্বরে পাওয়া হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিছু মুসলিম জান্নাতের আকাঙ্ক্ষার জন্য এই জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে যা এই জড় জগতের আনন্দকে হারাতে হবে।

কেউ কেউ জাহান্নামের ভয়ে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে। তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে এই জড় জগতের আধিক্যে কেউ যত বেশি লিপ্ত হয়, ততই তারা হারামের কাছাকাছি থাকে, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। জামি আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজা, 4215 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম। ধার্মিক হবে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু থেকে বিরত থাকে যা পাপ নয় এই ভয়ে যে এটি পাপ হতে পারে।

সর্বোত্তম স্তরের বিরত থাকা হল মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে যা চান তা বোঝা এবং তার উপর কাজ করা যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যথা, মহান আল্লাহর দাসত্ব থেকে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করা, জেনে রাখা যে তাদের রব বস্তুজগতকে পছন্দ করেন না। মহান আল্লাহ এই জড় জগতের বাড়াবাড়ির নিন্দা করেছেন এবং এর মূল্যকে তুচ্ছ করেছেন। এই ধার্মিক বান্দারা লজ্জিত হয়েছিল যে তাদের রব তাদের এমন কিছুর দিকে ঝুঁকে দেখবেন যা তিনি অপছন্দ করেন। এরাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা যেহেতু তারা শুধুমাত্র তাদের পালনকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এমনকি যখন তাদের এই দুনিয়ার বৈধ বিলাসিতা ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যদিও তাকে পৃথিবীর ভান্ডার দেওয়া হয়েছিল। সহীহ বুখারী, ৬৫৯০ নং হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এটিই চান। মহান আল্লাহ যেমন জড়জগৎকে অপছন্দ করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের প্রতি ভালোবাসার কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিভাবে একজন প্রকৃত বান্দা তাদের পালনকর্তা যা অপছন্দ করেন তাকে ভালবাসতে পারে এবং লিপ্ত হতে পারে?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দারিদ্র্যকে বেছে নিয়ে দরিদ্রদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং ধনীদেরকে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কীভাবে বাঁচতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। তিনি সহজে বিকল্পটি বেছে নিতে পারতেন এবং কার্যত ধনীদের দেখিয়ে দিতে পারতেন কিভাবে তাকে দেওয়া পৃথিবীর ভান্ডার নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং তিনি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে গরিবদেরকে সঠিকভাবে বাঁচতে শেখাতে পারতেন। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট কারণে দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যা তার প্রভু মহান আল্লাহর দাসত্বের বাইরে ছিল। এই বিরত থাকা সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের প্রথম সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আবু বক্কর সিদ্দিক, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার যখন তাকে মধুর সাথে মিষ্টি

জল দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি একবার এক অদৃশ্য বস্তুকে দূরে ঠেলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে জড় জগত তার কাছে এসেছে এবং তিনি তাকে একা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জড় জগত উত্তর দিল যে সে জড় জগত থেকে পালিয়ে গেছে কিন্তু তার পরে যারা থাকবে না। এ কারণে আবু বক্কর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, মধু মিশ্রিত পানি দেখে কেঁদেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে জড়জগত তাকে পথভ্রষ্ট করতে এসেছে। এই ঘটনাটি ইমাম আশফাহানীর, হিলিয়াত আল আউলিয়া, 47 নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রকৃতপক্ষে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, আনন্দ লাভের জন্য কখনো ভোজন বা পোশাক পরেননি বরং পরকালের জন্য প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করার সময় বস্তুগত জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করতেন। তারা অপছন্দ করত যখন জড়জগৎ তাদের পায়ে দাঁড় করানো হয় এই ভয়ে যে তাদের প্রতিদান আখেরাতের পরিবর্তে এই দুনিয়াতেই তাদের দেওয়া হয়েছে।

যে কেউ সত্যিকারের পরিহারকারী তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। মুসলমানদের এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় এবং দাবি করা উচিত যে তাদের হৃদয় মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত। যদি একজন ব্যক্তির হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় তবে তা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং তাদের কর্মে প্রকাশ পায় যা সহীহ মুসলিম, 4094 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যার অন্তর মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকে, সে যা গ্রহণ করে সৎ পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাদের প্রয়োজন জড়জগত থেকে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য জড় জগতের বাড়াবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটাই প্রকৃত বিরত থাকা।

দ্বিতীয় অন্ধকার ব্যাপারটি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেছেন, পাপ এবং এর প্রদীপ ছিল আন্তরিক তওবা।

পাপ শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে ছোট এবং বড় হিসাবে। সময়ের সাথে সাথে অনেক সংজ্ঞা একটি বড় পাপ ঠিক কি সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে. একটি সহজ শ্রেণীবিভাগ হল যে কোন পাপ যে শাস্তির জন্য ইসলাম ইসলামী সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে তা একটি বড় পাপ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ। আরেকটি শ্রেণীবিভাগ হল, যদি কোন পাপকে জাহান্নামের আগুন, মহান আল্লাহর ক্রোধ বা মহান আল্লাহর অভিশাপ উল্লেখ করা হয়, তবে তা একটি বড় গুনাহ। উদাহরণস্বরূপ, গীবত করা একটি বড় পাপ কারণ এটি পবিত্র কুরআনে অভিশপ্ত। অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1:

" ধিক্ প্রত্যেক গীবতকারী, নিন্দুকের জন্য।"

কিছু মুসলিম বিশ্বাস করে যে মাত্র সাতটি বড় পাপের কথা বলা হয়েছে সহীহ বুখারীতে ২৭৬৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে এই সাতটি বড় গুনাহ হলেও এর মানে এই নয় যে তারা মাত্র সাতটি। প্রকৃতপক্ষে , অন্যান্য হাদিস রয়েছে যাতে অন্যান্য বড় গুনাহ যেমন পিতামাতার অবাধ্যতার কথা বলা হয়েছে। এই হাদিসটি সহীহ বুখারি, ৬২৭৩ নম্বরে পাওয়া যায়। পূর্বে উদ্ধৃত হাদিসে ঘোষিত সাতটি বড় গুনাহ হল: শিরক, জাদু, একজন নিরপরাধকে হত্যা, আর্থিক স্বার্থের লেনদেন, এতিমের সম্পদ হস্তগত করা, যুদ্ধের ময়দানে পলায়ন করা এবং একজন নিরপরাধ নারীকে অভিযুক্ত করা। ব্যভিচার

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে , যখন কেউ ছোটখাট পাপ করে থাকে তখন ইসলামের দৃষ্টিতে তা বড় হয়ে যায়।

বড় গুনাহ শুধুমাত্র আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে মাফ করা হয় যেখানে বড় গুনাহ এড়িয়ে সৎ কাজ করার মাধ্যমে ছোট গুনাহগুলো মুছে ফেলা যায়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 31:

"তোমরা যদি বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকো যেগুলি থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, আমরা তোমাদের থেকে ছোট গুনাহ দূর করে দেব..."

আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। উন্নত, এবং মানুষ.

মুসলমানদের নিশ্চিত করতে হবে তারা আকার নির্বিশেষে সকল প্রকার পাপ এড়িয়ে চলে কারণ শয়তানের ফাঁদগুলির মধ্যে একটি হল সে ছোট ছোট পাপকে উপেক্ষা করতে মুসলিমদের উদ্‌বুদ্ধ করে। সব সময় মনে রাখতে হবে পাহাড় ছোট ছোট পাথর দিয়ে তৈরি।

তৃতীয় অন্ধকার বিষয় আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উল্লিখিত ছিল কবর এবং এর প্রদীপটি ঈমানের সাক্ষ্য দিচ্ছিল।

জামে আত তিরমিযী, 3120 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কবরে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে।

প্রথম প্রশ্ন হবে তোমার প্রভু কে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য একজন মুসলিমকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করলেই চলবে না, বরং এই বিশ্বাসকে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং ধৈর্যের সাথে তাঁর আদেশের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। এটিই প্রমাণ যা একজন মুসলমানকে তাদের কবরে সমর্থন করবে যখন তারা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমনকি কিছু অমুসলিমও মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তবুও তারা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা তাদের জীবনে সঠিকভাবে তাঁর আনুগত্য করেনি। যদি শুধুমাত্র তাঁর প্রতি বিশ্বাসই যথেষ্ট হত তাহলে এই অমুসলিমরা এই প্রশ্নে সফল হতেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তারা সফল হবে না।

পরের প্রশ্ন হবে আপনার ধর্ম কি? একজন মুসলমান যদি এর সঠিক উত্তর দিতে চায় তবে তাদের অবশ্যই কেবল ইসলামে বিশ্বাসী নয় বরং তাদের দৈনন্দিন জীবনে এর শিক্ষাগুলোকে বাস্তবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর সাথে এর শিক্ষাগুলো অর্জন ও তার ওপর কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা করা জড়িত। এ কারণেই সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৪ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিস অনুসারে দরকারী জ্ঞান অর্জনকে সকল মুসলমানের জন্য কর্তব্য করা হয়েছে।

এই হাদিস অনুযায়ী শেষ প্রশ্ন হবে আপনার নবী কে? উল্লেখ্য যে, অতীতের কিছু জাতিও তাদের নবীদের প্রতি ঈমান এনেছিল, কিন্তু তারা তাদের পদাঙ্ক সঠিকভাবে অনুসরণ না করায় তারা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে। একজন মুসলমান যদি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে চায় তাহলে তাদের কেবলমাত্র মৌখিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করতে হবে না, বরং সক্রিয়ভাবে তাঁর ঐতিহ্য শিখতে হবে এবং আমল করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য এটাই, অর্থাৎ বাস্তবিকভাবে তাদের অনুসরণ করা। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

মহান আল্লাহর রহমত, ভালবাসা এবং ক্ষমা, যা একজন মুসলিমকে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করবে শুধুমাত্র এই পদ্ধতির মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

চতুর্থ অন্ধকার বিষয় আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উল্লিখিত ছিল আখেরাত এবং এর প্রদীপ ছিল নেক আমল।

মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজের বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে পাপ করে। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসায়িক মাথা সঠিক পথে নিশ্চিত করবে এবং তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্টগুলি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করেছে তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

“সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

পঞ্চম অন্ধকার বিষয় আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উল্লিখিত ছিল আখেরাতের সেতু এবং এর প্রদীপ ছিল ঈমানের নিশ্চয়তা।

কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর যে সেতু স্থাপন করা হবে তা পার হওয়ার জন্য মানুষকে আদেশ করা হবে। এটি ইসলামিক শিক্ষায় ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, 6573 নম্বর হাদিস পাওয়া গেছে। এটি সতর্ক করে যে সেতুর উপর অত্যন্ত বড় হুক থাকবে যা তাদের কাজ অনুসারে মানুষকে প্রভাবিত করবে। কেউ কেউ তাদের দ্বারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, কেউ কেউ সেতু পার হওয়ার আগে প্রচণ্ড অত্যাচারের শিকার হবে, অন্যরা তাদের থেকে সামান্য আঘাতের সম্মুখীন হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের দ্বারা ধার্মিকদের কোন ক্ষতি হবে না। সহিহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস, 455 নম্বর, সতর্ক করে যে সেতুটি চুলের স্ট্র্যান্ডের চেয়ে সরু এবং তরবারির চেয়েও ধারালো।

এখান থেকে শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কর্ম অনুযায়ী সেতু অতিক্রম করবে। তাই মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে তারা নিরাপদে সেতু পার হতে চাইলে কোনো কর্তব্য অবহেলা না করা। তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আদেশ পালন করতে হবে এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি কর্তব্য । একজনের এটিকে অবহেলা করা উচিত নয় এবং কেবল আশা করা উচিত যে তারা যাদুকরীভাবে সেতুটি অপ্রতিরোধ্যভাবে অতিক্রম করবে।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি যে স্বাচ্ছন্দ্যে এই সেতুটি অতিক্রম করবে তা একটি দর্পণ হবে যে তারা এই পৃথিবীতে ইসলামের সরল পথে কতটা অবিচল ছিল। এই সরল পথই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

যে কেউ এই পথ পরিত্যাগ করবে সে সফলভাবে এই সেতু পার হতে পারবে না। সহজ কথায়, এই পৃথিবীতে যত বেশি সরল পথে অটল থাকবে, বিচারের দিন তারা তত সহজে জাহান্নামের সেতু অতিক্রম করবে। এই পৃথিবীতে সরল পথটি স্পষ্ট করা হয়েছে তাই মুসলমানদেরকে এটি অনুসরণ করার কোন অজুহাত নেই যার ফলে তারা বিচারের দিনে নিরাপদে সেতু অতিক্রম করতে পারবে।

একটি সুন্দর উপদেশ - 1

আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। নিম্নলিখিত খুতবাটি ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 282-283-এ আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি জনগণকে মহান আল্লাহর কাছে মঙ্গল কামনা করার আহ্বান জানান, কারণ এটাই ছিল সর্বোত্তম জিনিস, ঈমানের দৃঢ়তার পর তারা লাভ করতে পারে।

জামে আত তিরমিযী, 2346 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠে বিপদ থেকে নিরাপদ, সুস্থ ও সারাদিনের খাবার খায় সে যেন পৃথিবী জড়ো হয়ে গেছে। তাদের জন্য।

এই দিন এবং যুগে যেখানে বিশ্বের অনেক মানুষ অনিরাপদ দেশে বসবাস করছে, একজন মুসলিম যিনি নিরাপত্তার আশীর্বাদ পেয়েছেন, তাদের উচিত তাদের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে। ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের মসজিদে জামাতের নামাজ এবং জ্ঞানের ধর্মীয় সমাবেশের জন্য ভ্রমণের সুবিধা নেওয়া উচিত।

উপরন্তু, মুসলমানদের উচিত তাদের ধর্ম নির্বিশেষে অন্যদের নিরাপত্তার এই অনুভূতি প্রসারিত করা যাতে পুরো সমাজ বিপদ থেকে নিরাপদ হয়। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম বা বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সহজ কথায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করতে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে মান্য করে তাদের সুস্বাস্থ্যের সুবিধা নিতে হবে, কারণ এটি এমন একটি আশীর্বাদ যা প্রায়শই সত্যিই প্রশংসা করা হয় যতক্ষণ না এটি হারিয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারি, 6412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে, তারা দেখতে পাবে যে তারা অবশেষে তাদের সুস্বাস্থ্য হারালে তাঁর সমর্থন পাবে। কিন্তু যারা এই আশীর্বাদ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় তারা এই সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজনের স্বাস্থ্যের ব্যবহার করার মধ্যে একজনের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য এই বস্তুগত জগতে প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত।

একজন ব্যক্তির প্রধান উদ্বেগের একটি হল তাদের বিধান। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এটি তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তাদের প্রতিদিনের রিজিক লাভ করে তার উচিত তাদের অন্যান্য দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করা এবং আগামী দিনের জন্য পরিকল্পনা করা উচিত কারণ তাদের বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়েও মানুষকে সকল বিষয়ে সত্যবাদিতা অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন কারণ এটি তাকওয়ার সঙ্গী, উভয়ই জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। অথচ মিথ্যা বলা হচ্ছে অনৈতিকতার সঙ্গী এবং উভয়ই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। অধিকাংশ মৌখিক পাপ সংঘটিত হয় কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যও আহ্বান জানান।

জামে আত তিরমিযী, 2612 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি যে আচার-আচরণে সর্বোত্তম এবং তাদের পরিবারের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ তাদের নিজের পরিবারের সাথে খারাপ ব্যবহার করার সময় অ-আত্মীয়দের সাথে সদয় আচরণ করার খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করেছে। তারা এইভাবে আচরণ করে কারণ তারা নিজের পরিবারের সাথে সদয় আচরণ করার গুরুত্ব বোঝে না এবং তারা তাদের পরিবারের প্রশংসা করতে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমান কখনই সফলতা অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা ঈমানের উভয় দিক পূর্ণ করে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা। দ্বিতীয়টি হল মানুষের অধিকার পূরণ করা যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। নিজের পরিবারের চেয়ে এই ধরনের আচরণের অধিকার আর কারো নেই। একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের পরিবারকে এমন সব বিষয়ে সাহায্য করতে হবে যা ভালো এবং খারাপ জিনিস ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভদ্রভাবে সতর্ক করতে হবে। তাদের খারাপ কাজে তাদের অন্ধভাবে সমর্থন করা উচিত নয় কারণ তারা তাদের আত্মীয় এবং তাদের প্রতি কিছু খারাপ অনুভূতির কারণে তাদের ভাল বিষয়ে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয় কারণ এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদের পথ দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হল একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে, কারণ এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং কেবল মৌখিক নির্দেশনার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

পরিশেষে, একজনকে সাধারণত সব বিষয়ে নম্রতা বেছে নেওয়া উচিত, বিশেষ করে, যখন তাদের পরিবারের সাথে আচরণ করা হয়। এমনকি যদি তারা পাপ করেও তবে তাদের সতর্ক করা উচিত নম্রভাবে এবং তারপরও তাদের সাহায্য করা উচিত যেগুলি ভাল বিষয়গুলিতে সাহায্য করা উচিত কারণ এই দয়া তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার চেয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করার, একে অপরকে ঘৃণা না করার, অন্যের প্রতি হিংসা না করার এবং মহান আল্লাহর একত্রিত বান্দা হওয়ার জন্যও আহ্বান জানিয়েছিলেন।

অন্যদের সাথে এই সম্পর্ক অর্জনের সর্বোত্তম উপায়গুলির মধ্যে একটি হল তাদের সাথে আচরণ করা যেভাবে একজন মানুষের সাথে আচরণ করতে চায়।

সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে।

এর মানে এই নয় যে, এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে একজন মুসলমান তাদের ঈমান হারাবে। এর অর্থ হল, যতক্ষণ না তারা এই উপদেশের উপর আমল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমের ঈমান পূর্ণ হবে না। এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিম তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। এটি সহীহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত, নম্বর 6586। এটি পরামর্শ দেয় যে মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের একটি অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ ব্যথা ভাগ করে নেয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণা করা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে।

একজন মুসলিম তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে। এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভাল কামনা করতে বাধ্য করবে। সুতরাং বাস্তবে এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে, ক্ষমাশীল হওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষের মতো মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যের জন্য ভালো চাওয়া তাদের ভালো জিনিস থেকে হারিয়ে যেতে পারে। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য ভাল কামনা করার মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন আর্থিক বা মানসিক সমর্থন, যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করতে চান। অতএব, এই ভালবাসা কেবল কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে। এমনকি যখন একজন মুসলিম মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং অন্যের ইচ্ছার পরিপন্থী উপদেশ দেয় তখন তাদের উচিত এমনভাবে করা উচিত যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সদয় উপদেশ দিক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি পারস্পরিক ভালবাসা এবং যত্নের বিরোধিতাকারী সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন হিংসা। ঈর্ষা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদের অধিকারী হতে চায় যা শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন তা অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নিয়ামত বিতরণের

জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ এবং হিংসাকারীর নেক আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুনান আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যের কাছে থাকা হালাল জিনিসগুলি কামনা করতে হয় তবে তাদের উচিত অন্য ব্যক্তিকে না হারিয়ে একই বা অনুরূপ জিনিস দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা উচিত। আশীর্বাদ। এই ধরনের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তিকে হিংসা করা উচিত যে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হন যিনি তাদের জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারে ব্যবহার করেন।

একজন মুসলমানের উচিত শুধু অন্যের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য নয় বরং উভয় জগতের ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্যও ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার জন্য আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করে। এই ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা ইসলামে স্বাগত জানানো হয়েছে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 26:

"...সুতরাং এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই অনুপ্রেরণা একজন মুসলিমকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করতে এবং দূর করার জন্য নিজেদের মূল্যায়ন করতেও অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই

দুটি উপাদান অর্থকে একত্রিত করে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

তাই একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসার দাবি করা উচিত নয় বরং তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাতে হবে। আশা করা যায় যে এইভাবে অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর উদ্বেগ লাভ করবে। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যখনই তিনি স্বস্তি পাবেন তখনই তিনি মহান আল্লাহর সামনে লজ্জাবশত নিজের পোশাকে নিজেকে ঢেকে নেবেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 283-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আবু বক্কর (রা.) আল্লাহ তায়ালার ঐশ্বরিক উপস্থিতি সম্পর্কে ক্রমাগত সচেতন ছিলেন, যা তাকে এমন আচরণ করতে প্ররোচিত করেছিল।

সহীহ মুসলিমে 99 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইহসানের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন, যার অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে অনুবাদ করা যেতে পারে। এই শ্রেষ্ঠত্ব বলতে বোঝায় আল্লাহ, মহান ও সৃষ্টির প্রতি একজনের আচরণ ও আচরণ। পবিত্র কুরআন জুড়ে শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করার কথা বলা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 26:

" যারা উত্তম কাজ করেছে তাদের জন্য সর্বোত্তম [পুরস্কার] - এবং অতিরিক্ত ..."

সহীহ মুসলিমের ৪৪৯ ও ৪৫০ নম্বর হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন। এই আয়াতে অতিরিক্ত শব্দটি বোঝায় কখন জান্নাতবাসীরা আল্লাহর ঐশ্বরিক দর্শন লাভ করবে। , মহিমান্বিত। এই পুরষ্কার

সেই মুসলিমদের জন্য উপযুক্ত যারা শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করে। যেমন শ্রেষ্ঠত্ব মানে একজনের জীবন পরিচালনা করা যেন তারা মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য দিতে পারে, সর্বদা তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করে। যে ব্যক্তি একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ তাদের পর্যবেক্ষণ করতে পারে সে কখনই তাদের ভয়ে খারাপ আচরণ করবে না। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একবার কাউকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তারা সর্বদা এমন আচরণ করে যেন তারা প্রতিনিয়ত একজন ধার্মিক ব্যক্তির দ্বারা পরিলক্ষিত হয় যা তারা সম্মান করে। ইমাম তাবারানির আল মুজাম আল কাবীর , 5539 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে কাজ করে সে খুব কমই পাপ করবে এবং সর্বদা ভাল কাজের দিকে ধাবিত হবে। এই মনোভাব মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে এবং দুনিয়াতে পরীক্ষার আগুন এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হিসেবে কাজ করে। এই সতর্কতা নিশ্চিত করবে যে কেউ কেবল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে না, বরং এটি তাদের সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে উত্সাহিত করবে। যার শিখর হল আন্তরিকভাবে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এই ব্যক্তি জামি আত তিরমিযী, 251 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি পূরণ করবে, যা উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে।

শ্রেষ্ঠত্বের এই স্তরটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি সঠিক নিয়তে কাজ করে, যা সহীহ বুখারিতে পাওয়া হাদিস অনুসারে বিশ্বাসের ভিত্তি, নম্বর 1। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে এবং সঠিক নিয়তে ভাল আচরণ প্রদর্শন করে তার জন্য সাফল্য নিশ্চিত করা হয়, মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য। একজন ব্যক্তি যত বেশি ভালো কাজ করবে তার ঈমান ততই মজবুত হবে যতক্ষণ না তারা এমন একজন মুসলিম হয়ে ওঠে যারা গাফিলতি থেকে দূরে থাকে এবং ইসলামের

শিক্ষা অনুযায়ী তাদের পরকাল ও পার্থিব জীবনকে সুন্দর করার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করে থাকে।

আশংকা করা হয় যে, যারা মহান আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদেরকে এই পুরস্কারের বিপরীতে দেওয়া হবে। যেহেতু তারা মহান আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী দৃষ্টিকে ভয় না করে জীবনযাপন করেছে, তারা আখেরাতে তাকে দেখতে পাবে না। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 15:

“না! নিশ্চয়ই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সেদিন তারা বিভক্ত হবে।”

যারা মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কাজ করার পর্যায়ে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় তাদের অবশ্যই শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদীসে প্রদত্ত উপদেশের দ্বিতীয় অংশের উপর আমল করতে হবে। এই ব্যক্তির আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করছেন। যদিও এই অবস্থা তার চেয়ে নিম্ন স্তরের, যে ব্যক্তি এমনভাবে কাজ করে যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে, কোন অংশে কম নয়, এটি মহান আল্লাহকে সত্যিকারের ভয়কে অবলম্বন করার একটি দুর্দান্ত উপায়। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে এই মনোভাব একজনকে পাপ থেকে বিরত রাখবে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে। ইমাম তাবারানীর আল মুজাম আল কাবীর, ৭৯৩৫ নং নং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ অনুযায়ী, যে ব্যক্তি এই মানসিকতা অবলম্বন করার চেষ্টা করবে, বিচারের দিন আল্লাহ তাকে ছায়া দান করবেন। উচ্চাভিলাষী।

মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক উপস্থিতি পবিত্র কুরআন জুড়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 4:

কেন তিনি আপনার সাথে আছেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে মহান আল্লাহর ঐশী উপস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার সাথে আছেন যে তাকে স্মরণ করে। এই কারণেই হিলিয়াত আল আউলিয়া, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 84 এবং 85-এ বিশ্বস্ত সেনাপতি আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি চাকচিক্য ও আড়ম্বর থেকে দূরে ছিলেন। জড় জগতের এবং শুধুমাত্র একাকী রাতে সান্ত্বনা পাওয়া. অর্থ, তিনি মানুষের সাহচর্যের চেয়ে মহান আল্লাহর সাহচর্য চেয়েছিলেন।

মহান আল্লাহর স্বর্গীয় উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা অবলম্বন করা শুধুমাত্র পাপ প্রতিরোধ করে না এবং ভাল কাজের উত্সাহ দেয় তবে এটি একাকীত্ব এবং হতাশাকেও প্রতিরোধ করে। একজন ব্যক্তি খুব কমই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হয় যখন তারা ক্রমাগত এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে যে তাকে ভালবাসে এবং তাদের সাহায্য করে। মহান আল্লাহর চেয়ে সৃষ্টিকে কেউ বেশি ভালোবাসে না এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনিই সকল সাহায্যের উৎস। অতএব, শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করা একজনের বিশ্বাস, কর্ম, মানসিক অবস্থা এবং বৃহত্তর সমাজকে উপকৃত করে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের মত হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে যারা মহান আল্লাহকে তাদের পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে তুচ্ছ মনে করে। এটি একটি গুরুতর আধ্যাত্মিক ব্যাধি যা আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি সকল প্রকার পাপ এবং খারাপ আচরণের দিকে নিয়ে যায়।

ভয় এবং আশা

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর খুতবা দিয়ে মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তুলতেন কিন্তু মহান আল্লাহর রহমতের আশায় তাদের উৎসাহিত করার জন্য এটিকে পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ করতেন। এই ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির প্রায়শই বেশিরভাগ পাবলিক বক্তাদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয় যারা চরম মনোভাব গ্রহণ করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 283-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ ঐশী হাদীসে, মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি তাঁর বান্দাদের তাঁর উপলব্ধি অনুসারে কাজ করেন এবং আচরণ করেন। এর অর্থ হল যদি একজন মুসলমানের ভাল চিন্তা থাকে এবং মহান আল্লাহর কাছে ভাল আশা করে, তবে তিনি তাদের নিরাশ করবেন না। একইভাবে, কেউ যদি মহান আল্লাহ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে, যেমন বিশ্বাস করা যে তাকে ক্ষমা করা হবে না, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, যা এই হাদিসটি নির্দেশ করে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষমা করার প্রত্যাশা করে। এটা সত্য আশা নয় এটা নিছক ইচ্ছাপূরণ চিন্তা। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি কোনো বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হন, তাদের ফসলে জল দিতে ব্যর্থ হন এবং এখনও একটি বড় ফসল কাটার আশা করেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে এবং

যখনই তারা পিছলে যায় তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করে। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি বীজ রোপণ করেন, তাদের ফসলে জল দেন, ফসলকে সুস্থ রাখার জন্য প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেন এবং তারপরে একটি বড় ফসলের আশা করেন। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাখ্যাটি সংক্ষিপ্ত করেছেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের জীবনে মহান আল্লাহকে আরও বেশি ভয় করা, কারণ এটি এমন পাপগুলিকে বাধা দেয় যা আশার চেয়ে উচ্চতর যা একজনকে সৎ কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী ধরনের। কিন্তু অসুস্থতা ও অসুবিধার সময় এবং বিশেষ করে মৃত্যুর সময় একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়া আর কিছুই থাকা উচিত নয়, এমনকি যদি তারা তাদের জীবন তাঁর অবাধ্য হয়ে অতিবাহিত করে থাকে, যেমনটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) দ্বারা বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমের ২৮৭৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় শান্তি ও বরকত।

একটি সুন্দর উপদেশ - 2

আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। নিম্নোক্ত খুতবাটি ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 56 নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ তাদের কাছ থেকে অঢেল ও চিরস্থায়ী জিনিসের বিনিময়ে যা সামান্য ও সাময়িক ছিল তা ক্রয় করেছেন।

এই উপদেশটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করার জন্য এই জড় জগত ও পরকাল সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ও উপলব্ধি অবলম্বন করতে হবে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় জড় জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে

সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। পার্থিব আশীর্বাদ যাই হোক না কেন এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সর্বদা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা নেই। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যেটি তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে কখনও পৌঁছাতে পারে না।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর জলের ফোঁটাকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম শাশ্বত পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েও মানুষকে পবিত্র কুরআনকে আন্তরিকতার সাথে মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে এর বিস্ময় কখনও শেষ হয় না এবং এর আলো কখনও নিভে যাবে না। কিয়ামতের অন্ধকার মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে পবিত্র কোরআন থেকে আলো খোঁজার আহ্বান জানান তিনি।

পবিত্র কুরআনে অগণিত গুণাবলী রয়েছে যা এটিকে অন্য যেকোন জাগতিক গ্রন্থ থেকে আলাদা করে। পবিত্র কুরআনের এই দিকটি এতই তীব্র যে এটি অসংখ্য জীবনকাল ধরে ব্যাখ্যা বা আলোচনা করাও যায় না। তবে এই গুণগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হবে। সর্বপ্রথম, পবিত্র কুরআনে, মহান আল্লাহ, সমগ্র মহাবিশ্বকে (শুধু মানুষ নয়) একটি উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এবং এই ঐশী ওহী নাযিল হওয়ার সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের জন্যই নয় বরং সমস্ত সৃষ্টির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। সময়ের শেষ চ্যালেঞ্জ হল যদি লোকেরা বিশ্বাস করে যে পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ নয়, তাহলে তাদের উচিত এমন একটি অধ্যায় তৈরি করা যা পবিত্র কুরআনের একটি অধ্যায়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 23:

"আর আমরা আমাদের বিশেষ ভক্তের উপর যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি অধ্যায় নিয়ে আস এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীদের ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

সমগ্র গ্রহে এমন কোনো বই নেই যা এই ধরনের ওপেন চ্যালেঞ্জ দিতে পারে এবং দিয়েছে। কিন্তু 1400 বছরেরও বেশি আগে পবিত্র কুরআন সমগ্র বিশ্বকে এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ অমুসলিমরা জয়ী হতে পারেনি এবং এটি কখনও ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে না।

পবিত্র কুরআনের আরেকটি গুণ হল এটি ভবিষ্যতের ঘটনার ফলাফল বর্ণনা করেছে। কিন্তু এই বিবৃতিগুলির আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে ফলাফলগুলি তখন অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ অধ্যায় 48 আল ফাত, আয়াত 28:

"তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত সহ প্রেরণ করেছেন সত্যের দ্বীন যাতে তিনি একে অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারেন এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন সমগ্র মক্কা নগরীই ইসলাম ছিল তাই মক্কাবাসীরা যখন এই আয়াতটি শুনেছিল, দুর্ভাগ্যবশত তাদের জন্য, তারা বিশ্বাস করেছিল যে ইসলাম খুব দুর্বল এবং তাই বেশিদিন টিকে থাকবে না এবং অবশ্যই মক্কার সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়বে না। সমগ্র বিশ্ব একা। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে মহান আল্লাহ এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন।

পবিত্র কুরআন কীভাবে ভবিষ্যতের একটি ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যা সেই সময়ে অকল্পনীয় ছিল তার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 30 আর রুম, 2-5 আয়াতে:

“রোমানরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী ভূমিতে এবং তাদের পরাধীনতার পর তারা শীঘ্রই পরাস্ত হবে। আপনি উত্তর দিবেন না। হুকুম শুধু আল্লাহর আগে ও পরে। আর সেদিন মুমিনগণ আনন্দ করবে। আল্লাহর সাহায্যে তিনি যাকে খুশি সাহায্য করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী ও দয়ালু।"

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলি এমন এক সময়ে নাজিল হয়েছিল যখন রোমানরা (খ্রিস্টানরা) পারস্যদের (অগ্নি উপাসকদের) সাথে যুদ্ধ করছিল। অনেক প্রামাণিক ঐতিহাসিক বই দ্বারা এই যুদ্ধ নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বিশেষ সময়ে পারস্যরা যুদ্ধ জয়ের দ্বারপ্রান্তে ছিল। এক পর্যায়ে রোম নিজেই পারস্যদের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেছেন যে রোমানরা শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে রাজত্ব করবে। মক্কার অমুসলিমরা যারা নিজেরাই মূর্তিপূজারী ছিল তারা পারস্যদের পক্ষ নিয়েছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একমত হয়েছিল যে রোমানদের পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু মহান আল্লাহ সর্বদা এই আয়াতগুলোকে সত্য প্রমাণ করেছেন এবং রোমানদের বিজয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

একটি চূড়ান্ত উদাহরণ যা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন করে, আল আম্বিয়া অধ্যায় 21, আয়াত 33 এ দেখা যায়:

“আর তিনিই রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। একেকজন একেক পরিধিতে ভাসছে।"

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীরা সৌরজগৎ ঠিক কীভাবে সাজানো হয়েছে তা নিয়ে তত্ত্ব নিয়ে লড়াই করেছেন যেমন সূর্য স্থির থাকে এবং পৃথিবী চারপাশে ঘোরে বা তার বিপরীতে। শুধুমাত্র তুলনামূলকভাবে সম্প্রতি এটি বিভিন্ন ধর্ম এবং পটভূমি থেকে বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিটি বস্তু; সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবী সকলেই তাদের নিজস্ব অক্ষের উপর ঘুরছে এবং একটি সেট কক্ষপথে একে অপরের চারপাশে ঘোরে। কিন্তু মহান আল্লাহ 1400 বছর আগে এটি ঘোষণা করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কিত সকল আয়াত আজ বিজ্ঞানীদের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রমাণিত হচ্ছে। এটি প্রমাণের একটি বিশাল অংশ যা প্রমাণ করে যে পবিত্র কুরআন এক এবং একমাত্র সত্য ঈশ্বরের বাণী, মহান আল্লাহ, যিনি এই মহাবিশ্ব এবং এর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, কারণ শুধুমাত্র একজন স্রষ্টাই তার সৃষ্টিকে সত্যিকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

যদিও পবিত্র কুরআনের অনেক আদেশ মানুষ বুঝতে পারে না তার মানে এই নয় যে সেগুলি ভুল। পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত যার জ্ঞান মানুষের কাছে লুকিয়ে ছিল তা প্রকাশ পায় যখন সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছেছিল। যেহেতু পুরো পবিত্র কুরআন একটি প্রজ্ঞা ও দিকনির্দেশনার গ্রন্থ তাই কেউ এর নির্দেশ বুঝুক বা না বুঝুক তা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। এই পরিস্থিতিটি ঠিক এমন একটি শিশুর মতো যে ঠান্ডায় ভুগছে এবং আইসক্রিম খেতে চায় কিন্তু তাদের পিতামাতা তা দেয় না। পিছনের জ্ঞান না বুঝেই শিশু কাঁদতে থাকবে কিন্তু যাদের জ্ঞান আছে তারা পিতামাতার সাথে একমত হবেন যদিও বাহ্যিকভাবে মনে হয় যেন পিতামাতার সিদ্ধান্ত সন্তানের প্রতি অন্যায় করছে।

পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করার সময় যে কেউ বুঝতে পারবে যে এটি আলোচনা করা সুস্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম উভয় অর্থের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের বিভিন্ন স্তর ধারণ করে। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 1:

"...[এটি] এমন একটি কিতাব যার আয়াতগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে এবং তারপর [যিনি] জ্ঞানী ও সচেতন তার কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।"

এটির অভিব্যক্তিগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি একটি সহজ সরল সামনের উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর আয়াতগুলি অত্যন্ত বাগ্মী এবং অন্য কোন পাঠ এটিকে অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতির কাহিনীও বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রতিটি ধরণের ভাল কাজের আদেশ দিয়েছে এবং প্রতিটি ধরণের মন্দকে নিষেধ করেছে, যা একটি ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং যা একটি সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা ঘরে এবং সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন কবিতা এবং গল্পের বিপরীতে অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা মিথ্যা থেকে মুক্ত। পবিত্র কুরআনে ছোট বা দীর্ঘ সব আয়াতই উপকারী। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয় তখন তা থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। অন্য সব বইয়ের মতো পবিত্র কুরআন বারবার পাঠ করলে বিরক্ত হয় না এবং সত্য সন্ধানকারী কখনোই এটি অধ্যয়নে বিরক্ত হয় না। পবিত্র কুরআন শুধু সতর্কবাণী ও প্রতিশ্রুতিই দেয় না বরং অটল ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। পবিত্র কুরআন যখন বিমূর্ত মনে হতে পারে এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, এটি সর্বদা এটি বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং বাস্তব উপায় প্রদান করে। এটি একজনকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে এবং একটি সহজ কিন্তু গভীর উপায়ে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে উত্সাহিত করে। এটি সরল পথকে পরিষ্কার এবং আবেদনময় করে তোলে যিনি উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্য কামনা করেন। এর মধ্যে থাকা জ্ঞান নিরবধি এবং প্রতিটি সমাজ ও যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজ যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তার

প্রতিকার এটি। যেসকল সমাজ পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছে তা দেখার জন্য একজনকে কেবল ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে, যাতে এর সমস্ত জুড়ে থাকা উপকারিতা বোঝা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হলেও পবিত্র কোরআনে একটি অক্ষরও সম্পাদনা করা হয়নি কারণ মহান আল্লাহ তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিহাসের অন্য কোনো বই এ গুণের অধিকারী নয়। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা এর রক্ষক হব।"

নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা, যিনি তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তিই এর দ্বারা উপকৃত হবেন যিনি সত্যের সন্ধান করেন যেখানে তাদের আকাঙ্ক্ষার অন্বেষণকারীরা কেবল শুনতে এবং অনুসরণ করা কঠিন হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ফেরেশতারা তাদের কাজগুলি পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করছে।

এটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তারা কেয়ামতের দিন এবং তাদের চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশে পৌঁছানোর আগে নিজেকে সংশোধন করার জন্য ক্রমাগত তাদের কাজ এবং কথাবার্তা মূল্যায়ন করতে।

নিছক ইবাদত করলে কাউকে ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করা যাবে না। মুসলমানরা কেবল তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেই এই স্তরে পৌঁছাতে পারে। এটি তাদের কাছে থাকা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সরিয়ে দিয়ে এবং তাদের ভাল বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করে অর্জন করা হয়। কিন্তু এটি শুধুমাত্র গুরুতর প্রতিফলন এবং স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জন করা হয়।

যখন কেউ তাদের নিজস্ব বাস্তবতাকে চিনতে পারে তখন এটি তাদের সেবকের মতো জীবনযাপন করতে এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উত্সাহিত করবে। এটি তাদের মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পরিচালিত করবে, যা চূড়ান্ত লক্ষ্য। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এই আত্ম-মূল্যায়ন একজনকে তাদের চরিত্র এবং আত্মাকে মন্দ বৈশিষ্ট্য থেকে শুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অত্যাবশ্যক, যা উভয় জগতের সাফল্যের পথ। কেউ কেউ বস্তুগত জগতে এতটাই হারিয়ে যায় যে তারা কখনই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করে না এবং তাই তাদের এক বিট পরিবর্তন না করেই কয়েক দশক কেটে যায়। দুর্বলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে মুসলমানদের অবশ্যই আত্ম-মূল্যায়ন এবং আরও উন্নতির জন্য তাদের দেওয়া শক্তির সময় ব্যবহার করতে হবে। এই মুহূর্তে তারা

পরিবর্তন করতে চাইবে কিন্তু তারা তা করার বুদ্ধি বা শক্তির অধিকারী হবে না। এটি সহীহ বুখারী, 6412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে যাদেরকে প্রভূত ক্ষমতা ও সম্পদ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু অবশেষে এমন একটি সময় এল যখন তাদের শক্তির মুহূর্ত ফুরিয়ে গেল এবং তাদের ক্রমাগত অবাধ্যতার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তাদের শক্তির মুহূর্তগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন, তারা এমনভাবে আশীর্বাদ করবেন যে, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও তারা সমাজে সম্মানিত হবেন।

যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান আরবি ভাষা বোঝেন না, প্রচুর পরিমাণে উপাসনা এই অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকে ট্রিগার করবে না। এই জড় জগৎ, মৃত্যু, কবর ও জাহান্নামকে চিন্তা করেই কেউ সেখানে পৌঁছাতে পারে। এ কারণে ষাট বছরের স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে এক মুহূর্তের প্রতিফলন উত্তম হয়ে উঠতে পারে।

যারা প্রজ্ঞা বা প্রতিফলন ছাড়াই জীবনযাপন করে তারা অভ্যাসগতভাবে ভুল করে যা শুধুমাত্র ক্রমাগত চাপের দিকে পরিচালিত করে। এই লোকেরাই কোন উচ্চ আকাঙ্খা ছাড়াই লক্ষ্যহীন জীবনযাপন করে এবং তাদের আসল উদ্দেশ্য না বুঝেই প্রতিটি দিন অতিক্রম করে।

ধার্মিকরা সর্বদা তাদের দিন থেকে সময় বের করে তাদের লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা করার জন্য, তারা কী কাজ করেছে এবং তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছে কি না। এই মানসিকতা নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি পাপ পরিহার করে, সৎ কাজ করে এবং যদি তারা পাপ করে তবে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। এই মানসিকতা ইসলামের দ্বিতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা ওমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেওয়া উপদেশের সাথে খাপ খায়, যা ইমাম আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৯৮ নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে। বিচার দিবসে অন্য কেউ তাদের বিচার করবে, নাম মহান আল্লাহ।

এই স্ব-মূল্যায়ন হল সেই চাবিকাঠি যা একজনকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করে। এই মঞ্চের তুলনায় এটি সর্বোত্তম পর্যায় যেখানে একজন তাদের ভুল বুঝতে পারে যখন অন্য একজন তাদের নির্দেশ করে। কিন্তু এই পর্যায়েও একজনের ভালো বন্ধু এবং আত্মীয়দের থাকা প্রয়োজন যারা জ্ঞানী এবং আন্তরিকভাবে তাদের চিরন্তন কল্যাণের জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে শুধুমাত্র জড় জগতের সাথে উদ্বিগ্ন। একজন সত্যিকারের ধন্য মুসলিম সেই ব্যক্তি যার কাছে এই ধরনের আত্মীয় ও বন্ধু রয়েছে যারা তাদের তাকওয়া অবলম্বনে সাহায্য করে।

একজনের দিনের শুরুতে প্রতিফলিত হওয়া এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের দৈনন্দিন কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সেই কাজগুলি এড়িয়ে সময় বাঁচায় যেগুলি বিলম্বিত হওয়া উচিত।

নিচের আয়াতে সফল মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা ইসলামের শিক্ষার প্রতি চিন্তাভাবনা করে এবং গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং তাদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। যদি কেউ এইভাবে প্রভাবিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং অহংকার প্রকাশ করা

উচিত নয়। কিন্তু যদি কেউ এইভাবে প্রভাবিত না হয় তবে তাদের অনুতপ্ত হতে হবে এবং অনেক দেরি হওয়ার আগেই পরিবর্তন করতে হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 83:

"এবং যখন তারা শোনেন যা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে তারা সত্যকে চিনতে পেরেছে বলে তাদের চোখ অশ্রুতে উপচে পড়ছে..."

আত্ম-প্রতিফলনের অভাব মুসলমানদের বস্তুজগতে হারিয়ে যেতে বাধ্য করেছে যদিও ইসলামিক জ্ঞান আগের চেয়ে বেশি সহজলভ্য। স্বেচ্ছাসেবী উপাসনা শুধুমাত্র একজনকে এতদূর নিয়ে যাবে কিন্তু বিশ্বাসের উচ্চতায় পৌঁছতে তাদের অবশ্যই তাদের চরিত্রের প্রতিফলন এবং মূল্যায়ন করতে হবে। এটি তাদের মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিত্যাগ করতে এবং তাদের প্রতিস্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করবে। এই আত্ম-মূল্যায়ন এবং প্রতিফলনকে উদ্দীপিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানটি হল ইসলামী জ্ঞান যা অবশ্যই একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত হতে হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেছেন যে , এই ধরনের জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের জন্য ফরজ।

আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, মানুষকে মৃত্যু এবং এর অপ্রত্যাশিত প্রকৃতির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি জনগণকে সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কার্যত এর জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান।

মৃত্যু এমন একটি বিষয় যা ঘটবে নিশ্চিত কিন্তু সময়টি অজানা তাই এটি বোঝা যায় যে একজন মুসলিম যে পরকালে বিশ্বাস করে সে তার জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয় যা ঘটতে পারে না, যেমন বিয়ে, সন্তান বা তাদের অবসর গ্রহণ। এটা আশ্চর্যজনক যে কত মুসলমান বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে যদিও তারা সাক্ষ্য দেয় যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং অনিশ্চিত অথচ আখেরাত চিরস্থায়ী এবং তাদের পৌঁছানো নিশ্চিত। কেউ যেভাবে আচরণ করুক না কেন তাদের কাজের ব্যাপারে তাদের বিচার করা হবে। একজন মুসলমানকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে তারা ভবিষ্যতে পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে পারে এবং করবে কারণ এই মনোভাব তাদের মৃত্যু ঘটতে না হওয়া পর্যন্ত তাদের আরও বিলম্বিত করে এবং তারা অনুশোচনা নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় যা তাদের সাহায্য করবে না।

তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই নয় যে মানুষ মারা যাবে কারণ এটি অনিবার্য, তবে মূল বিষয় হল এমনভাবে কাজ করা যাতে কেউ এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে। এর জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার একমাত্র উপায় হল ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ ঘটতে না পারে এমন জিনিসগুলির জন্য প্রস্তুতির চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয়।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকে সতর্ক করেছিলেন যে, যারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য ভুলে গিয়ে অন্যদের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য।

লোকেরা প্রায়শই অভিযোগ করে যে তারা যতই চেষ্টা করে না কেন তারা সবাইকে খুশি করতে পারে না। তারা যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন সবসময় তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট বলে মনে হয়। এটি একটি বাস্তবতা যা সকলেই তাদের পারিবারিক জীবনে, কর্মজীবনে বা বন্ধুদের সাথে অনুভব করে। একজন মুসলমানের সর্বদা কিছু সহজ জিনিস মনে রাখা উচিত যা তাদের এই বিষয়ে চাপ দেওয়া থেকে বিরত রাখবে।

প্রথমত, অধিকাংশ মানুষ মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট নয়, যদিও তিনি তাদের অগণিত আশীর্বাদ দান করেছেন। তাহলে এই লোকেরা কীভাবে অন্য ব্যক্তির সাথে সত্যিকারের সুখী হতে পারে যে বাস্তবে তাদের কিছুই দেয়নি? মহান আল্লাহর প্রতি তাদের সন্তুষ্টির অভাব তাদের অভিযোগ এবং কৃতজ্ঞতার অভাব থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তি যতই তাদের চরিত্রের উন্নতি করুক না কেন, তারা কখনোই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং অন্যান্য নবী-রাসূলগণের অধিষ্ঠিত মহিমান্বিত চরিত্রে পৌঁছাতে পারবে না, তবুও কিছু লোক তাদের অপছন্দ করত। মানুষ তাদের ক্ষেত্রে যদি এমন হয় তবে একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে তাদের জীবনে সবার আনন্দ অর্জন করতে পারে?

একজন মুসলমানের এটাও মনে রাখা উচিত যে মানুষ যেমন বিভিন্ন মানসিকতা নিয়ে তৈরি হয়েছিল তারা সবসময় এমন লোকদের খুঁজে পাবে যারা তাদের মনোভাব এবং আচরণের সাথে একমত নয়। এই কারণে সর্বদা কিছু লোক থাকবে যারা সময়ের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে একজন ব্যক্তির সাথে সন্তুষ্ট হয় না। একমাত্র যিনি সকলকে খুশি করার কাছাকাছি আসতে পারেন তিনি হলেন দ্বিমুখী ব্যক্তি যিনি তাদের মনোভাব এবং বিশ্বাস পরিবর্তন করেন তারা কার

সাথে আচরণ করছেন তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তিও মহান আল্লাহর কাছে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত হবে।

অতএব, সমস্ত মানুষের আনন্দ অর্জন করা অপ্রাপ্য এবং কেবলমাত্র একজন মূর্খ ব্যক্তিই এমন কিছু অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে যা অর্জন করা যায় না। তাই একজন মুসলমানের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে সর্বোপরি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করা। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত নয় কারণ এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। এর অর্থ হল একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যদি মহান আল্লাহকে মান্য করে তবে তিনি তাদের মানুষের নেতিবাচক মনোভাব এবং প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু যদি তারা মানুষকে খুশি করাকে অগ্রাধিকার দেয় তবে তারা তা অর্জন করতে পারবে না এবং মহান আল্লাহ তাদেরকে মানুষের অসন্তুষ্টি ও নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন না।

একটি সুন্দর উপদেশ - 3

আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। নিম্নোক্ত খুতবাটি ইমাম আল আসফাহানীর, হিলয়াত আল আউলিয়া, 55 নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের লোকদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যারা এই দুনিয়া থেকে যা কিছু অর্জন করেছে তার জন্য গর্ববোধ করেছিল, যেমন পার্থিব রাজা এবং বিজয়ী সৈন্যরা। যদিও তারা পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছিল এবং বিশাল দুর্গ এবং সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল তবুও তারা অন্ধকার এবং বিচ্ছিন্ন কবরে শেষ হয়েছিল। তিনি জনগণকে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে এবং তাদের আচরণ এড়াতে সতর্ক করেছিলেন।

প্রথমত, পার্থিব উত্তরাধিকার আসা-যাওয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। ইসলাম শুধু মুসলমানদেরকে সৎকর্মের মাধ্যমে পরকালের জন্য আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায় না বরং এটি তাদের পিছনে একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতে শেখায় যা থেকে লোকেরা উপকৃত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলমান মারা যায় এবং দরকারী যা কিছু রেখে যায়, যেমন একটি জলের কূপ আকারে একটি চলমান দান তারা এর জন্য সওয়াব পাবে। সহীহ মুসলিম, 4223 নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত সৎ কাজ করার চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব ভাল পাঠানোর চেষ্টা করা

উচিত তবে তাদের পিছনে একটি ভাল উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত যা তাদের মৃত্যুর পরে তাদের উপকারে আসবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম তাদের সম্পদ এবং সম্পত্তি সম্পর্কে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তারা কেবল তাদের পিছনে ফেলে চলে যায় যা তাদের সামান্যতম উপকারে আসে না। প্রতিটি মুসলমানকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে তাদের নিজের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য প্রচুর সময় আছে কারণ মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর আঘাত করে। আজ সেই দিনটি যেদিন একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের প্রতিফলন করা উচিত। যদি এই উত্তরাধিকারটি ভাল এবং উপকারী হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, তিনি তাদের তা করার শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু যদি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসে না, তবে তাদের এমন কিছু প্রস্তুত করা উচিত যা তারা কেবল আখেরাতের জন্য কল্যাণই প্রেরণ করে না বরং কল্যাণও রেখে যায়। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত তাদের উত্তরাধিকার কি?

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন লোকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বলা না হলে কোনো কথাই উপকারী নয়।

জামে আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

এর অর্থ হল যে ব্যক্তি অনর্থক বা মন্দ কথা থেকে চুপ থাকে এবং কেবল ভাল কথা বলে তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ রক্ষা করবেন। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রধান কারণ তাদের কথাবার্তা। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিচারের দিন একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয় যা জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, সংখ্যা 2314।

বক্তৃতা তিন প্রকার হতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথাবার্তা যা যেকোনো মূল্যে পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়টি হল অনর্থক বক্তৃতা যা শুধুমাত্র একজনের সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনার কারণ হবে। উপরন্তু, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রথম ধাপ প্রায়ই অসার বক্তৃতা. তাই এই ধরনের কথাবার্তা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। চূড়ান্ত প্রকারটি ভাল বক্তৃতা যা সর্বদা গ্রহণ করা উচিত। এই দিকগুলির উপর ভিত্তি করে একজনের জীবন থেকে কথার দুই তৃতীয়াংশ মুছে ফেলা উচিত।

উপরন্তু, যারা খুব বেশি কথা বলে সে কেবল তাদের কর্ম এবং পরকালের প্রতি একটু ভাববে কারণ এর জন্য নীরবতা প্রয়োজন। এটি একজনকে তাদের কাজের মূল্যায়ন থেকে বিরত রাখবে যা একজনকে আরও সৎ কাজ করতে এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে। এই ব্যক্তি তখন আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকবে।

পরিশেষে, যারা খুব বেশি কথা বলে তারা প্রায়শই পার্থিব বিষয় এবং বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা বিনোদন এবং মজাদার। এটি তাদের এমন একটি

মানসিকতা অবলম্বন করবে যার ফলে তারা মৃত্যু এবং পরকালের মতো গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করা বা শুনতে অপছন্দ করে। এটি তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে যা একটি বড় অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

এই সব এড়ানো যেতে পারে যদি কেউ পাপপূর্ণ এবং নিরর্থক কথাবার্তা থেকে নীরব থাকে এবং পরিবর্তে কেবল ভাল কথা বলে। অতএব, যে এভাবে নীরব থাকবে সে দুনিয়াতে কষ্ট ও পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন লোকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে সম্পদের মধ্যে এমন কোন কল্যাণ নেই যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা হয়নি।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের পার্থিব সংজ্ঞা অনুসারে কোনো পরিস্থিতিকে ভালো বা খারাপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি পার্থিব সংজ্ঞা অনুসারে ধনী হওয়া ভাল যেখানে দরিদ্র হওয়া খারাপ। পরিবর্তে, মুসলমানদের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ঘটনা ও জিনিসের জন্য ভালো-মন্দ দায়ী করা। অর্থ, যা কিছু মানুষকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে, তা পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে খারাপ হলেও ভালো। . আর যা কিছু মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, তা ভালো দেখালেও খারাপ।

ইসলামের শিক্ষা জুড়ে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা এটি প্রমাণ করে। উদাহরণস্বরূপ, কারুন ছিলেন একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি যিনি হযরত মূসা

(আঃ) এর সময়ে বসবাস করতেন। তখন এবং এখন অনেক লোক তার সম্পদকে একটি ভাল জিনিস বলে মনে করতে পারে তবে এটি তাকে অহংকারে নিয়ে যাওয়ার কারণে এটি তার ধ্বংসের একটি উপায় হয়ে উঠেছে। তাই তার ক্ষেত্রে ধনী হওয়াটা ছিল খারাপ ব্যাপার। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 79-81।

“ অতএব সে তার লোকদের সামনে তার সাজসজ্জায় বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করে, তারা বলেছিল, "হায়, কারুনকে যা দেওয়া হয়েছিল, আমরাও যদি সেরকমই থাকতাম। প্রকৃতপক্ষে, তিনি একজন মহান সৌভাগ্যবান। কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলেছিল, "হায় তোমাদের জন্য! যে ব্যক্তি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তার জন্য আল্লাহর পুরস্কার উত্তম। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত অন্য কাউকে তা দেওয়া হয় না।" এবং আমি তাকে এবং তার ঘরকে মাটিতে গ্রাস করে দিয়েছিলাম। এবং তার জন্য আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার জন্য কোন দল ছিল না এবং সে আত্মরক্ষা করতে পারে না।"

অন্যদিকে, ইসলামের তৃতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুও ধনী ছিলেন তবুও তিনি তার সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতেন। প্রকৃতপক্ষে, একবার বিপুল পরিমাণ সম্পদ দান করার পর তাকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে, সেদিনের পর কোনো কিছুই তার ঈমানের ক্ষতি করতে পারবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩৭০১ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে সম্পদ ছিল উত্তম।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তাদের প্রতিটি অসুবিধার পিছনে প্রজ্ঞা রয়েছে যদিও তারা সেগুলি পালন না করে। তাই তাদের

পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু ভাল বা খারাপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। অর্থ, যদি জিনিসটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করে, তবে তা দেখতে খারাপ হলেও ভালো। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন লোকদের মনে করিয়ে দিলেন যে, যে ব্যক্তির অজ্ঞতা তাদের সহনশীলতাকে জয় করে তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

একটি মহান বিভ্রান্তি যা মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয় তা হল অজ্ঞতা। এটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে এটি প্রতিটি পাপের উৎপত্তি কারণ যে ব্যক্তি সত্যিই পাপের পরিণতি জানে সে কখনই সেগুলি করবে না। এটি সত্যিকারের উপকারী জ্ঞানকে বোঝায় যা এমন জ্ঞান যার উপর কাজ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জ্ঞান যার উপর আমল করা হয় না তা উপকারী জ্ঞান নয়। যে ব্যক্তি এই আচরণ করে তার উদাহরণ পবিত্র কুরআনে এমন একটি গাধা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা জ্ঞানের বই বহন করে যা কোন উপকারে আসে না। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করা হয়নি (জ্ঞানের উপর আমল করেনি) সে গাধার মত যে [বইয়ের] পরিমাণ বহন করে..."

যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে সে খুব কমই পিছলে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে। প্রকৃতপক্ষে, যখন এটি ঘটে তখন এটি শুধুমাত্র অজ্ঞতার একটি মুহূর্ত দ্বারা সৃষ্ট হয় যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ভুলে যায় যার ফলে তারা পাপ করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার জামে আত তিরমিযী, 2322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে জাহেলিয়াতের গুরুতরতা তুলে ধরেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মহান আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত জড় জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত, এই স্মরণের সাথে যা কিছু যুক্ত, সেই পণ্ডিত এবং জ্ঞানের ছাত্র । এর অর্থ এই যে, জড় জগতের সমস্ত নিয়ামত অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অভিশাপ হয়ে উঠবে কারণ তারা তাদের অপব্যবহার করে পাপ করবে।

প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞতা একজন ব্যক্তির সবচেয়ে খারাপ শত্রু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কারণ এটি তাদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং উপকার লাভ করতে বাধা দেয় যা শুধুমাত্র জ্ঞানের উপর কাজ করার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। অজ্ঞরা না জেনেই পাপ করে। কোন পাপকে পাপ বলে গণ্য করা হয় তা না জানলে কিভাবে পাপ এড়ানো যায়? অজ্ঞতার কারণে একজন ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বে অবহেলা করে। কেউ যদি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা যায়?

তাই সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য হল পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা যাতে তাদের সকল ফরজ দায়িত্ব পালন করা যায় এবং গুনাহ পরিহার করা যায়। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন লোকদের মনে করিয়ে দিলেন যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার সময় মানুষের সমালোচনাকে ভয় পায় তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

একজন মুসলমানের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রথমটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় কারণ তাদের অন্যদের সমালোচনা পবিত্র কুরআনে পাওয়া সমালোচনা এবং উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনটি সর্বদা গঠনমূলক হবে এবং উভয় জগতের আশীর্বাদ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখাবে। এই লোকেরাও অন্যের বেশি বা কম প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা তাদের গর্বিত এবং অহংকারী হতে পারে। অন্যদের প্রশংসা করার অধীনে তাদের অলস হয়ে যেতে পারে এবং তাদের ভাল কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া প্রায়ই শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রশংসা করা অন্যদেরকে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এটি তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব, এই ব্যক্তির প্রশংসা এবং গঠনমূলক সমালোচনা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে সমালোচনা করে। এই সমালোচনা বেশিরভাগই গঠনমূলক এবং শুধুমাত্র একজনের খারাপ মেজাজ এবং মনোভাব দেখায়। এই লোকেরা প্রায়শই অন্যদের প্রশংসা করে যখন তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই দুটির নেতিবাচক প্রভাব আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রশংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা উচিত যদিও তা প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে

কারণ এটি কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রে অহেতুক দুঃখিত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যে অন্যদের বেশি প্রশংসা করে সে প্রায়শই তাদের সমালোচনাও করবে। যে নিয়মটি সর্বদা অনুসরণ করা উচিত তা হল তাদের কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে সমালোচনা ও প্রশংসা গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য সমস্ত জিনিস উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়।

একটি সুন্দর উপদেশ - 4

আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। ইমাম সুয়ূতির, তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা 95-97-এ নিম্নলিখিত খুতবাটি আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, মানুষকে সতর্ক করেছিলেন আবেগের বাঁকা অনুসরণ না করার জন্য, যে ব্যক্তি আবেগ, লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ক্রোধ থেকে রক্ষা পায় সে-ই সফল।

যদি কেউ এইসব ইচ্ছার কাছে চলে যায় তবে তারা তাদের উপাসনার বস্তুতে পরিণত হবে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 23:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

প্রথমত, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রধান জিনিস যা একজন মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে তা হল মানুষ একটি উচ্চতর নৈতিক নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করে। যদি মানুষ এটা পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে তবে তাদের এবং পশুদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

প্রকৃতপক্ষে, লোকেরা আরও খারাপ হবে কারণ তারা এখনও উচ্চ স্তরের চিন্তাভাবনার অধিকারী, তবুও পশুদের মতো জীবনযাপন করা বেছে নেয়।

দ্বিতীয়ত, মানুষ বাস্তবে স্বীকার করুক বা না করুক, প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো না কোনো ব্যক্তির সেবক। কেউ কেউ অন্যের সেবক, যেমন হলিউড এক্সিকিউটিভ এবং তারা যা করতে আদেশ করেন তা করেন এমনকি যদি তা শালীনতা এবং লজ্জাকে চ্যালেঞ্জ করে। অন্যরা তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের দাস এবং তাদের খুশি করার জন্য যা যা লাগে তাই করে। অন্যরা তাদের নিজের ইচ্ছার দাস হয়ে আরও খারাপ কারণ এটি এমন প্রাণীদের মনোভাব যারা সাধারণত নিজেকে খুশি করার জন্য কাজ করে। দাসত্বের সর্বোত্তম ও সর্বোত্তম রূপ হচ্ছে মহান আল্লাহর বান্দা হওয়া। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মহান আল্লাহর বান্দা ছিলেন, যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সম্মান ও সম্মান দেওয়া হয়েছিল এবং থাকবে। পরের এই মঞ্জুর. শতাব্দী এবং সহস্রাব্দ পেরিয়ে গেছে তবুও তাদের নাম ইতিহাসের স্তম্ভ এবং আলোকবর্তিকা হিসাবে স্মরণ করা হয়। পক্ষান্তরে যারা বিশেষ করে অন্যের সেবক হয়েছিলেন, তাদের নিজেদের কামনা-বাসনা কিছু পার্থিব মর্যাদা অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হয়েছিল এবং তারা ইতিহাসের পাদটীকাতে পরিণত হয়েছিল। মিডিয়া খুব কমই তাদের মনে রাখে যারা রিপোর্ট করার জন্য পরবর্তী ব্যক্তির দিকে যাওয়ার আগে কয়েক দিনের বেশি সময় ধরে চলে যায়। তাদের জীবনকালে এই লোকেরা অবশেষে দু: খিত, একাকী, হতাশাগ্রস্ত এবং এমনকি আত্মঘাতী হয়ে ওঠে কারণ তাদের আত্মা এবং শালীনতা তাদের পার্থিব প্রভুদের কাছে বিক্রি করে তাদের তৃপ্তি দেয়নি যা তারা খুঁজছিল। এই সুস্পষ্ট সত্যটি বুঝতে পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং মানুষকে যদি বান্দা হতেই হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর বান্দা হওয়া, কেননা স্থায়ী সম্মান, মহানুভবতা ও প্রকৃত সাফল্য কেবল এতেই নিহিত।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু গর্ব করা এবং অহংকার অবলম্বন করা থেকেও মানুষকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তির গর্ব করার কিছু নেই যখন তারা ধূলিকণা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এবং পরে ধূলায় ফিরে আসে।

সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে গর্ব হল যখন একজন ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করে।

অহংকারী ব্যক্তির কোন পরিমাণ ভাল কাজ উপকারে আসবে না। যখন কেউ শয়তানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন সে গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তার অগণিত বছরের উপাসনা কীভাবে তাকে উপকৃত করেনি তা খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে অবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

" আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।"

গর্বিত সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। গর্বিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের

থেকে উচ্চতর যদিও তারা তাদের নিজেদের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। এটা হল সরল অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সবকিছু সৃষ্টি ও দান করেছেন বলে কোনো কিছু দেখে গর্ব করা বোকামি। এমনকি একজন সৎকর্মও করে থাকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান ও শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে অহংকার করা যা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্বিত হয় যা তারা এমনকি তার মালিক বা বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার মহান আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি একাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকারবশত মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিৎ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। নম্ররা সত্যই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দ থেকে তারা সুরক্ষিত রয়েছে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য অহংকারের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে নম্রতা অসম্মানের দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহর নম্র বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদেরকে একদিনে একদিন এবং এক ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানার পরামর্শ দেন।

এর অর্থ এই হতে পারে যে একজন ব্যক্তির দীর্ঘ জীবনের আশা গ্রহণ করা উচিত নয় এবং তার পরিবর্তে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত এবং একবারে একদিনের জন্য পরিকল্পনা করা উচিত।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি বড় বাধা দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা করা। এটি একটি অত্যন্ত দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একটি মুসলমানের জন্য প্রধান কারণ যা পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতকে একত্রিত করাকে অগ্রাধিকার দেয়। একজনকে শুধুমাত্র তাদের গড় 24 ঘন্টা দিনের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য তারা বস্তুজগতের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে এবং পরকালের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা রাখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি যা শয়তান লোকেদের বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করে। যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে মিথ্যা বিশ্বাস করে যে তারা অদূর ভবিষ্যতে এর জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই অদূর ভবিষ্যত কখনই আসে না এবং একজন ব্যক্তি পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়েই মারা যায়।

উপরন্তু, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা একজনকে আন্তরিক অনুতাপ করতে এবং নিজের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য বিলম্বিত করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি করার জন্য তাদের অনেক সময় বাকি আছে। এটি একজন ব্যক্তিকে এই জড়জগতের জিনিসপত্র যেমন সম্পদ মজুত করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘ জীবনকালে এই

জিনিসগুলির প্রয়োজন হবে। শয়তান লোকেদের এই ভেবে ভয় দেখায় যে তারা তাদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে কারণ তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের সমর্থন করার মতো কেউ নাও পেতে পারে এবং তাই তাদের জন্য আর কাজ করতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ যেভাবে তাদের ছোট বয়সে তাদের রিজিকের যত্ন নিয়েছেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও তাদের রিজিক দেবেন। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে তার জীবনের 40 বছর তাদের অবসর গ্রহণের জন্য উৎসর্গ করবে যা খুব কমই 20 বছরের বেশি স্থায়ী হয় কিন্তু অনন্তকালের জন্য একইভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর

ইসলাম মুসলমানদেরকে পৃথিবীর জন্য কিছু প্রস্তুত না করার শিক্ষা দেয় না। পরকালকে প্রাধান্য দিলে নিকট ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার কোনো ক্ষতি নেই। যদিও, লোকেরা স্বীকার করে যে তারা এখনও যে কোনও সময় মারা যেতে পারে, কেউ কেউ এমন আচরণ করে যেন তারা এই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে। এমনকি এই বিন্দু পর্যন্ত যে তাদের যদি পৃথিবীতে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তবে তারা দিনরাত্রির সীমাবদ্ধতার কারণে আরও বেশি জড়জগত সংগ্রহ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে সক্ষম হবে না। প্রত্যাশিত সময়ের আগে কতজন মারা গেছেন? আর কতজন এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করে?

প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বা আখেরাতের অন্য কোন পর্যায়ে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করবেন তা হল পরকালের জন্য তাদের প্রস্তুতিতে দেরি করার জন্য অনুশোচনা। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

“আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" কিন্তু আল্লাহ কখনই দেরী করবেন না কোন আত্মা যখন তার সময় হয়ে যাবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তারা এমন একটি বাড়িতে বেশি সময় এবং সম্পদ উৎসর্গ করে যেখানে তারা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকার পরিকল্পনা করে এমন একটি বাড়ির তুলনায় অল্প সময়ের জন্য বাস করতে চলেছে। চিরন্তন পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ এটি।

মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই কাজ করা উচিত কিন্তু এটা জেনে রাখা উচিত যে মৃত্যু একজন ব্যক্তির কাছে এমন সময়ে আসে না, যে সময়, অবস্থা বা বয়স তাদের পরিচিত কিন্তু তা অবশ্যই আসবে। অতএব, এটির জন্য প্রস্তুতি এবং এটি যা ঘটায় তা এই পৃথিবীতে এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যা ঘটবে না।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, জনগণকে নির্যাতিত ব্যক্তির দো'আ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য সতর্ক করেছিলেন।

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক

সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলিমকে অবশ্যই ঈমানের দুটি দিক পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে জীবন থেকে দূরে রাখে এবং অন্যদের সম্পত্তি।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু মানুষ এতটা ক্ষমাশীল নয় একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা তাদের মূল্যবান নেক আমল কিয়ামতের দিন কেড়ে নিয়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে। এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে। তাই উভয় জগতে সফলতা লাভের জন্য মুসলমানদের জন্য তাদের কর্তব্যের উভয় দিক পালনে সচেষ্ট হওয়া জরুরী।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, মানুষকে ধৈর্য অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন, কারণ সকল ভালো কাজের ভিত্তি হল ধৈর্য।

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, অপছন্দের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা একটি মহান পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

ধৈর্য হল ঈমানের তিনটি দিক পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান: মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু ধৈর্যের চেয়ে উচ্চতর এবং অধিক ফলপ্রসূ স্তর হল সন্তুষ্টি। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন এবং তাই তারা তাদের নিজেদের চেয়ে তাঁর পছন্দকে প্রাধান্য দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন ধৈর্যশীল মুসলিম বোঝে যে, যা তাদের প্রভাবিত করেছে, যেমন একটি অসুবিধা, সমগ্র সৃষ্টি তাদের সাহায্য করলেও এড়ানো যেত না। একইভাবে যা তাদের মিস করেছে, তা তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। যে ব্যক্তি এই সত্যকে সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করে, সে যে কিছু অর্জন করে তার জন্য উল্লাস ও গর্ববোধ করবে না, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিস বরাদ্দ করেছেন। অথবা তারা এমন কিছুর জন্য দুঃখ করবে না যা তারা আল্লাহকে জানতে ব্যর্থ হয়, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিসটি বরাদ্দ করেননি এবং অস্তিত্বের কোন কিছুই এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

"পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে তা একটি রেজিস্টার [1- এ থাকে যা] *আমরা এটিকে সৃষ্টি করার আগে - প্রকৃতপক্ষে, এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে আপনি নিরাশ না হন যা আপনাকে এড়িয়ে গেছে এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য [অহংকারে] আনন্দিত না হন..."*

উপরন্তু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজাহ, 79 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন কিছু ঘটে তখন একজন মুসলিমকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে এটি নির্ধারিত ছিল এবং কিছুই ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে না। এবং একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসে আফসোস করা উচিত নয় যে তারা যদি অন্যরকম আচরণ করে তবে তারা ফলাফলকে আটকাতে পারত কারণ এই মনোভাব শুধুমাত্র শয়তানকে তাদের অধৈর্যতা এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য উত্সাহিত করে। একজন ধৈর্যশীল মুসলিম সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ যা কিছু বেছে নিয়েছেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তারা এর পেছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। যে ধৈর্যশীল সে তাদের অবস্থার পরিবর্তন কামনা করে এবং এমনকি তার জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু যা ঘটেছে সে সম্পর্কে তারা অভিযোগ করে না। অবিরত ধৈর্যশীল হওয়া একজন মুসলিমকে তৃপ্তির বৃহত্তর স্তরে নিয়ে যেতে পারে।

যে সন্তুষ্ট সে জিনিস পরিবর্তন করতে চায় না কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর পছন্দ তাদের পছন্দের চেয়ে উত্তম। এই মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া হাদীসের উপর আমল করে। এটি পরামর্শ দেয় যে প্রতিটি পরিস্থিতিই বিশ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম। যদি তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। এবং যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে তবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে।

এটা জেনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তাদের পরীক্ষা করেন। যদি তারা ধৈর্য দেখায় তবে তারা পুরস্কৃত হবে কিন্তু যদি তারা রাগান্বিত হয় তবে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। জামি আত তিরমিযী, 2396 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত হবে ধৈর্য্যশীল হওয়া বা আল্লাহর পছন্দ ও সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা, আরাম ও কষ্ট উভয় সময়েই। এটি একজনের কষ্ট কমিয়ে দেবে এবং উভয় জগতে অনেক আশীর্বাদ প্রদান করবে। যদিও, অধৈর্যতা শুধুমাত্র সেই পুরস্কারকে ধ্বংস করবে যা তারা পেতে পারত। যেভাবেই হোক একজন মুসলিম মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে, তবে তারা পুরস্কার চায় কি না তা তাদের পছন্দ।

একজন মুসলিম কখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের আচরণ অসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সমান হয়। একজন সত্যিকারের

বান্দা কীভাবে বিচারের জন্য প্রভু অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে যেতে পারে এবং তারপর পছন্দ না হলে অসন্তুষ্ট হতে পারে। একটি বাস্তব সম্ভাবনা আছে যে যদি একজন ব্যক্তি যা চায় তা পায় তবে এটি তাদের ধ্বংস করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন মুসলমানের ধারে-কাছে বসে মহান আল্লাহর ইবাদত করা উচিত নয়। অর্থ, যখন ঐশী আদেশ তাদের ইচ্ছার সাথে মিলে যায় তখন তারা মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যখন তা না হয় তখন তারা বিরক্ত হয়ে এমন আচরণ করে যেন তারা মহান আল্লাহর চেয়ে ভালো জানে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে এমন আচরণ করা যেন তারা একজন দক্ষ বিশ্বস্ত ডাক্তারের সাথে আচরণ করে। একইভাবে একজন মুসলমান ডাক্তারের দ্বারা নির্ধারিত তিক্ত ওষুধ খাওয়ার অভিযোগ

করবে না জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম তা জেনে তাদের বিশ্বে তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তা তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে মেনে নেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে, একজন বিবেকবান ব্যক্তি তিক্ত ওষুধের জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাবে এবং একইভাবে একজন বুদ্ধিমান মুসলমান যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবে।

এছাড়াও, একজন মুসলমানের উচিত পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসগুলি পর্যালোচনা করা, যেগুলি ধৈর্যশীল এবং সন্তুষ্ট মুসলমানকে প্রদত্ত পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করে। এই বিষয়ে গভীর প্রতিফলন একজন মুসলিমকে অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 2402 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে যারা ধৈর্য সহকারে দুনিয়াতে পরীক্ষা ও অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল তারা যখন বিচার দিবসে তাদের পুরষ্কার পাবে যারা এই ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি তারা আশা করবে তারা ধৈর্য সহকারে এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। কাঁচি দিয়ে তাদের চামড়া কেটে ফেলা হচ্ছে।

মহান আল্লাহ যে ব্যক্তিকে বেছে নেন তাতে ধৈর্য্য ও এমনকি সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের উচিত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের

মধ্যে পাওয়া জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা, যাতে করে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ স্তরে পৌঁছায়। সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব হল যখন একজন মুসলিম কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছাবে সে কষ্ট ও পরীক্ষার যন্ত্রণা অনুভব করবে না কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সচেতনতা ও ভালবাসায় নিমজ্জিত হবে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য অবলোকন করার সময় যে নারীরা নিজেদের হাত কাটার সময় ব্যথা অনুভব করেননি তাদের অবস্থাও এটির অনুরূপ। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 31:

"...এবং তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল এবং [যোসেফকে] বলল, "ওদের সামনে থেকে বেরিয়ে এস।" এবং যখন তারা তাকে দেখেছিল, তখন তারা তাকে খুব প্রশংসা করেছিল এবং তাদের হাত কেটেছিল এবং বলেছিল, "নিখুঁত আল্লাহ! ইনি একজন মানুষ নন, এটি একজন মহান ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নয়।"

কোনো মুসলমান যদি ঈমানের এই উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে না পারে তবে তার উচিত অন্তত পূর্বে উদ্‌ধৃত হাদীসে উল্লিখিত নিম্নস্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এটি সেই স্তর যেখানে একজন ক্রমাগত সচেতন থাকে যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। একইভাবে একজন ব্যক্তি এমন কোনো কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির সামনে অভিযোগ করবেন না যাকে তারা ভয় করে, যেমন একজন নিয়োগকর্তা, একজন মুসলিম যিনি সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, তিনি যে পছন্দগুলি করেন সে সম্পর্কে অভিযোগ করবেন না।

আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনগণকে ক্রমাগত সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ সতর্কতা দরকারী।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যতই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করুক বা যতই ইবাদত ও সৎকর্ম করুক না কেন তারা শয়তানের আক্রমণ ও ফাঁদ থেকে কখনই নিরাপদ থাকবে না। এর কারণ হল শয়তান প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের কতটা জ্ঞানের অধিকারী এবং তারা কতটা সৎ কাজ করে সে অনুযায়ী আক্রমণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি তাদের বাধ্যতামূলক নামায পড়ায় কঠোরভাবে বাধ্যতামূলক নামায মসজিদে না পড়ার জন্য বা তাদের ফরয নামায শুরুর সময়ের পরে বিলম্বিত করার জন্য তাদের বোঝানোর চেষ্টা করবেন কারণ তিনি জানেন যে তিনি বোঝাতে পারবেন না। তাদের ফরজ নামাজ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা। যদিও, যে মুসলমানরা তাদের ফরয নামায কায়েম করার জন্য সংগ্রাম করছে তাদের ব্যাপারে তিনি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে, তাদের কায়েম করা খুবই কঠিন তাই তাদের উচিত তখনই নামায আদায় করা যখন তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। যারা অনেক স্বেচ্ছামূলক ধার্মিক কাজ করে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর কাজ না করার জন্য যাতে তারা মিথ্যা বলা এবং সমর্থন করার মতো খারাপ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাদের ভাল কাজগুলিকে ধ্বংস করতে থাকে।

শয়তানের লক্ষ্য থাকে একজন ব্যক্তিকে উচ্চ স্তরে পৌঁছানো থেকে বিরত রাখা যদি সে তাকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে পদমর্যাদায় পড়তে রাজি না করতে পারে। অতএব, মুসলমানদের সর্বদা তার আক্রমন ও ফাঁদ থেকে সতর্ক থাকা উচিত, পদমর্যাদা বৃদ্ধি, তাদের চরিত্রের উন্নতি এবং অবাধ্যতামূলক কাজগুলি এড়ানোর জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যা সবই ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও লোকদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এর বিনিময়ে তাদের হেফাজত করা হবে।

জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি কোনো মুসলমান মহান আল্লাহকে হেফাজত করে, তাহলে তিনি তাদের রক্ষা করবেন।

এর অর্থ এই যে, কেউ যদি মহান আল্লাহর সীমা এবং আদেশ রক্ষা করে, তবে সেগুলি তাঁর দ্বারা সুরক্ষিত হবে। মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে কেউ এটি অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 112:

"...আর যারা আল্লাহর সীমাবদ্ধতা পালন করে। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।"

মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য রক্ষার অনেক দিক রয়েছে। রক্ষা করার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল আল্লাহ, মহান এবং মানুষের সাথে করা চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি। মহান আল্লাহর সাথে সমগ্র মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ চুক্তিটি ছিল তাকে তাদের রব হিসাবে গ্রহণ করা। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 172:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানদের থেকে - তাদের কোমর থেকে - তাদের বংশধরদের নিয়েছিলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে বলেছিলেন], "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বলল, "হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি।"...

এর অর্থ একজনকে অবশ্যই আল্লাহকে মান্য করতে হবে, যা তার আনুগত্যের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এমন কারো আনুগত্য করে যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহর অবাধ্য হয়, তবে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং অন্যকে তাদের পালনকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 23:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

আরেকটি উদাহরণ হল ফরয সালাতকে রক্ষা করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে এটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এই দায়িত্বটি এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে, সুনানে আবু দাউদ, 425 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি এই দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন করবে তাকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের ফরজ নামাজ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তার ক্ষমা পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

ফরয নামাযের সুরক্ষার কথা সুনানে ইবনে মাজা, ২৭৭ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন

যে, শুধুমাত্র একজন প্রকৃত মুমিন তাদের অযু রক্ষা করে, যা নামাযের চাবিকাঠি।

মহান আল্লাহর সীমা রক্ষার একটি দিক জামে আত তিরমিযী, 2458 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে তাদের মাথা ও পেটের নিরাপত্তার পরামর্শ দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আনুগত্যে নিজের চোখ, কান, জিহ্বা এবং চিন্তাভাবনা। পাকস্থলী রক্ষার মধ্যে রয়েছে অবৈধ সম্পদ ও খাদ্য গ্রহণ ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকা। জিহ্বা এবং নিজের কামুক আকাঙ্ক্ষাকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় আদেশ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6474, পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি এই দুটি জিনিস রক্ষা করবে তার জান্নাতের নিশ্চয়তা রয়েছে।

একটি মৌলিক ইসলামি নীতি মুসলমানদের শেখায় যে তারা কীভাবে আচরণ করে তা হল মহান আল্লাহ তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআন মুসলমানদের উপদেশ দেয় যে যে ব্যক্তি ইসলামকে সমর্থন করবে সে মহান আল্লাহ দ্বারা সমর্থিত হবে। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 152। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে যে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে, তিনি তাকে স্মরণ করবেন।

“সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব…"

যে ব্যক্তি তার সীমা রক্ষা করবে তার পরিবারকেও মহান আল্লাহ রক্ষা করবেন। পবিত্র কোরআনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কিভাবে মহান আল্লাহ, দুই এতিমের দাফনকৃত ধনকে তাদের পিতা হিসাবে রক্ষা করেছিলেন। তাদের পিতা যেমন মহান আল্লাহর সীমা রক্ষা করেছিলেন, তেমনি তিনি তার এতিম সন্তানদেরও রক্ষা করেছিলেন। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 82:

"এবং প্রাচীরের জন্য, এটি শহরের দুটি এতিম ছেলের ছিল এবং এর নীচে তাদের জন্য একটি ধন ছিল এবং তাদের পিতা ছিলেন সৎকর্মশীল..."

প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সীমা রক্ষা করবে, সে দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত অসুবিধা থেকে মুক্তির পথ দান করেন। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"…যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালা তার নেক বান্দার কাছ থেকে এমন জিনিসগুলিকে এড়িয়ে যান যা বাহ্যিকভাবে ভাল বলে মনে হয়, যেমন একটি নতুন চাকরি পাওয়া, তবুও একটি গোপন মন্দ বা অসুবিধা রয়েছে যা থেকে মহান আল্লাহ তার বান্দাকে রক্ষা করতে চান। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

মহান আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসটি একজন মুসলমানের ঈমানকে রক্ষা করেন। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সন্দেহ, মন্দ উদ্ভাবন, পাপ এবং অন্য যেকোন কিছু থেকে রক্ষা করেন যা তাদের ঈমানকে কলুষিত করতে পারে। এটি নিশ্চিত করে যে তারা তাদের বিশ্বাস অটুট রেখে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।

প্রারম্ভে উদ্‌ধৃত মূল হাদীসে প্রদত্ত প্রথম উপদেশের সামগ্রিক শিক্ষা হল, আল্লাহর কাছে সন্তুষ্ট এমন উপায়ে যে নিয়ামত রয়েছে তা ব্যবহার করে ইসলামের সমস্ত সীমাবদ্ধতা রক্ষা করা। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সীমা রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন। তারা দেখতে পাবে যে সমস্ত অসুবিধা এবং পরীক্ষা সহনীয় হয়ে উঠেছে এবং তারা উভয় জগতের আশীর্বাদ পাওয়ার সাথে সাথে নিরাপদে ভ্রমণ করার জন্য নির্দেশিত হবে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ কেন তিনি অবাধ্য অতীত জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছেন এবং কেন তিনি আনুগত্যকারীদের রক্ষা করেছেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

একজন মুসলমানের জন্য তাদের প্রাত্যহিক জীবনে সতর্ক থাকা এবং তাদের নিজেদের পার্থিব বিষয়ে খুব বেশি আত্মনিমগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরী যাতে তারা তাদের চারপাশে ঘটছে এবং ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অধিকারী কারণ এটি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার একটি দুর্দান্ত উপায় যা ফলস্বরূপ একজনকে সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলমান অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন তখন তাদের কেবলমাত্র প্রার্থনাই না হলেও, তাদের কাছে যে কোনও উপায়ে সাহায্য করা উচিত নয়, তবে তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি চিন্তা করা উচিত এবং বোঝা উচিত যে তারাও শেষ পর্যন্ত তাদের ভাল স্বাস্থ্য হারাবে। একটি অসুস্থতা, বার্ধক্য বা এমনকি মৃত্যু দ্বারা। এটি তাদের তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাবে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি।

যখন তারা একজন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু দেখেন তখন তাদের কেবল মৃত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য দুঃখ বোধ করা উচিত নয় বরং তারা বুঝতে পারে যে একদিন তাদের অজানা তারাও মারা যাবে। তাদের বোঝা উচিত যে ধনী ব্যক্তিকে যেমন তাদের সম্পদ, খ্যাতি এবং পরিবার তাদের কবরে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তারাও তাদের কবরে কেবল তাদের কৃতকর্ম নিয়েই থাকবে। এটি তাদের কবর ও পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে।

এই মনোভাব একজন পর্যবেক্ষণ করে এমন সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং করা উচিত। একজন মুসলমানের উচিত তাদের চারপাশের সবকিছু থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যা পবিত্র কুরআনে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 191:

"...এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, [বলুন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এটিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি; আপনি [এমন কিছুর উপরে] মহিমান্বিত, তারপর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।""

যারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তারা প্রতিদিন তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং যারা তাদের পার্থিব জীবনে খুব বেশি আত্মমগ্ন তারা উদাসীন থাকবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ হালাল, হারাম, তিনি যে কাজগুলি পছন্দ করেন এবং যে কাজগুলি তিনি অপছন্দ করেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হালাল ও হারামকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে যা নিজের ঈমান ও সম্মান রক্ষার জন্য এড়িয়ে চলা উচিত।

মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং মদ পানের মতো অধিকাংশ হারাম জিনিস সম্পর্কে সচেতন। তাই এগুলো মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে তাই তাদের উচিত সে অনুযায়ী কাজ করা। অর্থ: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ফরজ দায়িত্ব পালন করুন এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকুন। অন্য সব বিষয় যা বাধ্যতামূলক নয় এবং সমাজে সন্দেহ সৃষ্টি করে তাই পরিহার করা উচিত। মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না কেন কেউ স্বেচ্ছাকৃত কাজ করেনি বরং তিনি জিজ্ঞাসা করবেন কেন তারা একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ করেছে। অতএব, স্বেচ্ছামূলক কাজ ত্যাগ করলে পরকালে কোন পরিণতি হবে না যেখানে স্বেচ্ছামূলক কাজ করা হবে শাস্তি, পুরস্কার বা ক্ষমা। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটির উপর আমল করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অনেক সমস্যা ও বিতর্কের সমাধান করবে এবং প্রতিরোধ করবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন কেউ সন্দেহজনক বা এমনকি নিরর্থক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হয় তখন এটি তাকে বেআইনীর এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রায়ই নিরর্থক এবং অকেজো বক্তৃতা দ্বারা পূর্বে হয়। তাই সন্দেহজনক ও অনর্থক বিষয় এড়িয়ে চলা একজন মুসলিমের ঈমান ও সম্মানের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তারা আজ্ঞাবহ বান্দা হিসাবে গণ্য হবে যারা তাদের পুরষ্কার রক্ষা করবে যতক্ষণ না তারা তাদের কর্মে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক থাকে।

জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে লোক দেখানোর মতো কাজ করে। , মহিমান্বিত, কেয়ামতের দিন তাদের পুরষ্কার লাভের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য তারা কাজ করেছে যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কাজের ভিত্তি এমনকি ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। সহীহ বুখারীর ১ নম্বর হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিচার করেন। একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা সকল ধর্মীয় ও উপকারী পার্থিব কর্ম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পালন করে, যাতে তারা উভয় জগতে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করুন। এই সঠিক মানসিকতার একটি চিহ্ন হল যে এই ব্যক্তিটি তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আশা করে না বা চায় না। যদি কেউ এটি কামনা করে তবে এটি তাদের ভুল উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

উপরন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা দুঃখ এবং তিক্ততাকে প্রতিরোধ করে কারণ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের বিরক্ত এবং তিক্ত করে তুলবে কারণ তারা মনে করে যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন, তিনি তাদের সন্তানদের মতো অন্যদের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে কখনই তিক্ত বা ক্রোধান্বিত হবেন না। এই মনোভাব মানসিক প্রশান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে নিয়ে যায় কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের সৎ কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। এইভাবে সমস্ত মুসলমানদের কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে পড়ে থাকতে পারে।

সরানো

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। হুনাইনের বিজয়ের পর কিছু অমুসলিম শত্রু তায়েফ শহরে পশ্চাদপসরণ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর তায়েফের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। তায়েফের অমুসলিমরা প্রায় 30 দিন অবরুদ্ধ ছিল কিন্তু তারা পরাজিত হয়নি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরপর মুসলিম বাহিনীকে তায়েফ থেকে সরে যেতে নির্দেশ দেন এবং তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য দোয়া করেন। তারা শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ প্রদত্ত এই দ্বিতীয় সুযোগটি গ্রহণ করে সত্যকে গ্রহণ করার জন্য এবং মদিনায় একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করতে এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 476-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অভিযানের সময় আবদুল্লাহ ইবনে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর একটি তীর বিদ্ধ হয়, আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তার আঘাতের ফলে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের চল্লিশ দিন পর তিনি মারা যান। তাঁর খিলাফতের সময়, একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল আবু বক্কর (রাঃ) এর সাথে দেখা করেন। তিনি তাদের সেই তীরটি দেখিয়েছিলেন যা তার ছেলেকে আঘাত করেছিল এবং প্রতিনিধি দলের একজন ব্যক্তি স্বীকার করেছিলেন যে তিনি তীরটি ছুড়েছিলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্রকে শাহাদাত দান করার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ১৪৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমস্ত মুসলমান আশা করে যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপকে দূরে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একই আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের উপর আঁকড়ে ধরে থাকে যা ভবিষ্যতে কোনভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্তত পক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীত ভুল উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

অন্যদের নিয়োগ করা

তাঁর খিলাফতকালে, আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, অনেক লোককে সরকারী পদে নিয়োগ করেছিলেন, যেমন বিচারক এবং গভর্নর। আজকের নেতাদের থেকে ভিন্ন, এই নিয়োগগুলি পার্থিব কারণ যেমন আত্মীয় বা বন্ধু হওয়ার পরিবর্তে একজন ব্যক্তির যোগ্যতা এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ছিল। তিনি যে সমস্ত লোককে নিয়োগ করেছিলেন তারা বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ২৮৬-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলিমদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

জ্ঞানের স্তর

তাঁর খিলাফতকালে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু জ্ঞানের সঠিক স্তর অনুসারে জাতির বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। অর্থ, পবিত্র কুরআন অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য, বিদ্বানদের পারস্পরিক ঐকমত্য এবং বিরল ক্ষেত্রে স্বাধীন যুক্তি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ২৮৬-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন খলিফা হন, তখন তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রায়কে পারস্পরিক ঐকমত্য ও স্বাধীন যুক্তির ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা 20-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রক্রিয়াটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় একটি ঘটনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি ইয়েমেনের একটি প্রদেশ শাসন করার জন্য মুআযত বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে চলে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে যদি তাকে বিচারের জন্য মামলা করা হয় তবে তিনি কী করবেন? মুআযত রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন যে তিনি পবিত্র কুরআন অনুযায়ী বিচার করবেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে, তিনি যদি পবিত্র কুরআনে মামলা ও তার বিচার না পান তাহলে কি হবে। তিনি তখন উত্তর দিলেন যে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে বিচার করবেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উত্তর দিলেন যে, যদি তিনি তার রেওয়ায়েতে মামলা ও তার রায় না পান তাহলে কি হবে। মুআযত, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, অবশেষে উত্তর দিলেন যে তিনি স্বাধীন যুক্তির অর্থ ব্যবহার করবেন, এমন একটি রায় যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এমন প্রতিনিধি দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছেন যা তাকে খুশি করেছিল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 140-141-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যখনই একজন পণ্ডিত ইসলামের বিভিন্ন বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন তখনই তারা স্বাধীন যুক্তি বলে একটি স্তরে পৌঁছাতে পারে। এটি তাদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ঐতিহ্যকে তাদের পেশাগত নিরপেক্ষ রায় দিয়ে ইসলামের মধ্যে একটি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োগ করতে দেয়। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 4487 নম্বর, এই পণ্ডিত যখন একটি ভুল রায় দেন তখন তাদের প্রচেষ্টার জন্য এক বার পুরস্কৃত করা হবে। যদি তারা সঠিক রায় দেয় তবে তাদের দ্বিগুণ পুরস্কৃত করা হবে।

ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখা

যদিও তিনি খলিফা ছিলেন এবং সবচেয়ে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন তবুও আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিজের সাক্ষ্য বা রায়ের ভিত্তিতে কাউকে আইনি শাস্তি দিতেন না। তিনি পরিবর্তে তার বিচারের সাথে এগিয়ে যাওয়ার আগে তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সমর্থন করার জন্য অন্য একজনকে খুঁজবেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ২৮৮-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময় ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। [1] *তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও..."*

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

উদ্ভাবন নয় স্পষ্টীকরণ

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল পরিস্থিতিতে ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়ন করতেন। তিনি এই শিক্ষা অনুসারে জনসাধারণের কাছে বিষয়গুলি পরিষ্কার করতেন এবং নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন এড়িয়ে যেতেন যা নির্দেশনার দুটি উত্স যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, একবার এক পুত্র তার কাছে অভিযোগ করেছিল যে তার পিতা তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে যেতে চান। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতাকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর দৈনন্দিন খরচের জন্য সর্বনিম্ন পরিমাণ নেওয়ার অধিকারী এবং এর বেশি নয়। যখন পিতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, যিনি একবার বলেছিলেন যে একটি সন্তান এবং তাদের সম্পদ তাদের পিতা আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে হাদিসটির অর্থ ছিল একজন পিতা। তার দৈনন্দিন খরচের অধিকারী। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ২৮৯ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের অমুসলিমদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ ও গ্রহণ করা উচিত নয়। যত বেশি মুসলিমরা এটি করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্য অনুসরণ করবে। এই দিন এবং যুগে এটি বেশ স্পষ্ট হয় কারণ অনেক মুসলিম অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করেছে যার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের দ্বারা কতগুলি অ-মুসলিম সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজনকে কেবলমাত্র আধুনিক মুসলিম বিবাহ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যা এটিকে আরও খারাপ করে তোলে তা হল যে অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে ইসলামিক অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এই কারণে অমুসলিমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না যা ইসলামের জন্য বড়

সমস্যা সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, অনার কিলিং হল একটি সাংস্কৃতিক প্রথা যার ইসলামের সাথে এখনও কোন সম্পর্ক নেই কারণ মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং অমুসলিম সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করার অভ্যাসের কারণে সমাজে যখনই অনার কিলিং ঘটে তখনই ইসলামকে দায়ী করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে একত্রিত করার জন্য জাতি ও ভ্রাতৃত্বের আকারে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন তবুও অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক চর্চা অবলম্বন করে অজ্ঞ মুসলিমরা তাদের পুনরুত্থিত করেছে। সহজ কথায়, মুসলমানরা যত বেশি সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করবে, তারা পবিত্র কোরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর তত কম কাজ করবে।

আখেরাতের লক্ষ্য

তার গভর্নরদের তাদের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করার জন্য মনোযোগী করার জন্য, আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, প্রায়ই তাদের কাছে চিঠি লিখতেন যাতে তারা তাদের জড় জগত থেকে সামান্য কিছু গ্রহণ করতে এবং তার পরিবর্তে পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 298-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যখন কেউ আখেরাতের দিকে তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে তখন তারা আল্লাহ, মহান, তাদেরকে যে আশীর্বাদ দিয়েছেন, যেমন কর্তৃত্ব, তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি ব্যক্তি এবং অন্যদের জন্য উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে, বিশেষ করে যখন তারা একটি কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকে।

জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের চেয়ে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেবে তাকে তৃপ্তি দান করা হবে, তাদের বিষয়গুলি তাদের জন্য সংশোধন করা হবে এবং তারা পাবে। সহজ উপায়ে তাদের নির্ধারিত বিধান।

হাদিসের এই অর্ধেকটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, যেমন এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি

পরিহার করে বৈধ উপায়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ প্রদান করাকে তৃপ্তি দেওয়া হবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ লোভী না হয়ে এবং আরও জাগতিক জিনিস পাওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়। বাস্তবে, যে ব্যক্তি যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট সে সত্যিকারের ধনী ব্যক্তি, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ থাকে যদিও তারা জিনিস থেকে স্বাধীন হয়। যে কোনো কিছুর স্বাধীনতাই একজনকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

তদতিরিক্ত, এই মনোভাব একজনকে তাদের জীবনে উদ্‌ভূত যে কোনও জাগতিক সমস্যাগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করার অনুমতি দেবে। এর কারণ হল বস্তুজগতের সাথে যত কম যোগাযোগ করে এবং পরকালের দিকে মনোনিবেশ করে তত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে। একজন ব্যক্তি যত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে তার জীবন তত বেশি আরামদায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে একটি ঘরের অধিকারী তার কাছে দশটি ঘরের অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় একটি ভাঙা কুকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম সমস্যা থাকবে। অবশেষে, এই ব্যক্তি সহজে এবং আনন্দের সাথে তাদের হালাল রিযিক প্রাপ্ত হবে. শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাদের রিযিকের মধ্যে এমন অনুগ্রহ স্থাপন করবেন যে এটি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আবৃত করবে, অর্থাত্ তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের সন্তুষ্ট করবে।

কিন্তু এই হাদিসের অন্য অর্ধেক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের চেয়ে বস্তুগত জগতকে প্রাধান্য দেয়, নিজের কর্তব্যকে অবহেলা করে বা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়াবাড়ির জন্য চেষ্টা করে, সে দেখতে পাবে যে, পার্থিব জিনিসের জন্য তাদের প্রয়োজন, অর্থ লোভ। কখনই সন্তুষ্ট হন না যা সংজ্ঞা দ্বারা তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারাদিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য জগতে যাবে এবং তারা অনেক পার্থিব দরজা খুলে দিয়েছে বলে তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তারা তাদের নির্ধারিত রিজিক কষ্টের সাথে পাবে এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি দেবে না এবং তাদের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট বলে

মনে হবে না। এমনকি এটি তাদেরকে হারামের দিকে ঠেলে দিতে পারে যা শুধুমাত্র উভয় জগতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

ভালবাসা

যদিও অনেক অজ্ঞ লোক আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, তবুও তাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান ও আচরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে সেখানে তাদের মধ্যে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ছাড়া কিছুই ছিল না। তাদের মধ্যে যে কোনও খারাপ অনুভূতি শুধুমাত্র স্বার্থপরতা এবং লোভকে নির্দেশ করবে - নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে তারা মুক্ত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার চেয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের প্রতি সদাচরণ পছন্দ করেন। এটি সহীহ বুখারী, 4036 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালোবাসার নিদর্শন, মহান আল্লাহ তায়ালা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যারা ভালোবাসেন তাদের সকলকে ভালোবাসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, যদিও এটি তাদের সম্পর্কে কারও ব্যক্তিগত মতামতের বিরোধিতা করে। এই ভালবাসা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কথার মাধ্যমে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে ভালবাসা ঘোষণা করে। উদাহরণ স্বরূপ, এটা সকলের কাছে সুস্পষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নেককার পূর্বসূরিগণ এই প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা সেই ব্যক্তির উপর কর্তব্য যে মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। এটি অনেক হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যেমন সহীহ বুখারী, 17 নম্বরে পাওয়া একটি। এটি পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যকারীদের প্রতি ভালবাসা, অর্থাত্ পবিত্র নগরী মদিনার বাসিন্দারা।

ঈমানের একটি অংশ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা ভন্ডামীর লক্ষণ। জামে আত তিরমিযী, 3862 নম্বরে পাওয়া অন্য একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে তারা যেন কোন সাহাবীর সমালোচনা না করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের ভালবাসা একটি চিহ্ন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা এবং তাদের ঘৃণা করা মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মহান আল্লাহকে ঘৃণা করার লক্ষণ। এই ব্যক্তি সফল হবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সুনানে ইবনে মাজা, 143 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বরকতময় পরিবার সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

যদি একজন মুসলিম অযৌক্তিকভাবে এমন কোন মুসলিমের সমালোচনা করে যারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করে, তাহলে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাব প্রমাণ করে। একজন মুসলমান যদি পাপ করে তবে অন্য মুসলমানদের পাপকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের উচিত হবে পাপী মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে কারণ তাদের আল্লাহ, মহানবী ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। অন্যদের ভালবাসার লক্ষণ হল তাদের সাথে সদয় এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত সেই সমস্ত লোকদের অপছন্দ করা যারা আল্লাহ, মহান এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবাসে তাদের প্রতি অপছন্দ দেখায়, সে ব্যক্তি আত্মীয় বা অপরিচিত নির্বিশেষে। একজন মুসলমানের অনুভূতি কখনই তাদের আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার এই নিদর্শন পূরণে বাধা দেবে না। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের

ক্ষতি করবে বরং তাদের এটা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত যে, যারা মহান আল্লাহ ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে তাদের ঘৃণা করা অগ্রহণযোগ্য। যদি তারা এই বিপথগামী মনোভাবের উপর অটল থাকে তবে তাদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক জটিলতা

প্রাথমিকভাবে, রোমান এবং পারস্যের পরাশক্তিরা আরব উপদ্বীপে সম্পূর্ণভাবে আগ্রহী ছিল না, কারণ এটি ছিল মূলত মরুভূমি। এই কারণেই এটির বেশিরভাগই পরাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। কিন্তু যখন ইসলাম আরব উপদ্বীপে দৃঢ়ভাবে পা রাখতে শুরু করে, তখন মুসলিম জাতিকে একটি পরাশক্তিতে পরিণত করা ঠেকাতে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী দুই পরাশক্তিকে সতর্ক করে দেয়। অতএব, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবদ্দশায়, মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই অঞ্চলটি রোমানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং তাই শত্রু সেনাবাহিনী রোমান এবং খ্রিস্টান আরবদের নিয়ে গঠিত। এই যুদ্ধ মুসলমানদের বিশাল বিজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

পরবর্তীতে, মদিনায় হিজরতের পর নবম বছরে, তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় যেখানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলিম সেনাবাহিনীকে রোমান অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভয়ে রোমান বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়। যদিও কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, মুসলিমরা রোমানদের উপর একটি বিশাল মনস্তাত্ত্বিক বিজয় অর্জন করেছিল।

সময়ের সাথে সাথে রোমানরা তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য ইসলামী সাম্রাজ্যের দিকে ধাক্কা দিতে থাকে। ফলে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময় রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আল বলকা ও ফিলিস্তিনে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। . এই বাহিনী মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে শিবিরে অবস্থান

করেছিল যতক্ষণ না তারা শুনতে পায় যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্য মদিনায় ফিরে আসেন।

একই সাথে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মৃত্যু আরব উপজাতিদের অনেককে, যারা প্রাথমিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, ধর্মত্যাগ করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যা নবীকে অনুসরণ করতে শুরু করে এবং অন্যরা বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করতে অস্বীকার করে। এই আরব উপজাতিরা তখনই ইসলাম গ্রহণ করেছিল যখন এটি এই অঞ্চলে প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং তাই তাদের বিশ্বাস সর্বদা দুর্বল ছিল এবং বিশ্বাসের নিশ্চিততার পরিবর্তে অন্ধ অনুকরণের উপর ভিত্তি করে ছিল। ভন্ড নবী বিশ্বাসের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিলেন।

আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাই, দুটি বড় সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল, প্রথমটি হল রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য এবং দ্বিতীয়টি আরব উপজাতি যারা ধর্মত্যাগ করেছিল। মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা একটি যৌক্তিক পন্থা অবলম্বন করে এবং তাকে দুটি পরাশক্তির সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার এবং এর পরিবর্তে প্রথমে ধর্মত্যাগী আরব উপজাতিদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন বলে তিনি তাঁর আদেশ বাতিল করতে চাননি। অতএব, তিনি এই বাহিনীকে তাদের মিশন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

এটি ছিল একটি সাহসী কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ, কারণ এটি আবু বক্করকে দিয়েছিল, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগেই দুটি পরাশক্তি এবং ধর্মত্যাগীদের উপর একটি মনস্তাত্ত্বিক বিজয়। সাধারণ পরিস্থিতিতে একজন নেতা বাহ্যিক সমস্যা মোকাবেলা করার আগে

প্রথমে অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা করতেন কিন্তু একই সাথে উভয় সমস্যা মোকাবেলা করার মাধ্যমে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করেন যে তার কাছে জনশক্তি, অস্ত্র রয়েছে। এবং একই সময়ে উভয় সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সম্পদ , যদিও তার কাছে একটি একক সমস্যা মোকাবেলা করার সম্পদ ছিল না। এই মনস্তাত্ত্বিক বিজয় অবিশ্বাস্যভাবে কার্যকর ছিল কারণ এটি ইসলামের শত্রুদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করেছিল। উপরন্তু, এই কৌশলটি সকলের কাছে একটি সুস্পষ্ট বার্তা ছিল যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর মুসলমানদের সংকল্প দুর্বল হয়নি। এই স্পষ্ট বাণী ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 314-317-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিম জীবনে সর্বদাই হয় স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হয়। কিছু অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে কেউই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও সংজ্ঞা অনুসারে অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবে তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য ও দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শিখে। এবং লোকেরা প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে অসুবিধার সময়গুলি অনুভব করার পরে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল এটির প্রতি চিন্তা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে আলোচনা করা বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধা জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সত্যিকারের মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করার মধ্যে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। এটা এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। তাই

একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এই মুহূর্তগুলি তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতে চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

একজন যোগ্য নেতা

তাঁর অন্তিম অসুস্থতার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আল বলকা ও ফিলিস্তিনে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে শিবির স্থাপন করে যখন তারা শুনল যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অসুস্থ। তিনি মারা গেলে তারা পরবর্তী নির্দেশের জন্য মদিনায় ফিরে আসেন।

আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সেনাবাহিনীকে তাদের মিশন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, উসামার প্রতি কিছু অপছন্দ দেখিয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত অল্পবয়সী এবং অনভিজ্ঞ এবং এমনকি অনেক সিনিয়র সাহাবীর উপরে নেতা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট হন। তাঁর ইন্তেকালের আগে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এমনকি তাঁর পিতা যায়েদ বিন হারিথা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো তিনি নেতৃত্বের যোগ্য বলে ঘোষণা দিয়ে যারা এইভাবে অনুভব করেছিলেন তাদের সমালোচনা করেছিলেন। তার আগে নেতৃত্বের, যদিও লোকেরা তার নেতৃত্বে নিয়োগের সমালোচনা করেছিল। এটি সহীহ বুখারী, 4469 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর এবং আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী পুনরায় প্রেরণ করেন, কিছু সাহাবী উমরকে উৎসাহিত করেন। ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যারা সেই সেনাবাহিনীর অংশ ছিলেন, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করেছিলেন যে, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব আবার বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ কাউকে দেওয়ার জন্য। এই অনুরোধ শুনে আবু বক্কর

রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রোধে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর দাড়ি ধরে ফেললেন এবং মন্তব্য করলেন যে, তিনি কীভাবে তাঁকে বরখাস্ত করতে পারেন যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাকে, ব্যক্তিগতভাবে তাকে নিযুক্ত করেছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে তিনি নেতৃত্বের যোগ্য। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 325-326-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যাদের উসামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিয়োগ নিয়ে সমস্যা ছিল, তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দে অসন্তুষ্ট হননি। তার উপর। তাদের কেবল তার নেতৃত্ব নিয়ে সমস্যা ছিল কারণ তিনি অত্যন্ত তরুণ এবং যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন। একজন অভিজ্ঞ এবং আশ্চর্যজনক নেতা থাকা একটি যুদ্ধের সময় নেতৃত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। যে নেতার এই গুণাবলীর অভাব রয়েছে সে তার আদেশ জারি করার সময় সৈন্যদের হৃদয়ে দ্বিধা সৃষ্টি করতে পারে। এই দ্বিধা প্রায়শই যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য করে। এই কারণেই কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাঁর নেতা হিসাবে নিয়োগের বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন।

উপরন্তু, উসামা, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন কারণ তিনি উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তারা অন্যদেরকে যা পরামর্শ দেয় তার উপর আমল করা। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা তাদের প্রচারের উপর কাজ করেছিল তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেয়নি। সর্বোত্তম উদাহরণ হ'ল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি কেবল যা প্রচার করেছিলেন তা অনুশীলন করেননি বরং সেই

শিক্ষাগুলি অন্য কারও চেয়ে কঠোরভাবে মেনে চলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের সাথে মুসলমানদের বিশেষ করে, পিতামাতারা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করে কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে মিথ্যা বলে তার সন্তানরা তার পরামর্শে কাজ করার সম্ভাবনা কম। একজন ব্যক্তির কর্ম সবসময় তার বক্তব্যের চেয়ে অন্যদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তবে সে নিজেই তার উপর আমল করে। কঠিন শাস্তি জাহান্নামে. অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশের উপর নিজে আমল করার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক এবং অন্যদেরকেও তা করার পরামর্শ দেওয়া। দৃষ্টান্ত দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া হল সমস্ত নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য, এবং অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

অবশেষে, যদিও উসামা, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যদিও তিনি খুব অল্প বয়সী ছিলেন তবুও তিনি সঠিক উপায়ে বড় হয়েছিলেন যার অর্থ, ইসলামের

শিক্ষা অনুসারে তিনি একজন মহীয়সী ব্যক্তি এবং নেতা হয়েছিলেন। মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী যুবসমাজকে গড়ে তোলার প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে যাতে তারা নিশ্চিত করে যে মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্ম মহৎ ও প্রশংসনীয় হয়ে উঠতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 1952 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে সবচেয়ে নেক উপহার দিতে পারেন তা হল তাদের উত্তম চরিত্র শেখানো।

এই হাদিসটি মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়স্বজন, যেমন তাদের সন্তানদের, তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন ও প্রদানের বিষয়ে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, পার্থিব উত্তরাধিকার আসে এবং যায়। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম তাদের সন্তানদের শেখানোর বিষয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন যে কীভাবে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হয় এবং প্রচুর সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন করতে হয় যে তারা তাদের মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য শেখাতে অবহেলা করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। ধৈর্য এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ। একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাদের কাছে তাদের সন্তানদের ভালো আচরণ শেখানোর জন্য প্রচুর সময় রয়েছে কারণ তাদের মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে লোকেদের উপর আঘাত করে।

এছাড়াও, বাচ্চারা যখন বড় হয়ে যায় এবং তাদের পথে সেট হয়ে যায় তখন তাদের ভাল আচরণ শেখানো অত্যন্ত কঠিন। আজকের দিনটি একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়স্বজনকে যে উপহার দিতে চান তার প্রতিফলন করা উচিত। এভাবেই একজন মুসলিম আখেরাতের জন্য কল্যাণ প্রেরণ করে কিন্তু একজন ধার্মিক সন্তান হিসাবে ভাল কিছু রেখে যায় যা তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করে তাদের উপকার করে। জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

একজন নম্র খলিফা

যখন আবু বক্কর উসামা ও তার বাহিনীকে বিদায় জানাতে বের হয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি তাদের পাশাপাশি হাঁটতে পছন্দ করেন যখন উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সওয়ারী পশুর উপর আরোহণ করেছিলেন। সম্মানের বশবর্তী হয়ে, উসামা, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি নেমে আসবেন এবং তাঁর সাথে হাঁটবেন অথবা আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে আরোহণ করবেন এবং তাঁর সাথে আরোহণ করবেন। কিন্তু আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয় পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন এবং উত্তর দেন যে তিনি মহান আল্লাহর পথে তাঁর পা ধূলিসাৎ করতে চান। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৩২৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য উসামাকে নিয়ে ইতস্তত বোধ করছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন তরুণ এবং অনভিজ্ঞ। তার প্রতি অনেক সম্মান প্রদর্শন করে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কর্তৃত্বকে আরও বেশি করে দেন।

ধার্মিক পূর্বসূরিদের দিন থেকে কীভাবে জিনিসগুলি এত পরিবর্তিত হয়েছে তা লজ্জাজনক। তখনকার দিনে তারা নেতা হয়ে আসলে জনগণের সেবক হয়ে উঠেছিল এবং জনগণের অর্থ নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় না করে নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থ জনগণের জন্য ব্যয় করত। অথচ আজকাল নেতা ও রাজপরিবাররা জনগণের সম্পদ ব্যয় করে এমন আচরণ করে যেন তারাই জাতির মালিক।

মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূরিদেরকে তাদের আদর্শ হিসেবে বেছে নেওয়া এবং তাদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সকলের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে যা একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই নয় যে একজনের নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং তারপরে তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাদেরকে প্রথমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এবং তারপর মানুষের অধিকার আদায় করতে হবে।

ভালো সঙ্গী

যখন আবু বক্কর উসামা ও তার সৈন্যবাহিনীকে বিদায় জানাতে বের হয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে, যিনি এই সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন, তাকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন যেমন তিনি একজন আন্তরিক ছিলেন। এবং বিজ্ঞ উপদেষ্টা। সম্ভবত, তিনি তাকে আবারও রাখতে চেয়েছিলেন কারণ তিনি তাকে প্রশিক্ষণ দিতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি ইসলামের পরবর্তী খলিফা হতে পারেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, সেনাবাহিনীর নেতা উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এর জন্য অনুমতি চাইলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 326-327-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য উসামাকে নিয়ে ইতস্তত বোধ করছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন তরুণ এবং অনভিজ্ঞ। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আদেশ না দিয়ে তাঁর সাথে থাকার অনুমতি দেওয়ার অনুরোধ করে তাঁর প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু উসামার কর্তৃত্বকে আরও সীলমোহর দিয়েছেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

উপরন্তু, এটি ভাল সাহচর্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে, যা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক।

মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে সত্যিকারের ভালবাসার একটি প্রধান চিহ্ন হল যখন কেউ তাদের প্রিয়জনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কারণ আনুগত্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি একজন ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তা এবং সাফল্য কামনা করে না সে কখনই তাকে সত্যিকারের ভালবাসতে পারে না, তারা যা দাবি করুক বা অন্য ব্যক্তির সাথে কীভাবে আচরণ করুক না কেন। একজন মানুষ যেমন খুশি হয় যখন তার প্রিয় পার্থিব সাফল্য লাভ করে, চাকরির মতো, তারাও তার প্রিয়জনের পরকালের সাফল্য কামনা করবে। যদি একজন ব্যক্তি অন্যের নিরাপত্তা এবং সাফল্য লাভের বিষয়ে চিন্তা না করে, বিশেষ করে পরবর্তী জগতে, তাহলে তারা তাদের ভালোবাসে না।

একজন সত্যিকারের প্রেমিক তাদের প্রেয়সীকে ইহকাল বা পরকালে কষ্ট ও শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখে ও তা সহ্য করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে পরিহার করা যায়। অতএব, তারা সর্বদা তাদের প্রিয়তমকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে। কোন ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যকে তার নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে, তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের প্রকৃতপক্ষে ভালবাসে না। এটি বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তার মতো সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতএব, একজন মুসলমানের মূল্যায়ন করা উচিত যে তাদের জীবনে যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে কি না। যদি তারা তা করে তবে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালবাসার স্পষ্ট লক্ষণ। যদি তারা তা না করে তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের সত্যিকারের ভালবাসে না। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

বাগদানের নিয়ম

আবু বক্কর যখন উসামা ও তার বাহিনীকে বিদায় জানাতে বের হলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তখন তিনি তাদেরকে কিছু বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 327-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমটি ছিল যে তিনি তাদের বিশ্বাসঘাতক না হওয়ার জন্য সতর্ক করেছিলেন।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলিমদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি আবু বক্কর (রা) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সেনাবাহিনীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা সঠিকভাবে বণ্টন করার আগে যুদ্ধের গনীমত থেকে অন্যায়ভাবে গ্রহণ না করে।

সাধারণভাবে বলা যায়, হারাম ব্যবহার করা একটি বড় পাপ। এর মধ্যে রয়েছে বেআইনি সম্পদ ব্যবহার, বেআইনি জিনিস ব্যবহার করা এবং বেআইনি খাবার খাওয়া। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে নির্দিষ্ট জিনিসগুলিকে ইসলাম হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে যেমন অ্যালকোহল শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলিই হারাম নয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি হালাল জিনিসগুলিও হারাম হয়ে যেতে পারে যদি সেগুলি হারাম জিনিসের মাধ্যমে লাভ করা হয়। যেমন, হালাল খাদ্য হারাম হয়ে যেতে পারে যদি তা হারাম সম্পদ দিয়ে কেনা হয়। তাই, মুসলমানদের জন্য এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কেবলমাত্র হালাল জিনিসগুলির সাথেই লেনদেন করে কারণ এটি কাউকে ধ্বংস করতে হারামের একটি উপাদান লাগে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সহীহ মুসলিম, 2346 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি হারাম ব্যবহার করবে তার সমস্ত প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হবে। যদি তাদের

দোয়া মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে কি তাদের কোনো ভালো কাজ কবুল হওয়ার আশা করা যায়? প্রকৃতপক্ষে এর উত্তর সহীহ বুখারি, 1410 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদীসে পাওয়া গেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহই কেবল হালালকে গ্রহণ করেন। অতএব, অবৈধ সম্পদের সাথে পবিত্র তীর্থযাত্রা করার মতো যে কোনো কাজ যা হারামের ভিত্তি রয়েছে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 3118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, বিচারের দিন এই ধরনের ব্যক্তিকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

" এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না বা শাসকদের কাছে [ঘুষের মাধ্যমে] পাঠাও না যাতে [তারা সাহায্য করতে পারে] জনগণের সম্পদের একটি অংশ পাপে ভোগ করতে, যদিও তোমরা জান [এটি অবৈধ।]"

তৃতীয় বিষয় আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সেনাবাহিনীকে তাদের প্রতারণামূলক না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এই অশুভ বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে মিথ্যা।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে মিথ্যা বলা মুনাফিকির একটি

দিক। মিথ্যা বলা অগ্রহণযোগ্য যে এটি একটি ছোট মিথ্যা যা প্রায়ই একটি সাদা মিথ্যা বলা হয় বা যখন কেউ একটি রসিকতা হিসাবে মিথ্যা বলে। এই সব ধরনের মিথ্যা বলা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাই তাদের উদ্দেশ্য কাউকে ধোঁকা দেওয়া নয়, জামি আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি জনপ্রিয় মিথ্যা যা লোকেরা প্রায়শই বলে যে এটি একটি পাপ নয় তা হল যখন তারা শিশুদের সাথে মিথ্যা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুনাহ যেমন সুনানে আবু দাউদ, নং 4991 এ পাওয়া যায়। বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা পরিষ্কার মূর্খতা কারণ তারা এই পাপপূর্ণ অভ্যাসটি শুধুমাত্র বড়দের কাছ থেকে গ্রহণ করবে যে তাদের সাথে মিথ্যা বলে। এইভাবে আচরণ করা দেখায় যে শিশুদের মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য যখন এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। শুধুমাত্র খুব বিরল এবং চরম ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, উদাহরণস্বরূপ, একটি নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা জরুরী, এটি অন্যান্য গুনাহের দিকে নিয়ে যায় যেমন, গীবত করা এবং লোকদের উপহাস করা। এই আচরণ একজনকে জাহান্নামের দরজার দিকে নিয়ে যায়। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে তখন মহান আল্লাহ তাকে মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। কেয়ামতের দিন একজন ব্যক্তির কী ঘটবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই, যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সমস্ত মুসলমান ফেরেশতাদের সঙ্গ কামনা করে। তবুও, যখন একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলে তখন তারা তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে বাদ দেওয়া দুর্গন্ধ ফেরেশতাদের তাদের থেকে এক মাইল দূরে সরিয়ে

দেয়। জামে আত তিরমিযী, 1972 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

যুদ্ধের শিষ্টাচার

আবু বক্কর যখন উসামা ও তার বাহিনীকে বিদায় জানাতে বের হলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তখন তিনি তাদেরকে কিছু বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 327-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কিছু বিষয় আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সেনাবাহিনীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন: শত্রু সৈন্যদের বিকৃত না করা; ফল ধরে এমন একটি গাছ কাটবেন না; অযথা প্রাণী হত্যা না করা; এবং অন্য ধর্মের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের ক্ষতি না করা যারা শত্রু সেনাবাহিনীর অংশ ছিল না, যেমন পুরোহিত এবং সন্ন্যাসী।

এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতের অর্থ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের অর্থ সঠিকভাবে বোঝার জন্য তাদের সঠিক প্রেক্ষাপটে স্থান দিতে হবে। অর্থ, কোনো আয়াত বা হাদিস যে প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ ব্যতীত বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করা যাবে না যাতে কারো কর্মকে সমর্থন করা যায়। প্রসঙ্গটি সঠিকভাবে বোঝার জন্য একজনকে অবশ্যই এর সাথে সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসগুলিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে। শুধুমাত্র এইভাবে একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদীস কি বা কাদের নির্দেশ করে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

উপরন্তু, মুসলমানরা কেবলমাত্র একজন বৈধ শাসকের পতাকায় বহিরাগত আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে পারে এবং যখন এটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী করা হয়। যারা লড়াই করে তাদের অবশ্যই এই সীমা ও নিয়মগুলি অতিক্রম করার জন্য সর্বদা মহান আল্লাহকে ভয় করতে হবে। এরকম একটি নিয়ম হল যখন কেউ আক্রমণ করা হয় তখনই যুদ্ধ অবলম্বন করা। অতএব, শান্তির অবস্থায় শত্রুর বিরুদ্ধে শারীরিক আগ্রাসন দেখানো হারাম। আরেকটি নিয়ম হল, শত্রু যখন আগ্রাসন থেকে বিরত থাকে তখন মুসলমানদেরও অবশ্যই বিরত হতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 193:

"... কিন্তু যদি তারা বন্ধ করে দেয়, তবে লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া কোন আগ্রাসন [অর্থাৎ আক্রমণ] হবে না।"

শত্রু যদি চায় শান্তি এটা মঞ্জুর করা আবশ্যক. অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 90:

"... সুতরাং তারা যদি তোমাদের থেকে দূরে সরে যায় এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদেরকে শান্তির প্রস্তাব দেয়, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে [যুদ্ধের] কারণ তৈরি করেননি।"

তৃতীয় নিয়ম হল বেসামরিকদের ক্ষতি করা যাবে না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বারবার যুদ্ধের সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থদের পাশাপাশি ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীদের ক্ষতি করতে নিষেধ করেছেন। এটি অনেক হাদীসে নিশ্চিত করা

হয়েছে যেমন সুনানে আবু দাউদ, 2614 নম্বর এবং মুসনাদে আহমদ, 2728 নম্বরে পাওয়া যায়।

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বক্কর (রা.) শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি ফলধারী গাছ কাটা, সম্পত্তির ক্ষতি এবং গবাদি পশু হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটি মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, 33121 নম্বরে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনীকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কৃষকের মতো অ-সৈনিকদের ক্ষতি করবেন না। এটি মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, 33120 নম্বরে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আসন্ন সংঘাতের ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিকে যথাসাধ্য প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তুতির লক্ষ্য শত্রুকে আক্রমণ থেকে বিরত রাখা, সেক্ষেত্রে শত্রু যদি শান্তি চায় তবে তা অবশ্যই তাদের দিতে হবে। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 60-61:

"এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও ঘোড়দৌড়ের প্রস্তুতি নাও যার দ্বারা আপনি আল্লাহর শত্রু এবং আপনার শত্রুকে ভয় দেখাতে পারেন... এবং যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে থাকে তবে আপনিও তার দিকে ঝুঁকুন..."

যারা মুসলমানদের সাথে তাদের চুক্তিকে সম্মান করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 12-13:

“এবং যদি তারা তাদের চুক্তির পরে তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং আপনার ধর্মের অবমাননা করে, তাহলে অবিশ্বাসের নেতাদের সাথে লড়াই করুন, কারণ তাদের কাছে কোন শপথ [পবিত্র] নেই; [তাদের সাথে যুদ্ধ কর যাতে] তারা থামতে পারে। তুমি কি এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছে এবং তারাই প্রথমবার তোমার উপর আক্রমণ শুরু করেছে?

যারা তাদের চুক্তিকে সম্মান করে তাদের আক্রমণ করা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 7:

"...তাই যতক্ষণ তারা আপনার দিকে সরল, তাদের দিকে সোজা থাকুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন [যারা তাঁকে ভয় করে]।

কাউকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করার প্রশ্নই আসে না কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা কেবলমাত্র মুখে ও কাজের মাধ্যমে নয়, অন্তর থেকেও গ্রহণ করতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 256:

"ধর্ম গ্রহণে কোন জবরদস্তি থাকবে না..."

যারা মুসলমানদের সাথে শান্তিতে থাকে তাদের সাথে সর্বদা ন্যায়বিচার করতে হবে। অধ্যায় 60 আল মুমতাহানাহ, আয়াত 8-9:

"আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের থেকে নিষেধ করেন না যারা ধর্মের কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেয় না - তাদের প্রতি সদাচরণ করা এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতাকারীদের ভালবাসেন। আল্লাহ শুধু তাদের থেকে তোমাদের নিষেধ করেন যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে কারণ ধর্মের এবং তোমাদেরকে তোমাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করবে এবং তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করবে..."

যুদ্ধ মহান আল্লাহর কাছে ঘৃণ্য, এবং মুসলমানদের অবশ্যই এতে বাধ্য করা উচিত এবং এটি কামনা করা উচিত নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে যখন তা তোমাদের জন্য ঘৃণাজনক..."

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন এবং পরিবর্তে তাদেরকে মহান আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা কামনা করতে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু

শত্রুর মুখোমুখি হতে বাধ্য হলে তাদের অবিচল থাকতে হবে। এটি সহীহ বুখারী, 2966 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আয়াতগুলির আসল উদ্দেশ্য হল জোর দেওয়া যে বলপ্রয়োগ করা উচিত তখনই যখন এর ব্যবহার অনিবার্য, কেবলমাত্র সেই পরিমাণে যা একেবারে প্রয়োজনীয় এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশনায় এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্যের অধীনে শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। তার উপর।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কোন আয়াত বা হাদিস কে, কি এবং কোথায় প্রযোজ্য তা বোঝার জন্য তার সঠিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা অত্যাবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, এভাবে যুদ্ধ করার বিষয়ে আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়। একটি খুব বিখ্যাত উদাহরণ হল একটি আয়াত যাকে তরবারি পদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও পবিত্র কুরআনে "তলোয়ার" শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 5:

"এবং যখন অলঙ্ঘনীয় মাস অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর এবং তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং অতর্কিত অবস্থানে তাদের জন্য অপেক্ষা কর।

যেমনটি আগে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এমনকি যুদ্ধের এই বিবৃতিটি নির্দিষ্ট শর্ত এবং শান্তির ছাড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপরন্তু, এই এবং অন্যান্য সম্পর্কিত আয়াতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন করা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে এটি অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একটি সর্বজনীন নীতি নয়। অর্থ,

আয়াতটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট দলকে বোঝায়।

তরবারি আয়াতের আশেপাশের আয়াতগুলি একাধিকবার স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে মুশরিকরা কেবলমাত্র তারাই যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি বারবার লঙঘন করেছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংস আগ্রাসনের কাজে লিপ্ত হয়েছিল। সম্প্রদায় এবং তার সহযোগীরা। উদাহরণস্বরূপ, তলোয়ার আয়াতের ঠিক আগের আয়াতটি, অর্থ, অধ্যায় 9 আত তাওবাহ, আয়াত 4, বলে:

"তারা ব্যতীত যাদের সাথে তুমি মুশরিকদের মধ্যে চুক্তি করেছিলে অতঃপর তারা তোমার প্রতি কোন ত্রুটি করেনি বা তোমার বিরুদ্ধে কাউকে সমর্থন করেনি; সুতরাং তাদের জন্য তাদের চুক্তি সম্পূর্ণ করুন যতক্ষণ না তাদের মেয়াদ শেষ হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন [যারা তাঁকে ভয় করে]।

এটি একটি সম্পর্কিত আয়াতে আরেকটি আদেশ অনুসরণ করে, অধ্যায় 9 আত তাওবাহ, আয়াত 7:

"মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে চুক্তি কিভাবে হতে পারে, যাদের সাথে তোমরা আল-মসজিদ আল-হারামে চুক্তি করেছিলে? তাই যতক্ষণ তারা তোমার দিকে সোজা থাকে, ততক্ষণ তাদের প্রতি সোজা হয়ে দাঁড়াও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন [যারা তাঁকে ভয় করে]।

এই মুশরিকদের অপরাধ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 9 তওবাহে, আয়াত 8-10:

"কিভাবে [একটি চুক্তি হতে পারে] যখন তারা আপনার উপর আধিপত্য অর্জন করে তবে তারা আপনার সম্পর্কে কোন আত্মীয়তার চুক্তি বা সুরক্ষার চুক্তি পালন করে না? তারা তাদের মুখ দিয়ে তোমাকে সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তর [অনুগত্য] অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। তারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শন বিনিময় করেছে এবং [মানুষকে] তাঁর পথ থেকে বিরত রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা যা করত তা ছিল মন্দ। তারা একজন বিশ্বাসীর প্রতি আত্মীয়তার কোনো চুক্তি বা সুরক্ষার চুক্তি পালন করে না। আর তারাই সীমালংঘনকারী।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 12-13:

"এবং যদি তারা তাদের চুক্তির পরে তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং আপনার ধর্মের অবমাননা করে, তাহলে অবিশ্বাসের নেতাদের সাথে লড়াই করুন, কারণ তাদের কাছে কোন শপথ [পবিত্র] নেই; [তাদের সাথে যুদ্ধ কর যাতে] তারা থামতে পারে। আপনি কি এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তারা প্রথমবার আপনার উপর [আক্রমণ] শুরু করেছে?

থিসিস নির্দিষ্ট মুশরিকরা ক্রমাগত তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করেছে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে, মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয়, মক্কা ও মসজিদ আল হারাম থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করে। উদ্‌ধৃত আয়াতে অন্তত আটবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধের কথা বলা হয়েছে।

অধ্যায় 9 তওবাহ, আয়াত 12, যা উপরে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে, "অবিশ্বাসের নেতাদের" সাথে লড়াই করার লক্ষ্য তাই তারা তাদের আগ্রাসন থেকে "বন্ধ" হয়ে যায়। এই আয়াতগুলি, বাকিদের মতো, যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট শর্তগুলি মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে যেমন শুধুমাত্র তাদের সাথে লড়াই করা যারা প্রথমে তাদের সাথে যুদ্ধ করে।

উপরন্তু, এই মুশরিকদের এখনও অনেক সতর্কতা এবং ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তাদের চার মাসের অবকাশ ও শান্তি দেওয়া হয়েছিল। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 2:

"অতএব, [হে কাফেররা], চার মাস দেশে অবাধে ভ্রমণ কর, কিন্তু জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না..."

এবং অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 5:

"এবং যখন অলঙঘনীয় [চার] মাস অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানে হত্যা কর এবং তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং তাদের জন্য অতর্কিত অবস্থানে বসে থাক..."

এই অবকাশ দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা হয় ইসলাম গ্রহণ করে অথবা শান্তিপূর্ণভাবে আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করে। উপরন্তু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মুশরিকদের মধ্যে যেকোন ব্যক্তিকে সুরক্ষা দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা কোনো ভয় বা চাপ ছাড়াই ইসলামের শিক্ষা শোনার সুযোগ পায় বা তারা শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় ছাড়াই আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করুন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 6:

"এবং যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দিন যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পারে [অর্থাৎ কুরআন]। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিন। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা জানে না।"

এই মুশরিকদের যুদ্ধ ও হত্যার তরবারি আয়াতের নির্দেশ তখনই কার্যকর হবে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে চার মাসের অবকাশের পর আরব উপদ্বীপে অবস্থান করে। উল্লেখ্য যে, অনেক মুশরিক এই অবকাশের সুযোগ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অবকাশের কারণে যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং তরবারি আয়াতের কারণে প্রকৃতপক্ষে কোন রক্তপাত হয়নি কারণ এই আয়াতের লক্ষ্য ছিল আরও রক্তপাত থেকে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করা অর্থ, হয় এই মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণ করে বা শান্তিপূর্ণভাবে আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করে।

উপসংহারে, আশেপাশের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবন, তরবারি আয়াতটিকে সঠিক প্রেক্ষাপটে স্থান দিন। অর্থ, মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট শত্রু মুশরিকদের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য এই আয়াতগুলো বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, তারা তাদের পরে অন্যদের জন্য খালিভাবে প্রয়োগ করা যাবে না।

ধর্মত্যাগী যুদ্ধ

ধর্মান্ধতা এড়িয়ে চলুন

আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, দুটি বড় সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল, প্রথমটি হল দুটি পরাশক্তি: রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্য এবং দ্বিতীয়টি আরব উপজাতি যারা ধর্মত্যাগ করেছিল। মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা একটি যৌক্তিক পন্থা অবলম্বন করে এবং তাকে পরাশক্তির সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার এবং এর পরিবর্তে প্রথমে আরব উপজাতিদের ধর্মত্যাগের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন বলে তিনি তাঁর আদেশ বাতিল করতে চাননি। উপরন্তু, যদিও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, আরব উপজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যারা ফরজ দান করতে অস্বীকার করেছিল, তিনি তাদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসলামের সেই স্তম্ভটিকে প্রত্যাখ্যান করা কুফর এবং তাই যুদ্ধ করার একটি সুস্পষ্ট কারণ। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 314-317 এবং সহীহ বুখারী, 1399-1400 নম্বরে পাওয়া হাদীসগুলিতে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি, সেইসাথে ইসলামী ইতিহাসের অন্যান্য অনেকগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্দেশ করে, যথা, সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত বা মতামত সবসময় সঠিক নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি সঠিক পছন্দ এবং এটি অনুসরণ করা প্রশংসনীয়, যতক্ষণ না এটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কোনটিই কম

নয়, একজনকে অবশ্যই আচরণ করা উচিত নয়। একটি ধর্মান্ধ মত এবং সহজভাবে বিশ্বাস সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত সবসময় সঠিক.

বর্ধিতভাবে, একজন মুসলিম যিনি একটি নির্দিষ্ট আলেমকে অনুসরণ করেন যিনি একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকেন তাদের উচিত একজন ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের আলেম সর্বদাই সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন নির্দিষ্ট আলেমের অনুসারী মুসলমানের এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদেরকে অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে আলেমকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

ইসলামের পক্ষে দাঁড়ানো

রোমান ও পারস্যের পরাশক্তির হুমকি মোকাবেলা করা একটি বাহ্যিক হুমকি ছিল যা আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল। অন্যান্য বড় অভ্যন্তরীণ হুমকির মধ্যে ছিল অনেক আরব উপজাতি যারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর ধর্মত্যাগ করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যা নবীকে অনুসরণ করতে শুরু করে এবং অন্যরা বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করতে অস্বীকার করে। এই আরব উপজাতিরা তখনই ইসলাম গ্রহণ করেছিল যখন এটি এই অঞ্চলে প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং তাই তাদের বিশ্বাস সর্বদা দুর্বল ছিল এবং বিশ্বাসের নিশ্চিততার পরিবর্তে অন্ধ অনুকরণের উপর ভিত্তি করে ছিল। ভন্ড নবী বিশ্বাসের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল এবং জাগতিক জিনিসের প্রতি তাদের লোভ তাদের দুর্বল বিশ্বাসকে জয় করেছিল। উপরন্তু, যদিও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, আরব উপজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যারা ফরজ দান করতে অস্বীকার করেছিল, তিনি তাদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসলামের সেই স্তম্ভটিকে প্রত্যাখ্যান করা কুফর এবং তাই যুদ্ধ করার একটি সুস্পষ্ট কারণ। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 314-317 এবং সহীহ বুখারী, 1399-1400 নম্বরে পাওয়া হাদীসগুলিতে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

বাস্তবে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ওয়াজিব দানের ব্যাপারে আপস করলে শেষ সময় পর্যন্ত বিপথগামী ও অজ্ঞ মুসলিমরা তাকে ইসলামের শিক্ষার সাথে প্রকাশ্যে আপস করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করত। ইসলাম তখন তার সারমর্ম হারিয়ে ফেলত এবং শুধুমাত্র একটি খালি খোসা থেকে যেত, যেখানে লোকেরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে কিন্তু এর কোন শিক্ষার উপর অনুশীলন করতে ব্যর্থ হয়। আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সুদূরপ্রসারী উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ ছিলেন এবং অন্যরা ব্যর্থ হলে এটি বুঝতে পেরেছিলেন। ইসলামের সারাংশের এই সুরক্ষার জন্যই তিনি তাদের সাথে লড়াই করেছিলেন

যারা বাধ্যতামূলক দান করতে অস্বীকার করেছিল। এই উপলব্ধিটি প্রতিফলিত হয় তিনি তাদের কাছে যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়েছিলেন যারা বাধ্যতামূলক দাতব্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তাদের সাথে লড়াই না করার জন্য তাকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেন, "ওহীর অবতরণ বন্ধ হয়ে গেছে এবং ধর্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি কি এখন জীবিত থাকাকালীন এটিকে হ্রাস করতে দেব (পরিবর্তন বা পরিবর্তিত হতে)? ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৩৬১-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 85 এর সাথে সংযুক্ত:

"...তাহলে কি আপনি কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করেন এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করেন? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী আছে? এবং কেয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে ফেরত পাঠানো হবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।"

এই অবিচল মনোভাব ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মুসলমানদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। মুসলমানদের পার্থিব বিষয়ের জন্য কোনো দায়িত্বের সাথে আপস করা উচিত নয় কারণ এই জিনিসগুলি শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, যদি তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয় তবে পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের জন্য যে শাস্তি অপেক্ষা করছে তা ছেড়ে দিন।

একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তারা যদি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তবে তারা মহান আল্লাহর বিচার ও শাস্তি

থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। শুধু নিজের অবাধ্যতা এবং বিচার দিবসের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করলে তা দূর হবে না। যখন কেউ ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করে এবং মুসলিম হয় তখন এর মধ্যে ইসলামের সাথে থাকা দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন ব্যক্তি যে সংজ্ঞা দ্বারা একটি কাজ গ্রহণ করে তার সাথে আসা কর্তব্যগুলি গ্রহণ করে। যদি তারা কেবল তাদের দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করে তবে নিঃসন্দেহে তাদের বরখাস্ত করা হবে। একইভাবে, যে ব্যক্তি ইসলামকে তাদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করার পরে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করে সে নিজেকে উভয় জগতে শাস্তি ও অসুবিধা দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে।

বাস্তবে, বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলি অনেক নয় এবং এত সময় বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি কাউকে তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি বোঝা দেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

সুতরাং একজন ব্যক্তির উপর ফরয যে কোন দায়িত্ব তাদের দ্বারা পালন করা যেতে পারে। এটি শুধুমাত্র তাদের চরম অলসতা এবং দুর্বল সিদ্ধান্ত যা তাদের এটি করতে বাধা দেয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে, তারা একটি মহান দিনে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার আগে।

মদিনা রক্ষা

রোমান ও পারস্যের পরাশক্তির হুমকি মোকাবেলা করা একটি বাহ্যিক হুমকি ছিল যা আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল। অন্যান্য বড় অভ্যন্তরীণ হুমকির মধ্যে ছিল অনেক আরব উপজাতি যারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর ধর্মত্যাগ করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যা নবীকে অনুসরণ করতে শুরু করে এবং অন্যরা বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করতে অস্বীকার করে। এই আরব উপজাতিরা তখনই ইসলাম গ্রহণ করেছিল যখন এটি এই অঞ্চলে প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং তাই তাদের বিশ্বাস সর্বদা দুর্বল ছিল এবং বিশ্বাসের নিশ্চিততার পরিবর্তে অন্ধ অনুকরণের উপর ভিত্তি করে ছিল। ভন্ড নবী বিশ্বাসের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল এবং জাগতিক জিনিসের প্রতি তাদের লোভ তাদের দুর্বল বিশ্বাসকে জয় করেছিল। উপরন্তু, যদিও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, আরব উপজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যারা ফরজ দান করতে অস্বীকার করেছিল, তিনি তাদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসলামের সেই স্তম্ভটিকে প্রত্যাখ্যান করা কুফর এবং তাই যুদ্ধ করার একটি সুস্পষ্ট কারণ। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 314-317 এবং সহীহ বুখারী, 1399-1400 নম্বরে পাওয়া হাদীসগুলিতে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যখন ধর্মত্যাগী আরব উপজাতিরা তাদের প্রতিনিধিদেরকে মদিনায় প্রেরণ করে আবু বক্করের সাথে শান্তি চুক্তি করার জন্য, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তখন তিনি ইসলামের প্রতিটি কর্তব্যের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের চেয়ে কম কিছুতেই একমত হতে অস্বীকার করেছিলেন, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। এই প্রতিনিধিরা পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করতে রাজি না হয়েই মদিনা ত্যাগ করেন। হযরত আবু বক্কর (রা.) অনুধাবন করেন যে, তারা মদিনা আক্রমণ করে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অবসান ঘটিয়ে মুসলিমদের একই সময়ে একাধিক

সমস্যা মোকাবেলার সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। হযরত আবু বক্কর (রাঃ) মদিনাকে রক্ষা করার জন্য অনেক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যার মধ্যে রয়েছে: বাসিন্দাদেরকে মসজিদে রাত কাটাতে আদেশ দেওয়া যাতে তারা একটি আশ্চর্য আক্রমণ থেকে সতর্ক থাকে। তিনি মদিনার প্রবেশপথে পাহারা বসিয়েছিলেন। তিনি প্রতিবেশী উপজাতিদের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেছিলেন যারা ধর্মত্যাগ করেনি এবং পরিবর্তে বিশ্বাসে দৃঢ় ছিল। এই গোত্রগুলো মদিনা রক্ষার জন্য তাদের সৈন্য পাঠায়।

কিছু আরব উপজাতি যারা ধর্মত্যাগ করেছিল তারা মদিনা আক্রমণ করেছিল কারণ তারা খুব বেশি প্রতিরোধের আশা করেনি, কারণ অধিকাংশ মুসলিম সৈন্য উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী নিয়ে চলে গিয়েছিল, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু শক্তিবৃদ্ধি মদিনায় আসার সাথে সাথে আবু বক্কর (রাঃ) এবং তাঁর লোকদের দ্বারা আক্রমণ সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৩৬৪-৩৬৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছিলেন তা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উভয় দিকের উপর আমল করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। প্রথম দিকটি হল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ তায়ালা যে উপায়গুলি সরবরাহ করেছেন তা ব্যবহার করা। অন্য দিকটি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যে পরিস্থিতির ফলাফল, যা মহান আল্লাহ একাই সিদ্ধান্ত নেন, জড়িত সকলের জন্য সর্বোত্তম হবে।

জামে আত তিরমিযী, 2344 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যদি সত্যিই মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে, তবে তিনি পাখিদের যেমন

রিজিক দেন, তেমনি তিনি তাদের রিযিক দেবেন। সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা ছেড়ে সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা হল এমন একটি বিষয় যা অন্তরে অনুভূত হয় কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

আস্থার যে দিকটি অভ্যন্তরীণ তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে একমাত্র মহান আল্লাহই একজনকে উপকারী জিনিস প্রদান করতে পারেন এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারেন। একজন মুসলিম বোঝে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে দিতে, আটকাতে, ক্ষতি করতে বা উপকার করতে পারে না।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর উপর সত্যিকারের আস্থা রাখার অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহ যে উপায়গুলো দিয়েছেন, যেমন ওষুধ ব্যবহার করা ছেড়ে দেওয়া উচিত। আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাখিরা তাদের বাসা ছেড়ে সক্রিয়ভাবে রিযিকের সন্ধান করে। যখন কেউ মহান আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও উপায় ব্যবহার করে, তখন ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তারা নিঃসন্দেহে তাঁর আনুগত্য করে। এটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর

ভরসা করার বাহ্যিক উপাদান। বহু আয়াত ও হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 71:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সাবধান হও..."

প্রকৃতপক্ষে, বাহ্যিক কর্মকাণ্ড মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করাই হলো মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা। অভ্যন্তরীণ আস্থার অধিকারী হলেও বাহ্যিক ঐতিহ্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

কর্ম এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায় ব্যবহার করা, তাঁর উপর ভরসা করার একটি দিক। এই ক্ষেত্রে, ক্রিয়াগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি হল আনুগত্যের সেসব কাজ যা মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদেরকে আদেশ করেন যাতে তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে এবং জান্নাত লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এই বিশ্বাস দাবী করার সময় এগুলো পরিত্যাগ করা নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তা এবং তাই দোষারোপযোগ্য।

দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম হল সে সকল মাধ্যম যা মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য নিরাপদে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া, তৃষ্ণা পেলে পান করা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম কাপড় পরিধান করা। যে ব্যক্তি এগুলি পরিত্যাগ করে এবং নিজের ক্ষতি করে সে দোষী। যাইহোক, কিছু লোক আছে যাদেরকে মহান আল্লাহ বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন, যাতে তারা নিজেদের ক্ষতি না করে এই উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনব্যাপী রোজা রাখতেন কিন্তু অন্যদেরকে সেই কাজ করতে নিষেধ করতেন, যেমন মহান আল্লাহ তাঁর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি প্রদান করেন। এটি সহীহ বুখারি, 1922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) চতুর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আলী বিন আবু তালিবের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট না হন। অতিরিক্ত ঠান্ডা বা তাপ অনুভব করা। সুনানে ইবনে মাজাহ, 117 নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, যদি একজন ব্যক্তি এই উপায়গুলি থেকে দূরে সরে যায় কিন্তু আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি প্রদান করে তবে তা গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় এটা দোষারোপযোগ্য।

মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রকারের কর্ম হল সেসব কাজ যা একটি প্রথাগত অভ্যাস হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ কখনও কখনও নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য ভেঙে দেন। এর একটি উদাহরণ হল সেই সব মানুষ যারা ওষুধের প্রয়োজন ছাড়াই রোগ নিরাময় করে। এটি বিশেষত দরিদ্র দেশগুলিতে বেশ সাধারণ যেখানে ওষুধ পাওয়া কঠিন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 2144 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের সাথে যুক্ত, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না তারা তাদের জন্য বরাদ্দ করা প্রতিটি আউন্স ব্যবহার করে, যা সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস অনুসারে ছিল। পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, মহান আল্লাহ আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই হাদিসটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করেন তিনি সক্রিয়ভাবে এই জেনেও ব্যবস্থা নাও পেতে পারেন যে এতদিন আগে তাদের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছিল তা তাদের মিস করতে পারে না। সুতরাং এই ব্যক্তির জন্য রিযিক প্রাপ্তির প্রথাগত উপায় যেমন চাকরির মাধ্যমে তা অর্জন করা মহান আল্লাহ তায়ালা ভেঙে দিয়েছেন। এটি একটি উচ্চ এবং বিরল পদ। অভিযোগ না করে বা আতঙ্কিত না হয়ে বা মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা না করে যে এমন আচরণ করতে পারে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি যদি এই পথ বেছে নেয় তবে দোষমুক্ত। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 1692 নম্বরে পাওয়া একটি

হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তির পক্ষে তাদের নির্ভরশীলদের ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হওয়া একটি পাপ। তারা এই উচ্চ পদে থাকতে পারে।

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত আস্থা রাখলে নিয়তিতে সন্তুষ্ট থাকে। অর্থ, মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা কিছু বেছে নেন তারা কোনো অভিযোগ ছাড়াই এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই গ্রহণ করেন কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহই তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপসংহারে বলা যায়, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা সর্বোত্তম, বৈধ উপায় ব্যবহার করে একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয়েছে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন এবং অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধুমাত্র আল্লাহ, উচ্চতর, সিদ্ধান্ত নেবে ঘটবে, যেটি নিঃসন্দেহে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম পছন্দ যে তারা এটি পালন করে বা না করে।

ভদ্রতা

এমনকি ধর্মত্যাগী যুদ্ধের সময়ও, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সেনাপতিদের এবং সাধারণ সৈন্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন যারা ধর্মত্যাগ থেকে অনুতপ্ত হয়েছে তাদের প্রতি নম্রতা দেখানোর জন্য, এর ফলে পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং তাদের পূর্ণ অধিকার প্রসারিত করতে। মুসলিম ঋণী। তিনি তার সেনাপতিদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের সৈন্যদের সাথে ভদ্র আচরণ করার আহ্বান জানান। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৩৯৩-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এমন বিপজ্জনক এবং কঠিন সময়েও আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সমস্ত বিষয়ে নম্রতা এবং দৃঢ়তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে উত্সাহিত করেছিলেন কারণ এটি ভাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদের বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র

ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলিমকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তারা কখনোই নবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারবে না এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হবে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ) কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা, কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

অবাধ্যতা ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়

এই আরব উপজাতিদের মধ্যে কিছু যারা বাধ্যতামূলক দাতব্য দিতে অস্বীকার করেছিল তারা মদিনা আক্রমণ করেছিল কারণ তারা খুব বেশি প্রতিরোধের আশা করেনি কারণ বেশিরভাগ মুসলিম সৈন্যরা উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী নিয়ে চলে গিয়েছিল, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু শক্তিবৃদ্ধি মদিনায় আসার সাথে সাথে আবু বক্কর (রাঃ) এবং তাঁর লোকদের দ্বারা আক্রমণ সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছিল। আবু বক্করের নেতৃত্বে আরেকটি যুদ্ধে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারা কিছু আরব গোত্রকে ব্যাপকভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয় যারা ধর্মত্যাগ করেছিল। ফলস্বরূপ, এই উপজাতিরা তাদের নিজেদের অনেক উপজাতিকে হত্যা করেছিল যারা ইসলামের উপর অটল ছিল এবং ধর্মত্যাগ করেনি। কিন্তু এটি শুধুমাত্র মুসলমানদের সংকল্পকে শক্তিশালী করেছিল, যারা মুরতাদদের পরাজিত করার জন্য আরও কঠিন লড়াই করেছিল। অবশেষে, এই উপজাতিদের অনেকেই সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং অনুতপ্ত হয়েছিল। তারা তাদের প্রতিনিধিদের তাদের বাধ্যতামূলক দাতব্য সহ মদিনায় পাঠান। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৩৬৬-৩৬৯-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ অথচ গভীর পাঠ বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা কখনো ইহকাল বা পরকালে পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সফল হতে পারবে না। কালের ঊষালগ্ন থেকে এই যুগ পর্যন্ত এবং শেষ সময় পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারেনি এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে কখনোই হবে না। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অতএব, যখন একজন মুসলমান এমন একটি পরিস্থিতিতে থাকে যা থেকে তারা একটি ইতিবাচক এবং সফল ফলাফল অর্জন করতে চায় তখন তাদের কখনই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা বেছে নেওয়া উচিত নয়, তা যতই প্রলুব্ধ বা সহজ মনে হোক না কেন। এমনকি যদি একজনকে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়রা তা করার পরামর্শ দেয় কারণ সৃষ্টিকর্তার

অবাধ্যতার অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কখনই মহান আল্লাহ ও তাঁর শাস্তি থেকে তাদের এই দুনিয়া বা পরকালে রক্ষা করতে পারবে না। একইভাবে, মহান আল্লাহ, যারা তাঁর আনুগত্য করে তাদের সাফল্য দান করেন তিনি তাঁর অবাধ্যদের থেকে একটি সফল পরিণতি সরিয়ে দেন যদিও এই অপসারণটি সাক্ষী হতে সময় লাগে। একজন মুসলিমকে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি শীঘ্রই বা পরে ঘটবে। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছে যে, এই শাস্তি বিলম্বিত হলেও একটি মন্দ পরিকল্পনা বা কর্ম কেবলমাত্র কর্মকারীকে বেষ্টন করে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ব্যতীত ঘিরে রাখে না..."

অতএব, পরিস্থিতি এবং পছন্দ যতই কঠিন হোক না কেন মুসলমানদের সর্বদা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেওয়া উচিত কারণ এই সাফল্য অবিলম্বে স্পষ্ট না হলেও উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।

অন্ধ আনুগত্য

ধর্মত্যাগী যুদ্ধের সময়, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরেকটি বড় হুমকির সম্মুখীন হন, তা হল ভন্ড নবী এবং তাদের অনুসারীরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যদিও এই ভন্ড নবীদের অনুসারীরা তাদের নেতাদের মিথ্যা সম্পর্কে অবগত ছিল তবুও তারা তাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করেছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৩৯৮-৩৯৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ধরনের অন্ধ আনুগত্য ঘটে যখন লোকেরা জাগতিক জিনিসের উপর ভিত্তি করে বন্ধন তৈরি করে, যেমন বংশ এবং বন্ধুত্ব। মুসলমানদের অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে কারণ এটি উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে।

সময়ের সাথে সাথে লোকেরা প্রায়শই বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে তাদের একসময়ের শক্তিশালী সংযোগ হারায়। এর অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি। এটি সাধারণত জানা যায় যে যখন একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন ভবনটি সময়ের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এমনকি ধসে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষকে সংযুক্ত করার বন্ধনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যকার বন্ধনগুলি অবশেষে দুর্বল বা এমনকি ভেঙ্গে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন। যদিও, বেশিরভাগ মুসলিমরা আজকে উপজাতীয়তা, ভ্রাতৃত্বের জন্য এবং অন্যান্য পরিবারকে দেখানোর জন্য মানুষকে একত্রিত করে। যদিও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তাদের

সংযোগকারী বন্ধনের ভিত্তি ছিল যথার্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন শক্তিশালী থেকে শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল । যদিও আজকাল অনেক মুসলমান রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সময়ের সাথে সাথে তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে আলাদা হয়ে গেছে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যদি তাদের বন্ধন টিকে থাকার এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জনের ইচ্ছা থাকে তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং একসাথে এমনভাবে কাজ করে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

বিপজ্জনক লালসা

ধর্মত্যাগী যুদ্ধের সময়, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরেকটি বড় হুমকির সম্মুখীন হন, তা হল ভন্ড নবী এবং তাদের অনুসারীরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যদিও এই ভন্ড নবীদের অনুসারীরা তাদের নেতাদের মিথ্যা সম্পর্কে অবগত ছিল তবুও তারা তাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করেছিল। অন্যরা ধন-সম্পদ ও নেতৃত্ব পাওয়ার লোভে তাদের গ্রহণ করেছিল, যা তারা তাদের অনুসারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যদি তারা তাদের সমর্থন করে। এই লোভ এমনকি কিছু দুর্বল মুসলিমকেও দখল করেছিল যারা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৩৯৮-৩৯৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

এটা দেখায় যে, কোন মুসলমানের ঈমান নিরাপদ থাকে না যদি তারা এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ ও খ্যাতির জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, ঠিক যেমনটি খুব কমই কোনো ভেড়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লালসার কুফলের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষার প্রথম প্রকারটি হল যখন একজন ব্যক্তি সম্পদের প্রতি চরম ভালবাসা রাখে এবং তা বৈধ উপায়ে অর্জনের জন্য ক্লান্তি ছাড়াই চেষ্টা করে। এমন আচরণ করা জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ নয় কারণ একজন মুসলিমকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের বিধান তাদের জন্য নিশ্চিত এবং এই বরাদ্দ কখনই পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে প্রমাণিত। এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তাদের দায়িত্বে অবহেলা করবে কারণ তারা সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত। যে শরীর সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত সে কখনই পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তি সম্পদ অর্জনের জন্য এত বেশি পরিশ্রম করবে যে তারা এটি উপভোগ করার সুযোগও পাবে না। পরিবর্তে, তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে এবং এটিকে অন্য লোকেদের উপভোগ করার জন্য রেখে যাবে যদিও তারা এর জন্য দায়ী হবে। এই ব্যক্তি বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করতে পারে কিন্তু তারা এখনও মানসিক শান্তি পাবে না কারণ তারা যতই অর্জন করুক না কেন তারা কেবল আরও বেশি কামনা করবে। এই ব্যক্তি অভাবী এবং তাই, প্রকৃত দরিদ্র, এমনকি যদি তাদের অনেক সম্পদ থাকে।

একমাত্র লোভ যা উপকারী তা হল সত্যিকারের সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য আকাঙ্ক্ষা, যথা, সৎকর্মের জন্য নিজের প্রত্যাবর্তনের দিনের জন্য প্রস্তুত করা।

দ্বিতীয় প্রকারের ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা প্রথম প্রকারের মতই কিন্তু তা ছাড়াও এই ধরনের ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে এবং মানুষের অধিকার যেমন ফরজ সদকা পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদীসে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিসে, 6576 নম্বর, তিনি সতর্ক করেছিলেন যে এই মনোভাব অতীতের জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছে কারণ তারা হারাম জিনিসগুলিকে হালাল করেছে, অন্যের অধিকার হরণ করেছে এবং অতিরিক্ত সম্পদের জন্য অন্যকে হত্যা করেছে। এই ব্যক্তি যে সম্পদের অধিকারী নয়

তার জন্য চেষ্টা করে যা অসংখ্য বড় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যখন কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করে তখন তারা তীব্র লোভী হয়ে ওঠে। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন, লোভী ব্যক্তি আল্লাহ থেকে অনেক দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসাইতে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 3114, সতর্ক করে যে চরম লোভ এবং সত্যিকারের বিশ্বাস কখনই একজন সত্যিকারের মুসলমানের হৃদয়ে একত্রিত হবে না।

কোনো মুসলমান যদি এ ধরনের লালসা অবলম্বন করে তাহলে একজন অশিক্ষিত মুসলমানের জন্যও এর চরম বিপদ স্পষ্ট। এটি তাদের ঈমানকে ধ্বংস করবে যতক্ষণ না সামান্য ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট না থাকে ঠিক যেমনটি আলোচিত প্রধান হাদিসটি সতর্ক করে যে একজনের বিশ্বাসের এই ধ্বংসটি ভেড়ার পালকে ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের চেয়েও মারাত্মক। এই মুসলিম তাদের মৃত্যুর মুহুর্তে তাদের সামান্য বিশ্বাস হারানোর ঝুঁকি নেয়, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি। খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহিহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা কামনা করে, তাকে নিজেরাই এটি মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে

নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এ দুটি জিনিস যা তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমানকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

নম্রতা

ধর্মত্যাগী যুদ্ধের সময়, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরেকটি বড় হুমকির সম্মুখীন হন, তা হল ভন্ড নবী এবং তাদের অনুসারীরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যদিও এই ভন্ড নবীদের অনুসারীরা তাদের নেতাদের মিথ্যা সম্পর্কে অবগত ছিল তবুও তারা তাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করেছিল। অন্যরা ধন-সম্পদ ও নেতৃত্ব পাওয়ার লোভে তাদের গ্রহণ করেছিল, যা তারা তাদের অনুসারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যদি তারা তাদের সমর্থন করে। এই লোভ এমনকি কিছু দুর্বল মুসলিমকেও দখল করেছিল যারা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। একজন ভন্ড নবীর দুই সেনাপতি, আসওয়াদ আল আনসি, যিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ দিনে নিহত হয়েছিলেন, তারা ইসলামী জাতির বিরুদ্ধে বাহিনীকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের দুজনকে বন্দী করা হয় এবং যুদ্ধবন্দী হিসেবে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠানো হয়। তারা উভয়েই তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ইসলামে পুনরায় প্রবেশের ঘোষণা দেয়। ফলে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের মুক্ত করে দেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 410-411-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নম্রতা এবং অন্যের দোষ উপেক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী গ্রহণ করা।

সমস্ত মুসলমান আশা করে যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপকে দূরে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একই আচরণ করে না। অর্থ, তারা

প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের উপর আঁকড়ে ধরে থাকে যা ভবিষ্যতে কোনভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীত ভুল উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান

আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

জেদ এড়িয়ে চলা

হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদরামুত ও কিন্দাহর ধর্মত্যাগীদের মোকাবেলা করার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। একটি সাধারণ বিষয় নিয়ে তাদের মতবিরোধ ঘটেছে যা এড়ানো উচিত ছিল। হাদরামুতের গভর্নর একবার দাতব্য বিতরণ করছিলেন এবং ভুলবশত ভুল উটটি একজন ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন। এই ব্যক্তির আপত্তির উত্তর দেওয়া হয়নি এবং যখন তিনি তার গোত্রের একজন বিশিষ্ট সদস্যের সাহায্য চেয়েছিলেন, এর ফলে সর্বাত্মক লড়াই হয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 412-413-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উভয় পক্ষের হঠকারিতা এড়ানো গেলে এই সহজ বিষয়টির সমাধান করা যেত।

কেউ কেউ পার্থিব বিষয়ে হঠকারিতা অবলম্বন করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে না। পরিবর্তে, তারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের মহান শক্তি এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ। বিশ্বাসের বিষয়ে অটল থাকা একটি প্রশংসনীয় মনোভাব কিন্তু অধিকাংশ পার্থিব বিষয়ে একে বলা হয় একগুঁয়েমি, যা দোষারোপযোগ্য।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে যদি তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তবে এটি দুর্বলতা প্রদর্শন করে বা এটি দেখায় যে তারা তাদের দোষ স্বীকার করছে এবং এই কারণে তারা জেদীভাবে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাপ্তবয়স্করা অপরিণত শিশুদের মতো আচরণ করে এই বিশ্বাস করে যে তারা

যদি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তবে এর অর্থ তারা হেরেছে এবং অন্যরা যারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে তারা জিতেছে। এটা নিছক শিশুসুলভ।

প্রকৃতপক্ষে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকবে তবে পার্থিব বিষয়ে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে, যতক্ষণ না এটি পাপ নয়, তাদের জীবনকে সহজ করার জন্য। তাই নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য পরিবর্তন করা দুর্বলতার লক্ষণ নয় এটি আসলে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

অনেক ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেন এবং তাদের জীবনে অন্যরা তাদের পরিবর্তন করতে চান, যেমন তাদের আত্মীয়রা। কিন্তু প্রায়শই যা ঘটে তা হ'ল একগুঁয়েমির কারণে সবাই একই অবস্থায় থাকে যা কেবল নিয়মিত মতবিরোধ এবং তর্কের দিকে নিয়ে যায়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝেন যে যদি তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের উচিত তার চেয়ে ভাল পরিবর্তন না করে। এই পরিবর্তন তাদের জীবনের মান এবং অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে যা মানুষের সাথে বৃত্তাকার তর্কে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। এই ইতিবাচক মনোভাব শেষ পর্যন্ত অন্যদের তাদের সম্মান করতে বাধ্য করবে কারণ ভালোর জন্য একজনের চরিত্র পরিবর্তন করতে প্রকৃত শক্তি লাগে।

যারা একগুঁয়ে থাকে তারা সবসময় বিরক্ত হওয়ার মতো কিছু খুঁজে পায় যা তাদের জীবন থেকে শান্তি সরিয়ে দেবে। এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরও অসুবিধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু যারা মানিয়ে নেয় এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে তারা সবসময় শান্তির এক স্টেশন থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। যদি কেউ এই শান্তি অর্জন করে তবে অন্যরা বিশ্বাস

করে যে তারা কেবল ভুল ছিল বলে তারা পরিবর্তন করেছে তা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ?

উপসংহারে বলা যায়, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর অবিচল থাকা প্রশংসনীয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো পাপ সংঘটিত হয় না একজন ব্যক্তির উচিত মানিয়ে নিতে এবং তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে শেখা যাতে তারা এই পৃথিবীতে কিছুটা শান্তি পায়।

মন্দের প্রতি আপত্তি

ধর্মত্যাগী যুদ্ধের সময়, কিছু আরব উপজাতি যারা ধর্মত্যাগ করেছিল তাদের সহযোগী উপজাতিদের পরামর্শ ও প্রচারের মাধ্যমে ইসলামে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার সাথে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য এই লোকেরা তাদের জীবন এবং তাদের পরিবারের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল। এর একটি উদাহরণ ছিল মিরান ইবনে ধী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, যিনি পরিণামের কোনো ভয় ছাড়াই জনসমক্ষে তাঁর জনগণকে সম্বোধন করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর গোত্রকে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 420-421-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ 4340 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করার গুরুত্বের পরামর্শ দিয়েছেন। এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, সব ধরনের আপত্তি করা সকল মুসলমানের জন্য কর্তব্য। তাদের শক্তি এবং উপায় অনুযায়ী মন্দ. এই হাদিসে বর্ণিত সর্বনিম্ন স্তর হল মন্দকে অন্তর দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা।

এটি দেখায় যে অভ্যন্তরীণভাবে খারাপ কাজগুলিকে অনুমোদন করা নিষিদ্ধ জিনিসগুলির মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4345 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন মন্দ সংঘটিত হলে উপস্থিত থাকে এবং তা নিন্দা করে সে সেই ব্যক্তির মতো যে উপস্থিত ছিল না। . কিন্তু যে অনুপস্থিত ছিল এবং মন্দ কাজটি অনুমোদন করেছে সে সেই ব্যক্তির মত যে এটি করার সময় উপস্থিত ছিল।

মন্দের প্রতি আপত্তি করার প্রথম দুটি দিক, যা আলোচনায় প্রধান হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হল একজনের শারীরিক কাজ ও কথাবার্তা। এটি শুধুমাত্র একজন মুসলিমের উপর একটি কর্তব্য যার তা করার শক্তি আছে উদাহরণস্বরূপ, তাদের কাজ বা কথার দ্বারা তাদের ক্ষতি করা হবে না।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, নিজের হাত দিয়ে মন্দকে আপত্তি করা মানে লড়াই করা নয়। এটি অন্যের মন্দ কাজগুলিকে সংশোধন করাকে বোঝায়, যেমন বেআইনিভাবে লঙঘন করা হয়েছে এমন কারো অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। যে ব্যক্তি এখনও এটি করার অবস্থানে রয়েছে, সে তা করা থেকে বিরত থাকে তাকে একটি শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে আবু দাউদ, 4338 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে।

মহানবী (সা.) জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মুসলমানদের উপদেশ দিয়েছেন যে, সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে তারা যেন সৃষ্টিকে ভয় না করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি সৃষ্টির ভয়কে তাদের মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করা থেকে বিরত রাখতে দেয় তাকে সেই ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে নিজেকে ঘৃণা করে এবং বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তায়ালার দ্বারা সমালোচিত হবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4008 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি উল্লেখ্য যে, এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় না যে ক্ষতির ভয়ে চুপ থাকে কারণ এটি একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত, তবে এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে নীরব থাকে কারণ মানুষ তাদের চোখে ধরে রাখে স্ট্যাটাস।

সুনানে আবু দাউদ, 4341 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি যখন অন্যরা তাদের লোভের আনুগত্য করে, তাদের ভুল মতামত ও আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে এবং যখন তারা পরকালের চেয়ে বস্তুগত দুনিয়াকে পছন্দ করে তখন তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে খারাপ জিনিসের বিরুদ্ধে আপত্তি করা ছেড়ে দিতে পারে। এই সময়টা এসে গেছে বলে শেষ করতে পণ্ডিত লাগে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 105।

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদেরই দায়িত্ব তোমাদের উপর। যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তুমি হেদায়েত পাবে..."

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, একজন মুসলিমের উচিত তাদের নির্ভরশীলদের ব্যাপারে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা কারণ এটি তাদের উপর একটি কর্তব্য সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এবং তারা শারীরিক ও মৌখিকভাবে যাদের মনে করে। থেকে নিরাপদ, কারণ এটি উচ্চতর মনোভাব।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্ট যে মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ, এটা মুসলমানদেরকে অন্যদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার অনুমতি দেয় না যাতে আপত্তি করার মতো খারাপ জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তি এবং এর সাথে সম্পর্কিত কিছু নিষিদ্ধ। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"ওহে যারা ঈমান এনেছ... গুপ্তচরবৃত্তি করো না..."

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মন্দের আপত্তি করতে হবে, তাদের ইচ্ছার উপর নয়। একজন মুসলিম বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছে, যখন তারা নয়। এটা প্রমাণিত হয় যখন তারা মন্দের বিরুদ্ধে এমনভাবে আপত্তি করে যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে, এই নেতিবাচক মনোভাবের কারণে যা ভাল কাজ বলে মনে করা হয় তা পাপ হয়ে যেতে পারে।

একজন মুসলমানকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মৃদু ও ন্যায্যভাবে মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিপরীতটি কেবলমাত্র মানুষকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে দূরে ঠেলে দেবে এবং তাদের ক্রোধের ফলে আরও পাপ হতে পারে।

বিশ্বাসের উপর অধিষ্ঠিত

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পূর্বে ভন্ড নবী আসওয়াদ আল আনসি তার বাণী প্রচার করতে শুরু করেন এবং মানুষকে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করেন। আবু মুসলিম আল খাওলানী, আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, ইসলামের উপর অটল ছিলেন যার ফলে আসওয়াদ তাকে একটি বড় আগুনে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়। লোকদের বিস্ময়ের জন্য আগুন আবু মুসলিমের ক্ষতি করেনি, আল্লাহ তার উপর রহম করুন। আসওয়াদকে তখন তাকে নির্বাসিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল এই অলৌকিক ঘটনাটি লোকেদের তাকে প্রত্যাখ্যান করার একটি উপায় হয়ে উঠার আগেই। আবু মুসলিম, আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, অবশেষে আবু বকর (রা) এর খিলাফতের সময় মদিনায় পৌঁছেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে প্রবেশের পর উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। যেহেতু পরবর্তীটি উপলব্ধিশীল ছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনিই কি সেই ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ আগুন থেকে রক্ষা করেছেন। আবু মুসলিম, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ফলস্বরূপ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গর্বিতভাবে তাঁকে নিজের এবং আবু বকরের মাঝখানে বসালেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে এমন একজন ব্যক্তি দেখানোর জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছেন যাকে তিনি আগুন থেকে রক্ষা করেছেন, যেমন তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে রক্ষা করেছিলেন। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 28-29:

"তারা বলল, "তাকে [হযরত ইব্রাহিম (আঃ)] পুড়িয়ে দাও এবং তোমার উপাস্যদের সমর্থন কর - যদি তুমি কাজ করতে চাও।" আমরা [আল্লাহ্] বললাম, "হে অগ্নি, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।"

ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 422-423-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি চরম সমস্যার সময়ে নিজের বিশ্বাসকে ধরে রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমের ৭৪০০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ব্যাপক অশান্তি ও বিদ্রোহের সময় মহান আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখে সে সেই ব্যক্তির মতো যে পবিত্রে হিজরত করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সা.

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় হিজরত করার সওয়াব ছিল একটি মহান কাজ। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিম, 321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একজনের পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহকে মুছে ফেলে।

মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার অর্থ হল মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়তের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া।

স্পষ্টতই এ হাদীসে উল্লেখিত সময় এসে গেছে। মুসলিম জাতির জন্য জাগতিক কামনা-বাসনা উন্মুক্ত হওয়ায় ইসলামের শিক্ষা থেকে বিপথগামী হওয়া খুবই

সহজ হয়ে গেছে। অতএব, মুসলমানদের উচিত তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া এবং বিতর্কিত বিষয় এবং লোকেদের এড়িয়ে চলা এবং এই হাদীসে বর্ণিত সওয়াব পেতে চাইলে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা উচিত।

দায়িত্ব

তাঁর খিলাফতকালে, আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ক্রমাগত তাঁর গভর্নরদের তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করতেন এবং এই নিরীক্ষা করার জন্য নিয়মিত তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতেন। তিনি তাদের প্রায়শই মনে করিয়ে দিতেন যে নেতা হিসেবে তারা জনগণের সেবক এবং তার মতোই জনগণের স্বার্থে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের সময় ব্যয় করতে হবে। তাদের একটি সহজ এবং রুক্ষ জীবনযাপন করা দরকার যাতে তাদের লোকেরা আরামদায়ক জীবনযাপন করতে পারে। তাদের সামান্য বিশ্রাম নেওয়া দরকার এবং পরিবর্তে জনগণের বিষয়গুলি মোকাবেলা করা দরকার। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 427-428-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তার মনোভাব আজকের নেতাদের আচরণ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত, তিনি তাদের প্রজাদের উপর সম্রাট হিসাবে আচরণ করেন এবং তাদের জনগণের স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে তাদের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজনের কর্মের এই ধরনের জবাবদিহিতা অবশ্যই প্রত্যেকের দ্বারা গ্রহণ করা উচিত, কারণ সমস্ত মানুষ, নেতা হোক বা অনুসারী, বিচারের দিন তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করা হবে।

মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের

চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজের বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে পাপ করে। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসায়িক মাথা সঠিক পথে নিশ্চিত করবে এবং তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্টগুলি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করেছে তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

“সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

আন্তরিকতার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া

ধর্মত্যাগী যুদ্ধের একটি প্রধান কারণ ছিল তাদের গোত্র ও বংশের প্রতি মানুষের অন্ধ আনুগত্য। এই অন্ধ আনুগত্য অনেক মুসলিমকে ধর্মত্যাগে উৎসাহিত করেছিল যদিও তাদের মুসলিম হতে কোন সমস্যা ছিল না। অতএব, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল, নিজের গোত্র, বংশ ও পরিবারের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ধারণা দূর করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষাকে অব্যাহত রাখা। বরং ইসলামের পতাকাতলে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করুন। এটি নিশ্চিত করবে যে মুসলমানরা অন্যের অধিকার পূরণ করবে এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করবে, এমনকি তাদের মধ্যে কোন পার্থিব বন্ধন না থাকলেও। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 428-429-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যদের প্রতি এই আন্তরিকতা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মূল ভিত্তি।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয়

জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

থিংকিং থিংস থ্রু

তাঁর খিলাফতকালে আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ভন্ড নবী তুলাইহা আল আসদী এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, যারা একটি শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। . তুলাইহা তাইয় গোত্রকে তার ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানায় এবং তারা প্রাথমিকভাবে তাদের অনেক সৈন্যকে তার অভিযানে যোগদানের জন্য পাঠিয়েছিল। আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, আদী বিন হাতেম, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, এই গোত্রের কাছে, একটি গোত্রের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তাদের ধর্মত্যাগ না করতে রাজি করানো যায়। তারা অবশেষে তার উপদেশ গ্রহণ করে এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তুলাইহাতে যোগদানের জন্য যে যোদ্ধারা বেরিয়েছিল তাদের ফিরিয়ে আনবে। যখন খালিদ শেষ পর্যন্ত আদির সাথে দেখা করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন পরেরটি তাইয় গোত্রের উপর আক্রমণ বন্ধ রাখতে প্রাক্তনকে রাজি করাতে সক্ষম হয়, যদিও তাদের প্রাথমিক পদক্ষেপের ফলে কিছু সাহাবী মারা যায়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। খালিদ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, প্রতিশোধের জন্য তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে পারতেন কিন্তু পরিবর্তে তিনি তিন দিন অপেক্ষা করতে রাজি হন। এই সময়ের মধ্যে তাইয়ে গোত্রের সৈন্যরা, যারা প্রথমে তুলাইহাতে যোগদানের জন্য বেরিয়েছিল, তারা ফিরে আসে এবং তারা সবাই আদী বিন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর তত্ত্বাবধানে খালিদ ও তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেয়। তাদের ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 430-437-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ইঙ্গিত করে যে খালিদ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তাইয় গোত্রকে আক্রমণ করার ক্ষমতা ছিল, তবুও তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলেন। অতএব, একটি বিপজ্জনক এবং সহিংস পরিস্থিতি পুনর্মিলন এবং শান্তির মধ্যে পরিণত হয়েছিল।

জামে আত তিরমিযী, 2012 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, চিন্তা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, অথচ তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা বোঝার এবং তাদের উপর কাজ করার জন্য মুসলিমরা যারা অনেক সৎ কাজ করে তারা প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে তাদের ধ্বংস করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা ক্রোধের সাথে কিছু খারাপ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে যা তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত হতে পারে। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বেশিরভাগ পাপ এবং অসুবিধা, যেমন তর্ক-বিতর্ক, ঘটতে পারে কারণ লোকেরা জিনিসগুলি চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে কাজ করে। বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হল যখন কেউ কথা বলার বা কাজ করার আগে চিন্তা করে এবং কেবল তখনই আগে আসে যখন তারা জানে যে তাদের কথা বা কাজ পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে ভাল এবং উপকারী।

যদিও, একজন মুসলমানের সৎকাজ সম্পাদনে বিলম্ব করা উচিত নয়, তবুও সেগুলি সম্পাদন করার আগে তাদের চিন্তা করা উচিত। এর কারণ হল একটি সৎ কাজের কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না শুধুমাত্র এই কারণে যে এর শর্ত ও শিষ্টাচার কারোর তাড়াহুড়ার কারণে পরিপূর্ণ হয়নি। এই ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়ে চিন্তা করার পরেই একজনকে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে কেবল তাদের পাপগুলিকে কম করবে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াবে, তবে তারা তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক এবং মতানৈক্যের মতো সমস্যাগুলিকে কমিয়ে দেবে।

বেশি প্রশংসা করা

আবু বক্কর খালিদ বিন ওয়ালিদ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, বিভিন্ন আরব গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন যারা ধর্মত্যাগ করেছিল। খালিদ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তিনি যেখানেই যেতেন বিজয় অর্জন করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যান। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তাঁর বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন কিন্তু প্রথমে তাঁর সাফল্যের কৃতিত্ব মহান আল্লাহকে দিয়ে এবং তাঁকে মহান আল্লাহর ভয়ে উদ্‌বুদ্ধ করে তাঁর জন্য তাঁর প্রশংসার ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন। অহংকার এড়াতে প্রয়োজনীয় উপাদান। চিঠিতে লেখা ছিল, “আল্লাহ আপনাকে সেই কল্যাণে বৃদ্ধি করুন যা তিনি আপনাকে আশীর্বাদ করেছেন। এবং আপনার সমস্ত বিষয়ে মহান আল্লাহকে ভয় কর, কারণ, মহান আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকে ভয় করে এবং যারা সৎকাজ করে...” এটি ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস-এর জীবনীতে আলোচনা করা হয়েছে। সিদ্দীক, পৃষ্ঠা 440।

সহীহ বুখারী, 2662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যের প্রশংসা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

এটি একটি অপছন্দনীয় কাজ কারণ এটি প্রথমত পাপ হতে পারে যদি প্রশংসা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে হয়। বিশেষ করে লোকেদের প্রশংসা করা সত্য হলেও, অজ্ঞরা তাদের গর্বিত হতে পারে। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য কারণ একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রশংসা করা এমনকি প্রশংসিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহকে

মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্যতা পূরণ করেছে, এবং তাই তাঁর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই।

একজন মুসলিমকে অন্যের প্রশংসা করে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ তারা তাদের কাজ এবং ভিতরের লুকানো চরিত্র অন্য যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে ভালো জানে। মহান আল্লাহ তায়ালা অসংখ্যবার মানুষের কাছ থেকে তাদের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রেখেছেন তা নিয়ে চিন্তা করলে তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখা উচিত। উপরন্তু, তাদের মনে রাখা উচিত যে তারা যে প্রশংসিত গুণের অধিকারী, তা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন, তাই সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহর প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হওয়া, তাদের কাছে থাকা আশীর্বাদগুলোকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। বরং তাদের উচিত অন্যদেরকে এই হাদিস সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া এবং অন্যের প্রশংসা না করার জন্য সতর্ক করা।

শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে অন্যের প্রশংসা গ্রহণযোগ্য এবং তাদের প্রশংসা করা উচিত নয়, সত্যের সাথে লেগে থাকা এবং এটি করা উচিত যাতে তাদের আরও ভাল কাজ করতে উত্সাহিত করা যায়। এটি বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন, তাদের স্কুলের কাজের সম্মানে তাদের প্রশংসা করা, ভালো আচরণ করা এবং ইসলামের দায়িত্ব পালন করা।

একটা সিরিয়াস ম্যাটার

ধর্মত্যাগী যুদ্ধের সময়, আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে যদিও তিনি মুরতাদদের মধ্যে যেকোন ব্যক্তির তওবা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কারণ তিনি প্রত্যেক সেনা নেতাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা প্রত্যেক ধর্মত্যাগী বাহিনীকে প্রথমে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে। তাদের প্রতিশ্রুতি দিলেও তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে, তবুও আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে শান্তি চুক্তি করেননি। এর কারণ হল ইসলামে প্রবেশ করা এবং বের হওয়া একটি গুরুতর বিষয় ছিল এবং তিনি যদি ধর্মত্যাগীদের সাথে শান্তি চুক্তি করতেন তবে এটি অন্য সকলের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে যেত যে যখনই তারা ইসলামের প্রতি বিরক্ত হবে তারা কেবল এটি থেকে সরে যেতে পারে। এটা ইসলামকে একটা রসিকতায় পরিণত করত। উপরন্তু, ধর্মত্যাগ করা একটি গুরুতর অপরাধ ছিল কারণ এটি ইসলামিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের একটি স্পষ্ট কাজ। বিশ্বাসঘাতকতা, এমনকি এই দিন এবং যুগেও, মৃত্যুদন্ডযোগ্য। তাই আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, তিনি মুরতাদদের তওবা কবুল করলেও মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। এই কৌশলটি অন্যান্য আরব উপজাতিদের জন্যও একটি প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করেছিল যারা ধর্মত্যাগের কথা ভাবছিল। এই প্রতিবন্ধকতা উভয় পক্ষের অনেক মানুষের মৃত্যু রোধ করেছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 440-441-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহুর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রিত হতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ।

তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

আপস ছাড়া নমনীয়তা

তাঁর খিলাফতকালে আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ভন্ড নবী তুলাইহা আল আসদী এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, যারা একটি শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। . তুলাইহা তাইয় গোত্রকে তার ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানায় এবং তারা প্রাথমিকভাবে তাদের অনেক সৈন্যকে তার অভিযানে যোগদানের জন্য পাঠিয়েছিল। আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, আদী বিন হাতেম, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, এই গোত্রের কাছে, একটি গোত্রের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তাদের ধর্মত্যাগ না করতে রাজি করানো যায়। তারা অবশেষে তার উপদেশ গ্রহণ করে এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তুলাইহাতে যোগদানের জন্য যে যোদ্ধারা বেরিয়েছিল তাদের ফিরিয়ে আনবে। যখন খালিদ শেষ পর্যন্ত আদির সাথে দেখা করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন পরেরটি তাইয় গোত্রের উপর আক্রমণ বন্ধ রাখতে প্রাক্তনকে রাজি করাতে সক্ষম হয়, যদিও তাদের প্রাথমিক পদক্ষেপের ফলে কিছু সাহাবী মারা যায়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। খালিদ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, প্রতিশোধের জন্য তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে পারতেন কিন্তু পরিবর্তে তিনি তিন দিন অপেক্ষা করতে রাজি হন। এই সময়ের মধ্যে তাইয়ে গোত্রের সৈন্যরা, যারা প্রথমে তুলাইহাতে যোগদানের জন্য বেরিয়েছিল, তারা ফিরে আসে এবং তারা সবাই আদী বিন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর তত্ত্বাবধানে খালিদ ও তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেয়। তাদের

তখন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধর্মত্যাগকারী দুটি আরব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল: বনু আসাদ এবং বনু কাইস। তাইয় গোত্রের বনু আসাদের সাথে শান্তির একটি পুরানো চুক্তি ছিল এবং তাই তারা অবিলম্বে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়নি এবং তাই খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করেছিল, যদি তারা তার পরিবর্তে বনু কায়েসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে পারে। তিনি তাদের অনুরোধ মেনে নিয়েছিলেন, যদিও আদি, আল্লাহ

তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর লোকেদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কারণ তিনি তাদের দাবি করেছিলেন যে তারা যেই হোক না কেন ইসলামকে সকল শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 443-444- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খালিদ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, সঠিক আহ্বান জানিয়েছিলেন কারণ তিনি তাইয় উপজাতিকে এমন একটি আপোষমূলক অবস্থানে রাখতে চান না যেখানে তারা আবার ধর্মত্যাগ করতে পারে। তারা স্পষ্টতই একটি চঞ্চল লোক ছিল, তাই এটি ঘটার সম্ভাবনা ছিল বাস্তব এবং খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য বিপর্যয়কর হতে পারে, যদি তারা যুদ্ধের সময় তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

খালিদ, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, ইসলামের শিক্ষার সাথে আপস না করে নমনীয় পদ্ধতিতে কাজ করেছিলেন। এটি গ্রহণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ।

কেউ কেউ পার্থিব বিষয়ে হঠকারিতা অবলম্বন করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে না। পরিবর্তে, তারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের মহান শক্তি এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ। বিশ্বাসের বিষয়ে অটল থাকা একটি প্রশংসনীয় মনোভাব কিন্তু অধিকাংশ পার্থিব বিষয়ে একে বলা হয় একগুঁয়েমি, যা দোষারোপযোগ্য।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে যদি তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তবে এটি দুর্বলতা প্রদর্শন করে বা এটি দেখায় যে তারা তাদের দোষ স্বীকার করছে এবং এই কারণে তারা জেদীভাবে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাপ্তবয়স্করা অপরিণত শিশুদের মতো আচরণ করে এই বিশ্বাস করে যে তারা

যদি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তবে এর অর্থ তারা হেরেছে এবং অন্যরা যারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে তারা জিতেছে। এটা নিছক শিশুসুলভ।

প্রকৃতপক্ষে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকবে তবে পার্থিব বিষয়ে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে, যতক্ষণ না এটি পাপ নয়, তাদের জীবনকে সহজ করার জন্য। তাই নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য পরিবর্তন করা দুর্বলতার লক্ষণ নয় এটি আসলে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

অনেক ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেন এবং তাদের জীবনে অন্যরা তাদের পরিবর্তন করতে চান, যেমন তাদের আত্মীয়রা। কিন্তু প্রায়শই যা ঘটে তা হ'ল একগুঁয়েমির কারণে সবাই একই অবস্থায় থাকে যা কেবল নিয়মিত মতবিরোধ এবং তর্কের দিকে নিয়ে যায়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝেন যে যদি তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের উচিত তার চেয়ে ভাল পরিবর্তন না করে। এই পরিবর্তন তাদের জীবনের মান এবং অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে যা মানুষের সাথে বৃত্তাকার তর্কে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। এই ইতিবাচক মনোভাব শেষ পর্যন্ত অন্যদের তাদের সম্মান করতে বাধ্য করবে কারণ ভালোর জন্য একজনের চরিত্র পরিবর্তন করতে প্রকৃত শক্তি লাগে।

যারা একগুঁয়ে থাকে তারা সবসময় বিরক্ত হওয়ার মতো কিছু খুঁজে পায় যা তাদের জীবন থেকে শান্তি সরিয়ে দেবে। এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরও অসুবিধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু যারা মানিয়ে নেয় এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে তারা সবসময় শান্তির এক স্টেশন থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। যদি কেউ এই শান্তি অর্জন করে তবে অন্যরা বিশ্বাস

করে যে তারা কেবল ভুল ছিল বলে তারা পরিবর্তন করেছে তা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ?

উপসংহারে বলা যায়, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর অবিচল থাকা প্রশংসনীয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো পাপ সংঘটিত হয় না একজন ব্যক্তির উচিত মানিয়ে নিতে এবং তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে শেখা যাতে তারা এই পৃথিবীতে কিছুটা শান্তি পায়।

জাতির শক্তি

আবু বক্কর খালিদ বিন ওয়ালিদকে পাঠালেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ভন্ড নবী তুলাইহা এবং তার অনুসারীদের সাথে লড়াই করার জন্য। যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তুলাইহাকে একটি ছোট কিন্তু আশ্চর্যজনক বার্তা পাঠালেন। চিঠিতে লেখা ছিল: "প্রকৃতপক্ষে, আমি এমন একদল লোকের সাথে আপনার কাছে এসেছি যারা মৃত্যুকে ভালবাসে ঠিক আপনার জীবনকে ভালবাসে।" যুদ্ধ শুরু হলে, অবশেষে তুলাইহার বাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি নিজের জীবনের ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 446-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বার্তাটি স্পষ্টভাবে একটি বড় কারণ নির্দেশ করে যে কেন মুসলমানরা অপরাজেয় ছিল। যেহেতু তারা বিশ্বাসের দৃঢ়তার অধিকারী ছিল, তারা জানত যে হয় তারা যুদ্ধে জয়লাভ করে পুরস্কার ও পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করবে অথবা মহান আল্লাহর রহমতে তারা নিহত হবে এবং জান্নাত লাভ করবে। পরকালের জন্য তাদের দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা তাদের জীবনের মূল্য দিয়েও ইসলামের উপর অটল থাকতে প্ররোচিত করেছিল। দৃঢ় ঈমানের মূলে থাকা এই দৃঢ়তা হারানোর কারণেই ইসলামি জাতির শক্তি বছরের পর বছর ক্ষয়ে গেছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4297 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই এমন একটি দিন আসবে যখন অন্যান্য জাতি মুসলিম জাতিকে আক্রমণ করবে এবং যদিও তারা সংখ্যায় অনেক হবে। বিশ্বের কাছে তুচ্ছ মনে করা। মহান আল্লাহ অন্যান্য জাতির অন্তর থেকে

মুসলমানদের ভয় দূর করবেন। বস্তুজগতের প্রতি মুসলিম জাতির ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি তাদের ঘৃণার কারণে এটি ঘটবে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তখনও সংখ্যায় কম ছিলেন, তারা সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিলেন যেখানে মুসলিমরা আজ সংখ্যায় অনেক বেশি, বিশ্বে তাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব নেই। এর কারণ এই যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন যাপন করেছেন, দুনিয়ার হালাল আনন্দ উপভোগের চেয়ে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানই বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পাপের মূল হল জড় জগতের ভালবাসা। কারণ যে কোন পাপ সংঘটিত হয় তা ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে করা হয়। বস্তুগত জগতকে চারটি দিকে বিভক্ত করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের আত্মীয় এবং বন্ধু। এই জিনিসগুলির অত্যধিক সাধনা যা পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন ভাগ্যের প্রতি ভালবাসা থেকে অবৈধ সম্পদ উপার্জন করা। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, সম্পদ ও কর্তৃত্বের প্রতি ভালোবাসা একজন ব্যক্তির ঈমানের জন্য যতটা ধ্বংসাত্মক, তার চেয়েও বেশি ধ্বংসকারী দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালকে ছেড়ে দিলে। যখনই মানুষ জড় জগতের এই দিকগুলোর আধিক্য অন্বেষণ করে তা সর্বদা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। যখন এটি ঘটে তখন মহান আল্লাহর রহমত দূর হয়ে যায় যা কষ্ট ছাড়া আর কিছুই করে না।

যদিও, কিছু মুসলিম বিশ্বাস করে যে বস্তুজগতের অতিরিক্ত জিনিসের অনুসরণ করা ক্ষতিকারক নয় এটি এমন একটি বিষয় যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে অনেক হাদিসে সতর্ক করেছেন যেমন সহীহ বুখারি, 3158 নম্বরে পাওয়া যায়। তিনি সতর্ক করেছিলেন। যে তিনি মুসলমানদের জন্য দারিদ্রকে ভয় পাননি। তার আশঙ্কা ছিল যে, মুসলমানরা এই জড় জগতের আধিক্যের

পেছনে ছুটবে, যেমন অতিরিক্ত সম্পদ, এবং এর ফলে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এই হাদীসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, এটাই ছিল অতীতের জাতিসমূহের আচরণ।

বস্তুগত জগত যেহেতু সীমিত, এটা স্পষ্ট যে, মানুষ যদি তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চায় তাহলে এর জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। এই প্রতিযোগিতা তাদের এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যা একজন প্রকৃত মুসলমানের চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যেমন অন্যদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা। তারা একে অপরের যত্ন নেওয়া বন্ধ করবে কারণ তারা জড়জগতকে সংগ্রহ এবং মজুদ করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। এবং তারা সহীহ বুখারি, 6011 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে প্রদত্ত উপদেশের বিরোধিতা করবে, যেটি পরামর্শ দেয় যে মুসলমানদের উচিত একটি শরীরের মতো আচরণ করা যখন শরীরের কোনো অংশ অসুস্থ হয় তখন শরীরের বাকি অংশ ব্যথায় অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতা একজন মুসলিমকে অন্যদের জন্য ভালবাসা বন্ধ করতে চালিত করবে যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য, কারণ তারা পার্থিব বিষয়ে তাদের সহমুসলিমদের ছাড়িয়ে যেতে চায়। এই প্রতিযোগিতায় অটল থাকা একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে বস্তুজগতের স্বার্থে ভালবাসবে, ঘৃণা করবে, দান করবে এবং আটকে রাখবে, যা সুনানে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। আবু দাউদ, সংখ্যা 4681। এই প্রতিযোগিতা সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং আজকের অনেক মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য।

মুসলমানরা যদি একবার ইসলামের শক্তি এবং প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই এই জড় জগতের আধিক্য অর্জন এবং সঞ্চয় করার চেষ্টা করার চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার প্রচেষ্টা এবং অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি একটি পৃথক স্তর থেকে ঘটতে হবে যতক্ষণ না এটি সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করে।

একজন খারাপ নেতা

মুরতাদদের মধ্যে এমন লোক ছিল যারা অনুতপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এমনকি তাদের বাধ্যতামূলক দাতব্য সংস্থানগুলি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠানোর উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু তারা তাদের নেতাদের দ্বারা তা করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, বনু ইয়ারবু গোত্র এবং তাদের নেতা যারা তাদের বাধ্যতামূলক দাতব্য পাঠাতে বাধা দিয়েছিল, মালিক ইবনে নুওয়াইরাহ। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৪৫৮-৪৫৯-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি সঠিক রোল মডেল বেছে নেওয়া এবং অনুসরণ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা এমন অনেক লোককে দেখতে পাবে যারা মহান পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এখনও মানবজাতিকে উপকৃত করেছে, তারা অন্তত একটি জিনিসও লক্ষ্য করবে যা তাদের অর্জনকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু কেউ যদি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী পর্যবেক্ষণ করে, তবে তারা সফলতা এবং মানবজাতির উপকারী অগণিত জিনিস ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। যদিও এমন কিছু লোক আছে যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিথ্যা সমালোচনা করে, তবুও তাঁর অত্যন্ত নির্ভুল ও বিশদ জীবনী থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যা নির্ভরযোগ্য মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে যে এই সমালোচনার ভিত্তি। মিথ্যা ছাড়া কিছুই না। এই কারণেই মুসলমানদের অবশ্যই সমস্ত রোল মডেলকে একপাশে রেখে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্রুটিহীন চরিত্র অধ্যয়ন ও গ্রহণ

করতে হবে, কারণ এটিই একজনের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনেই প্রকৃত সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এই পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় কোনো লক্ষ্য নেই। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে এটি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা করে। আর মহান আল্লাহ তায়ালা তার সবটুকুই তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদতলে রেখেছেন। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

এটা সহজ, একজন ব্যক্তি যদি পার্থিব ও ধর্মীয় সাফল্য কামনা করে তবে তার উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কিন্তু যদি তারা তার ব্যতীত অন্য কোন পথ বেছে নেয় তবে তারা যা কিছু কলঙ্কিত সাফল্য অর্জন করে তা শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং এটি একটি মহান দিনে শাস্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আনুগত্য

ধর্মত্যাগী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি বাহরাইনে অবস্থিত ছিল তবে এর সমস্ত লোক ইসলাম ত্যাগ করেনি। জুওয়াতাহের লোকেরা ইসলামের প্রতি অনুগত ছিল এবং ফলস্বরূপ তাদের দূর্গ মুরতাদদের দ্বারা অবরোধ করা হয়েছিল। অবশেষে, তাদের খাদ্য সরবরাহ ফুরিয়ে গেল এবং তারা হয় বাইরে ক্যাম্পে থাকা শত্রু সৈন্যদের কাছ থেকে বা ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল। তারপরও তারা তাদের বিশ্বাসে দোলা দেয়নি এবং ইসলামের উপর অটল থাকে। অবশেষে, মহান আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন যখন আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রেরিত একটি মুসলিম বাহিনী ঘুরে দাঁড়ায় এবং মুরতাদ বাহিনীকে পরাজিত করে জুওয়াথার অধিবাসীদের রক্ষা করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 470-471-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জুওয়াতার লোকেরা পার্থিব সুবিধা লাভের জন্য আপোষ করতে পারত কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড স্পষ্ট করে যে তারা এই কারণে মহান আল্লাহর ইবাদত করে না। বরং, তারা মহান আল্লাহর ইবাদত করত, কারণ এটিই সত্য এবং ফলস্বরূপ তারা ইসলামের উপর অটল ছিল, তারা সহজে হোক বা অসুবিধার সম্মুখীন হোক।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কেন তারা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যখন কেউ মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিস লাভের জন্য তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি সে বিচারে আঘাত পায়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবাধ্যতার দিকে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যখন তারা তাদের গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা প্রায়ই ক্ষুব্ধ হয় যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা বাস্তবে মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের বিরোধিতা করে।

যদিও, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, তবুও যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা এই আয়াতে উল্লেখিত মত হয়ে যেতে পারে। পরকালে নাজাত পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক উত্তম। এই ব্যক্তি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, কারণ তিনিই তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলমান, যদি আন্তরিক, সব পরিস্থিতিতে অটল থাকবে এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় আশীর্বাদ দেওয়া হবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তি যে পার্থিব নিয়ামত লাভ করবে তার চেয়ে বেশি।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা জরুরী যাতে এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। , সব পরিস্থিতিতে।

ইয়ামামার যুদ্ধ

অনন্য উদ্ঘাটন

যুক্তিযুক্তভাবে সবচেয়ে বিপজ্জনক মিথ্যা নবী ছিলেন মুসায়লিমা, মিথ্যাবাদী। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় তার মন্দ পথের সূচনা হয়েছিল।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে একটি প্রতিনিধি দল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করেন। তাদের মধ্যে মুসাইলিমা ছিলেন মিথ্যাবাদী যিনি মদিনায় আসার পর বলেছিলেন যে তিনি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনুসরণ করবেন, যদি তিনি তাঁর পরে ইসলামী জাতির নেতা নিযুক্ত হন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে সতর্ক করা হয়েছিল যে, মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা অবশেষে নবুওয়াত দাবি করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শাস্তি না দিয়ে কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 66-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসাইলিমা, মিথ্যাবাদী, পবিত্র কুরআনের সাথে মিলে যায় এমন আয়াত রচনা করার চেষ্টা করেছিল যার ফলে তিনিও ঐশ্বরিক ওহী পেয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করতে অন্যদের বোকা বানানোর চেষ্টা করেছিলেন। যখন তিনি এটি করার চেষ্টা করেছিলেন তখন সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের কাছে তাঁর মূর্খতা আরও

স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ তাঁর রচিত কবিতা অর্থহীন বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে যা কারও উপকারে আসেনি। তিনি অন্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে এবং তাদের সম্পদ ও কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুসারী অর্জন করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 480-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের প্রতি উপলব্ধি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে যাতে তাদের বিশ্বাসকে শেখার এবং তার উপর কাজ করার মাধ্যমে শক্তিশালী করা যায়। এই প্রক্রিয়া তাদের ঐশ্বরিক উত্স এবং এর সর্বজনীন এবং নিরবধি উপকারী শিক্ষাগুলিকে চিনতে অনুমতি দেবে।

পবিত্র কুরআনে অগণিত গুণাবলী রয়েছে যা এটিকে অন্য যেকোন জাগতিক গ্রন্থ থেকে আলাদা করে। পবিত্র কুরআনের এই দিকটি এতই তীব্র যে এটি অসংখ্য জীবনকাল ধরে ব্যাখ্যা বা আলোচনা করাও যায় না। তবে এই গুণগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হবে। সর্বপ্রথম, পবিত্র কুরআনে, মহান আল্লাহ, সমগ্র মহাবিশ্বকে (শুধু মানুষ নয়) একটি উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এবং এই ঐশী ওহী নাযিল হওয়ার সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের জন্যই নয় বরং সমস্ত সৃষ্টির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। সময়ের শেষ চ্যালেঞ্জ হল যদি লোকেরা বিশ্বাস করে যে পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ নয়, তাহলে তাদের উচিত এমন একটি অধ্যায় তৈরি করা যা পবিত্র কুরআনের একটি অধ্যায়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 23:

"আর আমরা আমাদের বিশেষ ভক্তের উপর যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি অধ্যায় নিয়ে আস

এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীদের ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

সমগ্র গ্রহে এমন কোনো বই নেই যা এই ধরনের ওপেন চ্যালেঞ্জ দিতে পারে এবং দিয়েছে। কিন্তু 1400 বছরেরও বেশি আগে পবিত্র কুরআন সমগ্র বিশ্বকে এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ অমুসলিমরা জয়ী হতে পারেনি এবং এটি কখনও ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে না।

পবিত্র কুরআনের আরেকটি গুণ হল এটি ভবিষ্যতের ঘটনার ফলাফল বর্ণনা করেছে। কিন্তু এই বিবৃতিগুলির আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে ফলাফলগুলি তখন অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ অধ্যায় 48 আল ফাত, আয়াত 28:

"তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত সহ প্রেরণ করেছেন সত্যের দ্বীন যাতে তিনি একে অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারেন এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন সমগ্র মক্কা নগরীই ইসলাম ছিল তাই মক্কাবাসীরা যখন এই আয়াতটি শুনেছিল, দুর্ভাগ্যবশত তাদের জন্য, তারা বিশ্বাস করেছিল যে ইসলাম খুব দুর্বল এবং তাই বেশিদিন টিকে থাকবে না এবং অবশ্যই মক্কার সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়বে না। সমগ্র বিশ্ব একা। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে মহান আল্লাহ এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন।

পবিত্র কুরআন কীভাবে ভবিষ্যতের একটি ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যা সেই সময়ে অকল্পনীয় ছিল তার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 30 আর রুম, 2-5 আয়াতে:

"রোমানরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী ভূমিতে এবং তাদের পরাধীনতার পর তারা শীঘ্রই পরাস্ত হবে। আপনি উত্তর দিবেন না। হুকুম শুধু আল্লাহর আগে ও পরে। আর সেদিন মুমিনগণ আনন্দ করবে। আল্লাহর সাহায্যে তিনি যাকে খুশি সাহায্য করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী ও দয়ালু।"

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলি এমন এক সময়ে নাজিল হয়েছিল যখন রোমানরা (খ্রিস্টানরা) পারস্যদের (অগ্নি উপাসকদের) সাথে যুদ্ধ করছিল। অনেক প্রামাণিক ঐতিহাসিক বই দ্বারা এই যুদ্ধ নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বিশেষ সময়ে পারস্যরা যুদ্ধ জয়ের দ্বারপ্রান্তে ছিল। এক পর্যায়ে রোম নিজেই পারস্যদের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেছেন যে রোমানরা শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে রাজত্ব করবে। মক্কার অমুসলিমরা যারা নিজেরাই মূর্তিপূজারী ছিল তারা পারস্যদের পক্ষ নিয়েছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একমত হয়েছিল যে রোমানদের পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু মহান আল্লাহ সর্বদা এই আয়াতগুলোকে সত্য প্রমাণ করেছেন এবং রোমানদের বিজয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

একটি চূড়ান্ত উদাহরণ যা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন করে, আল আম্বিয়া অধ্যায় 21, আয়াত 33 এ দেখা যায়:

“আর তিনিই রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। একেকজন একেক পরিধিতে ভাসছে।"

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীরা সৌরজগৎ ঠিক কীভাবে সাজানো হয়েছে তা নিয়ে তত্ত্ব নিয়ে লড়াই করেছেন যেমন সূর্য স্থির থাকে এবং পৃথিবী চারপাশে ঘোরে বা তার বিপরীতে। শুধুমাত্র তুলনামূলকভাবে সম্প্রতি এটি বিভিন্ন ধর্ম এবং পটভূমি থেকে বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিটি বস্তু; সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবী সকলেই তাদের নিজস্ব অক্ষের উপর ঘুরছে এবং একটি সেট কক্ষপথে একে অপরের চারপাশে ঘোরে। কিন্তু মহান আল্লাহ 1400 বছর আগে এটি ঘোষণা করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কিত সকল আয়াত আজ বিজ্ঞানীদের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রমাণিত হচ্ছে। এটি প্রমাণের একটি বিশাল অংশ যা প্রমাণ করে যে পবিত্র কুরআন এক এবং একমাত্র সত্য ঈশ্বরের বাণী, মহান আল্লাহ, যিনি এই মহাবিশ্ব এবং এর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, কারণ শুধুমাত্র একজন স্রষ্টাই তার সৃষ্টিকে সত্যিকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

যদিও পবিত্র কুরআনের অনেক আদেশ মানুষ বুঝতে পারে না তার মানে এই নয় যে সেগুলি ভুল। পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত যার জ্ঞান মানুষের কাছে লুকিয়ে ছিল তা প্রকাশ পায় যখন সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছেছিল। যেহেতু পুরো পবিত্র কুরআন একটি প্রজ্ঞা ও দিকনির্দেশনার গ্রন্থ তাই কেউ এর নির্দেশ বুঝুক বা না বুঝুক তা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। এই পরিস্থিতিটি ঠিক এমন একটি শিশুর মতো যে ঠান্ডায় ভুগছে এবং আইসক্রিম খেতে চায় কিন্তু তাদের পিতামাতা তা দেয় না। পিছনের জ্ঞান না বুঝেই শিশু কাঁদতে থাকবে কিন্তু যাদের জ্ঞান আছে তারা পিতামাতার সাথে একমত হবেন যদিও বাহ্যিকভাবে মনে হয় যেন পিতামাতার সিদ্ধান্ত সন্তানের প্রতি অন্যায় করছে।

পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করার সময় যে কেউ বুঝতে পারবে যে এটি আলোচনা করা সুস্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম উভয় অর্থের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের বিভিন্ন স্তর ধারণ করে। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 1:

"...[এটি] এমন একটি কিতাব যার আয়াতগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে এবং তারপর [যিনি] জ্ঞানী ও সচেতন তার কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।"

এটির অভিব্যক্তিগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি একটি সহজ সরল সামনের উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর আয়াতগুলি অত্যন্ত বাগ্মী এবং অন্য কোন পাঠ এটিকে অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতির কাহিনীও বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রতিটি ধরণের ভাল কাজের আদেশ দিয়েছে এবং প্রতিটি ধরণের মন্দকে নিষেধ করেছে, যা একটি ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং যা একটি সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা ঘরে এবং সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন কবিতা এবং গল্পের বিপরীতে অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা মিথ্যা থেকে মুক্ত। পবিত্র কুরআনে ছোট বা দীর্ঘ সব আয়াতই উপকারী। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয় তখন তা থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। অন্য সব বইয়ের মতো পবিত্র কুরআন বারবার পাঠ করলে বিরক্ত হয় না এবং সত্য সন্ধানকারী কখনোই এটি অধ্যয়নে বিরক্ত হয় না। পবিত্র কুরআন শুধু সতর্কবাণী ও প্রতিশ্রুতিই দেয় না বরং অটল ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। পবিত্র কুরআন যখন বিমূর্ত মনে হতে পারে এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, এটি সর্বদা এটি বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং বাস্তব উপায় প্রদান করে। এটি একজনকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে এবং একটি সহজ কিন্তু গভীর উপায়ে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে উত্সাহিত করে। এটি সরল পথকে পরিষ্কার এবং আবেদনময় করে তোলে যিনি উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্য কামনা করেন। এর মধ্যে থাকা জ্ঞান নিরবধি এবং প্রতিটি সমাজ ও

যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজ যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তার প্রতিকার এটি। যেসকল সমাজ পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছে তা দেখার জন্য একজনকে কেবল ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে, যাতে এর সমস্ত জুড়ে থাকা উপকারিতা বোঝা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হলেও পবিত্র কোরআনে একটি অক্ষরও সম্পাদনা করা হয়নি কারণ মহান আল্লাহ তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিহাসের অন্য কোনো বই এ গুণের অধিকারী নয়। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা এর রক্ষক হব।"

নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা, যিনি তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তিই এর দ্বারা উপকৃত হবেন যিনি সত্যের সন্ধান করেন যেখানে তাদের আকাঙ্ক্ষার অন্বেষণকারীরা কেবল শুনতে এবং অনুসরণ করা কঠিন হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

সত্যের উপর টিকে থাকা

যুক্তিযুক্তভাবে সবচেয়ে বিপজ্জনক মিথ্যা নবী ছিলেন মুসায়লিমা, মিথ্যাবাদী। যদিও বনু হানীফা থেকে তার অনেক গোত্রের লোক অন্ধ আনুগত্যের কারণে তার সাথে যোগ দেয়, অন্যরা তা করেনি। উদাহরণস্বরূপ, থুমাম্মাহ ইবনে আথাল, আল্লাহ তার উপর রহম করুন, তার গোত্রের একজন প্রবীণ সদস্য যিনি ইসলামের উপর অটল ছিলেন এবং প্রকাশ্যে অন্যদেরকেও একই কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যদিও এটি করা তার এবং তার পরিবারের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেকেই ইসলামের উপর অটল থেকেছেন। অবশেষে তিনি তার শহর ত্যাগ করেন এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন, যখন তিনি শেষ পর্যন্ত ইয়ামামায় পৌঁছেছিলেন মিথ্যাবাদী মুসাইলিমাকে মোকাবেলা করার জন্য। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 485-486-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে। তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ভাল কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা ছেড়ে না দেওয়া। একজন

মুসলমানের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলমান অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, শেষ পর্যন্ত তাদের নেতিবাচক আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম বা আপাত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফিল হয়ে গেলেও তাদের পরিবারের মতো তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ কেবল তাদেরই বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত তাদের নম্র উপায়ে পরামর্শ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেবলমাত্র এইভাবে তারা তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

দৃঢ় বিশ্বাস

যুক্তিযুক্তভাবে সবচেয়ে বিপজ্জনক মিথ্যা নবী ছিলেন মুসায়লিমা, মিথ্যাবাদী। আবু বক্কর খালিদ বিন ওয়ালিদকে পাঠালেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য। মুসায়লিমার কিছু অনুসারী যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই মিথ্যাবাদীকে বন্দী করা হয়। খালিদ, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তাদের নেতার সাথে কথা বলে তাকে ইসলামের সত্যতা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এমনকি তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, মুসায়লিমা, মিথ্যাবাদী, যে কবিতাটি রচনা করেছেন তা তাঁর কাছে পবিত্র কুরআন পাঠ করে অকেজো আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন নেতা খালিদকে দিতে ব্যর্থ হন, তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, অবশেষে বললেন, "তাহলে মহান আল্লাহই আপনার বিরুদ্ধে আমাদের জন্য যথেষ্ট। এবং তিনি তাঁর ধর্মকে সম্মান করবেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাঁর বিরুদ্ধে যে তোমরা যুদ্ধ করছ, যদিও এটি তাঁরই ধর্ম যা তোমরা (ধ্বংস করতে) চাইছ।" ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 490-492-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি খালিদ রা.-এর দৃঢ় বিশ্বাসকে তুলে ধরে। তিনি তার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেননি এবং মিথ্যাবাদী মুসাইলিমাকে চ্যালেঞ্জ করেননি, তার উন্নত কৌশল, জনশক্তি এবং অস্ত্রের উপর নির্ভর করে বরং তিনি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে মিথ্যাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। একটি নির্ভরতা যার মূল ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। ঈমানের নিশ্চিততা অর্জনের জন্য ইসলামি জ্ঞান শিখে এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট শিক্ষা। এর মাধ্যমে তারা সফলভাবে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠবে, ঠিক যেমনটি খালিদ রা.

সকল মুসলমানেরই ইসলামে বিশ্বাস আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের শক্তি ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে কারণ তাদের পরিবার তাদের বলেছিল যে তারা প্রমাণের মাধ্যমে এটিকে বিশ্বাস করে তার মতো নয় । যে ব্যক্তি কোন কিছুর কথা শুনেছে সে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না যেভাবে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এর একটি কারণ হল একজন মুসলমান ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে এটাই সর্বোত্তম উপায়। এটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততা যত বেশি শক্তিশালী তারা সঠিক পথে অবিচল থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, বিশেষত যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয়। উপরন্তু, সুনানে ইবনে মাজা, 3849 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন একটি সর্বোত্তম জিনিস হিসাবে বিশ্বাসের নিশ্চিত হওয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্ঞানটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শুধু একটি সত্য ঘোষণা করেননি বরং উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রমাণও দিয়েছেন। অতীতের জাতির মধ্যে যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায় তা নয়, উদাহরণগুলি যা নিজের জীবনে স্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো একজন ব্যক্তি কোনো জিনিসকে ভালোবাসে যদিও তা পেয়ে গেলে তাকে কষ্ট দেয়। একইভাবে, তারা একটি জিনিস ঘৃণা করতে পারে যখন তাদের জন্য অনেক ভাল লুকিয়ে আছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ইতিহাসে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে যেমন হুদাইবার চুক্তি। কিছু মুসলিম বিশ্বাস করেছিল যে এই চুক্তিটি, যা মক্কার অমুসলিমদের সাথে করা হয়েছিল, সম্পূর্ণভাবে পরবর্তী গোষ্ঠীর পক্ষে হবে। তবুও, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষপাতী ছিল। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, 2731 এবং 2732 নম্বরে পাওয়া হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ যদি তাদের নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা অনেক উদাহরণ পাবে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি তাদের জন্য খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে। এই উদাহরণগুলি এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা (বিচার দিবস) দেখবে যেদিন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে কিভাবে বড় বড় সাম্রাজ্য এসেছে এবং গেছে। কিন্তু যখন তারা চলে গেল তখন এমনভাবে চলে গেল যেন

তারা ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতেই ছিল। তাদের কয়েকটি চিহ্ন বাদে সবগুলি এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে যেন তারা পৃথিবীতে প্রথম স্থানে ছিল না। একইভাবে, যখন কেউ তাদের নিজের জীবনের প্রতি চিন্তাভাবনা করে তখন তারা বুঝতে পারে যে তারা যতই বয়সী হোক না কেন এবং নির্দিষ্ট কিছু দিন যতই ধীরগতির মনে হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন এখন পর্যন্ত ঝাঁকুনিতে কেটে গেছে। এই আয়াতের সত্যতা বোঝা একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততাকে শক্তিশালী করে এবং এটি তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এ ধরনের উদাহরণে পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে এই খোদায়ী শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবং জান্নাতের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া পথে অবিচল থাকবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

পরিবর্তনের সুযোগ

যুক্তিযুক্তভাবে সবচেয়ে বিপজ্জনক মিথ্যা নবী ছিলেন মুসায়লিমা, মিথ্যাবাদী। আবু বক্কর খালিদ বিন ওয়ালিদকে পাঠালেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য। ওয়াশী ছিলেন জুবায়ের ইবনে মুতআমের মুক্তকৃত দাস। উহুদ যুদ্ধের সময়, যেটি তৃতীয় বছরে ঘটেছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করেন, ওয়াশী নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা হামজা ইবনে আবু মুত্তালিবকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন. কয়েক বছর পর, ওয়াশি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মিথ্যাবাদী মুসাইলিমার বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন সেরা ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য। যুদ্ধের সময় ওয়াশি মিথ্যাবাদী মুসাইলিমাকে বর্শা নিক্ষেপ করে এবং তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। অন্য একজন সাহাবী, আবু দুজানাহ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তারপর মুসায়লিমা, মিথ্যাবাদীকে শেষ করলেন। এটি সহীহ বুখারী, 4072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও ওয়াশী হাজমাকে হত্যা করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, মহান আল্লাহ তাকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেননি। পরিবর্তে, তাঁর মহান সহনশীলতা থেকে, তিনি তাকে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তার উপায়গুলি সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছিলেন। ওয়াশী এই সুযোগটি গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলমানদেরও তাই করতে হবে।

মহান আল্লাহ তার জন্য শাস্তি ত্বরান্বিত করেন না যে এটির যোগ্য নম্রতার কারণে। পরিবর্তে তিনি তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের আচরণ সংশোধন করার সুযোগ দেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 61:

" এবং যদি আল্লাহ মানুষের উপর তাদের অন্যায়ের জন্য দোষারোপ করতেন, তবে তিনি এর উপর [অর্থাৎ, পৃথিবীর] কোন প্রাণীকে ছেড়ে দিতেন না, তবে তিনি তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পিছিয়ে দেন। আর যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা এক ঘণ্টাও পিছিয়ে থাকবে না এবং অগ্রসরও হবে না।"

যে মুসলিম এটা বোঝে, সে কখনই মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়বে না, বরং সীমা অতিক্রম করবে না এবং মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা অবলম্বন করবে না, তাদেরকে কখনো শাস্তি দেবে না। তারা বুঝতে পারে যে শাস্তি কেবল বিলম্বিত হয় যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় তবে পরিত্যাগ করা যায় না। তাই এই ঐশ্বরিক নাম একজন মুসলমানের মধ্যে আশা ও ভয়ের সৃষ্টি করে। একজন মুসলমানের উচিত এই বিলম্বকে অনুতপ্ত হতে এবং সৎ কাজের দিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবহার করা।

একজন মুসলমানের উচিত এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করা, বিশেষ করে যখন তারা খারাপ চরিত্র প্রদর্শন করে তখন মানুষের সাথে নম্র আচরণ করে। তাদের উচিত অন্যদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা যেমন তারা মহান আল্লাহকে তাদের উদাসীনতার মুহুর্তে তাদের সাথে নম্র হতে চায়। কিন্তু একই সাথে তাদের নিজেদের খারাপ বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের নমনীয় হওয়া উচিত নয় যে পাপের শাস্তি বিলম্বিত হয় তা স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করা হয় না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দিয়ে তাদেরও নম্রতায় অবিচল থাকতে হবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

“এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।”

কোমল হৃদয়

ইয়ামামার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এবং খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিজয় লাভ করার পর, তিনি বনু হানীফা গোত্রের একজন প্রধানের কন্যাকে বিয়ে করেন। উপরন্তু, খালিদ, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, বানু হানিফাহ গোত্রের বাকি অংশের সাথে একটি শান্তি চুক্তি করার জন্য প্রতারিত হয়েছিল, একটি কৌশল যা তিনি উপেক্ষা করেছিলেন কারণ এটি তাদের বেশিরভাগ উপজাতিকে ইসলামের ভাঁজে ফিরে যাওয়ার দিকে পরিচালিত করেছিল। অবশেষে, খালিদ, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সেই সময়ে যুদ্ধের চেয়ে চুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর লোকেরা ইতিমধ্যেই একটি কঠিন যুদ্ধ সহ্য করেছিল, যেখানে 1200 জন মুসলিম শহীদ হয়েছিল, যার মধ্যে অনেক সিনিয়র সাহাবীও ছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যখন আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, যা ঘটেছিল তা সম্পর্কে অবহিত হলে তিনি প্রথমে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কারণ তিনি কোন ধর্মত্যাগী গোত্রের সাথে শান্তি চুক্তি করতে চাননি, কিন্তু পরে তিনি খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। , তার ক্রিয়াকলাপের জন্য কারণ সেগুলি যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল তার জন্য তারা ন্যায়সঙ্গত ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 510-513-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কর্মকাণ্ড বনু হানফীয়া গোত্রের হৃদয়কে কোমল করেছিল, যা তাদের অনুতপ্ত হতে এবং ইসলামের ভাঁজে ফিরে আসতে উৎসাহিত করেছিল। খালিদ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তার সুবিধার জন্য নরমতার সাথে কঠোরতার ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হন।

সাধারণভাবে বলা যায়, ইসলামের সৌন্দর্য ভদ্রতার মধ্যে পাওয়া যায়। অনেক হাদিসে যেমন সুনানে ইবনে মাজা, ৩৬৮৯ নম্বরে পাওয়া যায় এমন অনেক

হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ দিয়েছেন । পবিত্র কুরআনে এমনকি উল্লেখ করা হয়েছে যে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাঁর নম্রতা ও কোমল স্বভাবের কারণে সর্বদা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে স্নেহের সাথে চলতেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

" সুতরাং আল্লাহর রহমতে, [হে মুহাম্মদ], আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

আরবরা কঠোর হৃদয়ের জন্য কুখ্যাত ছিল কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কারণে শান্তি ও তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, তাদের মেজাজ অনেক সময় তাদের কঠিন হৃদয় গলে যেত এবং এইভাবে তারা গ্রহণ করত এই গুণটি এবং মানবজাতির বাকি পথ দেখানোর জন্য বীকন হয়ে উঠেছে । এ জন্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক, একটি হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে আবু দাউদ, 4809 নম্বরে পাওয়া যায় যে, যে ভদ্রতা থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 103:

"... এবং তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর - যখন তোমরা শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের হৃদয়কে একত্রিত করেছিলেন এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই হয়ে গেলে..."

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চায় তাদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট বার্তা। তাদের অবশ্যই কঠোর ধ্বংসাত্মক মানসিকতার পরিবর্তে একটি কোমল গঠনমূলক মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। তাদের উচিত জনগণকে একত্রিত করা এবং ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে অন্যের উপকার করার চেষ্টা করা সমাজের মধ্যে বিতর্ক। একটি ভাল উদাহরণ এই তাদের সন্তানদের প্রতি একজনের মনোভাব দেখা যায়। যে বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের প্রতি নম্র স্বভাব দেখিয়েছিলেন তারা দত্তক নেওয়া বাবা-মায়ের চেয়ে তাদের উপর অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। একটি কঠোর মেজাজ। প্রায়শই কেউ কেউ তাদের কঠোর মনোভাব দিয়ে মানুষকে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয় এবং এটি ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে চ্যালেঞ্জ করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। উদাহরণস্বরূপ, একবার এক অশিক্ষিত বেদুইন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মসজিদে প্রস্রাব করে । যখন সাহাবায়ে কেরাম রা আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাকে শাস্তি দিতে চান মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, তাদের নিষেধ করলেন এবং মসজিদে থাকার আদব বিদুইনকে আলতো করে ব্যাখ্যা করলেন। এই ঘটনাটি সুনানে ইবনে মাজাহ 529 নং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে । এই নরম দৃষ্টিভঙ্গি লোকটিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানেও উল্লেখ আছে। যেমন ফেরাউন নিজেকে সর্বোচ্চ প্রভু বলে দাবি করলেও তথাপি মহান আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ)-কে । উভয়, ফেরাউনকে আমন্ত্রণ জানানো না মৃদু এবং সদয় বক্তৃতা ব্যবহার করে নির্দেশনার দিকে। C hapter 79 An Naziat, আয়াত 24:

"এবং বললেন, "আমিই তোমার শ্রেষ্ঠ প্রভু।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 43-44:

“তোমরা দুজনেই ফেরাউনের কাছে যাও। নিঃসন্দেহে সে সীমালংঘন করেছে। এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

শিশুরা এমনকি পশুরাও ভদ্রতার ভাষা বোঝে। সুতরাং একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ইসলাম ও কল্যাণের দিকে দাওয়াত দেওয়ার সময় এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে কীভাবে সঠিক পথ দেখা যাবে না? এ কারণেই মহানবী সা এবং তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, একবার একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সহীহ মুসলিম, 6601 নম্বরে পাওয়া যায় যে , আল্লাহ তায়ালা তিনি তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে দয়ালু এবং কোমল এবং সৃষ্টিকে একে অপরের সাথে নরম আচরণ করতে পছন্দ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক যারা শব্দ ছড়িয়ে ইসলামের ভুল বিশ্বাস গৃহীত হয়েছে যে কোমল হওয়া আমি দুর্বলতার লক্ষণ। এটা শয়তানের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ সে মানবজাতিকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায় ।

সীমা বুঝুন

ইয়ামামার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এবং খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিজয় লাভের পর, বনু হানীফা গোত্রের সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে অল্প সংখ্যক বাদে সকলেই অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসেন। ইসলাম। অনুতাপ করতে ব্যর্থ এমন একজন ব্যক্তি হলেন সালামাহ ইবনে উমাইর। তিনি খালিদকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, কিন্তু তিনি তার মন্দ পরিকল্পনায় কাজ করার আগেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর অনুতাপের ভঙ্গি করে তাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং আবারও খালিদকে হত্যার চেষ্টা করা হয়, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন। তার দ্বিতীয় প্রচেষ্টার সময় তাকে আক্রমণ করা হয় এবং ধাওয়া করা হয় যতক্ষণ না তিনি একটি কূপে পড়ে মারা যান। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 516-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যদিও অধিকাংশ লোক সত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে যখন এটি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তবে তারা এমন কিছু যারা কখনই এর কাছে আত্মসমর্পণ করবে না কারণ তারা মন্দকে তাদের পথ হিসাবে গ্রহণ করেছে।

পবিত্র কুরআন মানবজাতিকে শিক্ষা দেয় যে কিছু কিছু মানুষ বস্তুগত জগতে এতটাই ডুবে আছে যে তাদের অন্তরে কোন উপদেশ প্রবেশ করবে না। পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে এই দলটির হৃদয় পাথরের চেয়েও কঠিন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 74:

"অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, পাথরের মত বা তার চেয়েও কঠিন..."

এই মুহুর্তে যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চায় তাদের উচিত এই ধরণের লোক থেকে আলাদা হয়ে অন্যের দিকে মনোনিবেশ করা। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী , এমনকি এই ক্ষেত্রেও একজন মুসলিমকে সর্বদা পাপীদের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত কারণ তারা যে কোনো সময় তওবা করতে পারে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত ৬৩:

"... এবং যখন অজ্ঞরা তাদের [কঠোরভাবে] সম্বোধন করে, তখন তারা [শান্তির কথা] বলে।"

একইভাবে পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন মহিমান্বিত, যে উপদেশ যখন একটি সীমা পৌঁছে যায় তখন একগুঁয়ে এবং বিপথগামী লোকদের আলাদা করা এবং ছেড়ে দেওয়াই উত্তম তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের কাছে। নিঃসন্দেহে এমন একটি দিন আসবে যখন আল্লাহ তায়ালা উন্নত, মানবজাতিকে অবহিত করবে কে সৎপথে ছিল এবং কে হারিয়েছিল অন্ধকারে। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 55:

"এবং যখন তারা মন্দ কথা শোনে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, "আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হবে, আমরা অজ্ঞদের সন্ধান করি না।"

মুসলমানদের কখনই হতাশাগ্রস্ত এবং বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় যখন তাদের ভাল পরামর্শ অন্যদের প্রভাবিত করে না। কিছু ক্ষেত্রে, এই মানুষ গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত হয় এমন পরিমাণে তাদের অন্তর আবৃত হয়ে যায়। এই পর্দা তাদের প্রভাবিত করা ভাল উপদেশ বাধা দেয় একটি ইতিবাচক উপায়ে। একটি হাদিস পাওয়া গেছে সুনানে ইবনে মাজা, 4244 নম্বর , কিভাবে একটি পাপ ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ তৈরি করে। একজন যত বেশি পাপ করে ততই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় এই অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 14:

" না! বরং দাগ তাদের অন্তরকে ঢেকে দিয়েছে যা তারা উপার্জন করছিল।"

এটি অন্য আয়াতের অনুরূপ যেখানে আল্লাহ , মহিমান্বিত, ঘোষণা করে যে তাদের কান, চোখ এবং হৃদয় সত্য থেকে আড়াল করা হয়েছে এবং তাই তারা সত্যের দিকে পরিচালিত হতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 7:

" আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের শ্রবণের উপর মোহর স্থাপন করেছেন এবং তাদের দৃষ্টির উপর একটি পর্দা রয়েছে..."

দোষ ইসলামের বাণীর নয়, বিপথগামীদের অন্তরে। ঠিক যেমন দোষ একজন অন্ধ ব্যক্তির চোখে, উজ্জ্বল সূর্যের নয়। দুর্ভাগ্যবশত, তার একগুঁয়ে মনোভাব একটি ব্যাপক সমস্যা হয়ে উঠেছে সমাজের মধ্যে। এর মধ্যে কিছু লোক ইসলামে বিশ্বাস করে তবুও পবিত্র কোরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

এর হাদিসের শিক্ষার জন্য তাদের হৃদয় ও মন বন্ধ করে রেখেছে। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। তারা এমন কোন ভাল উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যা তাদের উভয় জগতের জন্য উপকৃত হয়।

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে বেছে নেয় তাদের বুঝতে হবে যে দুই ধরনের মানসিকতা মানুষ গ্রহণ করতে পারে। প্রথমটি হল যখন কেউ একটি সমস্যা সম্পর্কে আগে থেকেই তাদের মন তৈরি করে এবং তারপরে শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলি অনুসন্ধান করে এবং গ্রহণ করে যা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে সমর্থন করে। যেখানে , সঠিক মনোভাব হল বিভিন্ন বিষয়ে জোরালো প্রমাণ অনুসন্ধান ও গ্রহণ করে খোলা মন নিয়ে জীবনযাপন করা। প্রথম মানসিকতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্তর থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সমস্যা সৃষ্টি করবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই কিভাবে কিছু দিক মিডিয়া কাজের. তারা পূর্বনির্ধারিত তারা যে তথ্য প্রকাশ করতে চায়, দুর্বল সমর্থনকারী প্রমাণের বিটগুলি খুঁজে বের করে এবং তারপর বিশ্বের দেখার জন্য অনুপাতের বাইরে এটি গাট্টা. যারা ইসলামের বাণী প্রচার করছে তাদের উচিত প্রথম ধরণের লোকদের এড়িয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় দলকে সত্যের দিকে দাওয়াত দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করা।

আন্তরিক তওবা

যদিও আবু বক্করের খিলাফতকালে যারা মুরতাদ হয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা আন্তরিক মুসলমানদের জন্য অনেক কষ্ট ও কষ্টের কারণ হয়েছিলেন, তবুও তাদের মধ্যে যারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে ইসলামের ধারায় ফিরে এসেছিল তাদের ক্ষমা করা হয়েছিল এবং চিকিত্সা করা হয়েছিল। সম্মান এবং সম্মানের সাথে, ঠিক যেমন ধর্মত্যাগ করার আগে তাদের সাথে সম্মান এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা হয়েছিল। এরপর তারা ইসলামের শিক্ষার উপর অটল থাকে এবং দেহ ও ধন-সম্পদ দিয়ে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 429-430-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এর একটি উদাহরণ ছিল ভন্ড নবী তুলাহিয়া যিনি অনেক সৎ মুসলমানকে হত্যা করেছিলেন এবং দেশে প্রচুর দুর্নীতি ছড়িয়েছিলেন। তিনি পরাজিত হয়ে জীবনের জন্য পলায়ন করার পর অবশেষে তিনি অনুতপ্ত হন এবং পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করেন। কিছুকাল পরে, তিনি মক্কায় জিয়ারত (উমরা) করার উদ্দেশ্যে মদিনার পাশ দিয়ে যান। যখন আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, তিনি কেবলমাত্র মানুষকে বলেছিলেন যে তিনি তাকে একা ছেড়ে দিন কারণ মহান আল্লাহ তাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 448-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4251 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে মানুষ পাপ করে কিন্তু সর্বোত্তম পাপকারী সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকভাবে তাওবা করে।

মানুষ ফেরেশতা না হওয়ায় তারা পাপ করতে বাধ্য। যে জিনিসটি এই লোকদের বিশেষ করে তোলে তা হল যখন তারা তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, পাপ বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। , মহিমান্বিত, এবং মানুষ.

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, ছোটখাট গুনাহগুলো নেক আমলের মাধ্যমে মুছে ফেলা যায় যা অনেক হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিম, 550 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি উপদেশ দেয় যে পাঁচটি দৈনিক ফরজ নামাজ এবং পরপর দুটি জুমার জামাত নামাজ মুছে ফেলবে। তাদের মধ্যে সংঘটিত ছোট গুনাহ যতক্ষণ না বড় গুনাহ এড়ানো যায়।

শুধুমাত্র আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে বড় গুনাহগুলো মুছে ফেলা হয়। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত ছোট-বড় সব পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা এবং যদি সেগুলি ঘটে থাকে তবে মৃত্যুর সময় অজানা থাকায় অবিলম্বে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এবং তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

দুবার বোকা বানানো হয়নি

মুরতাদরা যারা অনুতপ্ত হয়ে ইসলামের ভাঁজে ফিরে এসেছিল তারা আবার মুসলিম সমাজে গৃহীত হয়েছিল এবং ন্যায়বিচার ও সদয় আচরণ করা হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তারা সম্প্রতি ইসলামে ফিরে এসেছে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের নেতা বা গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেননি। এমনকি তিনি তাদেরকে ধর্মত্যাগী যুদ্ধের বাইরেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। যদিও তিনি মুসলমান হিসেবে তাদের পূর্ণ অধিকার প্রসারিত করেছিলেন, কম নয়, তিনি এই পদ্ধতিতে সাধারণ মুসলিম জনসংখ্যা এবং সেনাবাহিনীকে রক্ষা করার জন্য এইভাবে আচরণ করেছিলেন যা তিনি তৎকালীন পরাশক্তি: রোমান এবং পারস্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 449-450-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদি এই প্রাক্তন মুরতাদরা আবার ইসলাম পরিত্যাগ করে যখন একটি মুসলিম বাহিনী বাড়ি থেকে অনেক দূরে ছিল এবং পরবর্তীদের স্বদেশে একটি পরাশক্তির সাথে জড়িত ছিল, তবে এটি সেই মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য বিপর্যয়কর হত। তার আচরণ মানুষকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে তাদের অধিকার পূরণের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারী, 6133 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে একজন মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশনে পড়ে না।

এর অর্থ হল একজন বিশ্বাসী কোনো কিছু বা কারো দ্বারা দুবার বোকা হয় না। এর মধ্যে গুনাহ করা অন্তর্ভুক্ত। একজন প্রকৃত মুমিন পাপ করার থেকে মুক্ত নয় । কিন্তু যখন তারা সেগুলি করে তখন তারা তাদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করে না এবং বরং মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে শিখে এবং পরিবর্তন করে।

একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী মানুষকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে না যার ফলে তাদের দ্বারা অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু যদি তারা কেউ দ্বারা প্রতারিত হয় তবে তাদের উপেক্ষা করা উচিত এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি তাদের ক্ষমার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

তবে এই ব্যক্তির সাথে আচরণ করার সময় তাদের সাবধানতার সাথে তাদের আচরণ পরিবর্তন করা উচিত যাতে তারা আবার বোকা না হয় তা নিশ্চিত করে। অন্যদের ক্ষমা করা এবং বিশেষ করে কারো প্রতি অন্যায় করার পরে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

এই হাদিসটি একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি যিনি ক্রমাগত তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান থেকে শিক্ষা নেন যাতে তারা আরও ভাল পরিবর্তন করতে পারে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করে, তাঁর আদেশ পালন করে,

বিরত থেকে। তাঁর নিষেধাজ্ঞা এবং নিয়তির মোকাবিলা করে ধৈর্যের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী।

শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাফল্য

ধর্মত্যাগী যুদ্ধগুলি থেকে শেখার একটি প্রধান শিক্ষা হল যে সফলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল কারণ তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল ছিল, যার মধ্যে তাঁর আদেশ পালন করা জড়িত। তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়া। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ আন্তরিকভাবে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিখে এবং আমল করে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 55-56:

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে [কর্তৃত্বের] উত্তরাধিকার দান করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছিলেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের প্রতিস্থাপন করবেন, তাদের ভয়, নিরাপত্তার পরে, [কারণ] তারা আমার ইবাদত করে, আমার সাথে কাউকে শরীক করে না। অতঃপর যারা অবিশ্বাস করে, তারাই অবাধ্য। আর নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও।"

সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের শক্তি কমেছে। প্রতিটি মুসলমান তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে বিশ্বাস করে এবং সন্দেহ করে যে এটি তাদের বিশ্বাস হারাতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য লাভের

চাবিকাঠি দিয়েছেন যা সারা বিশ্বে মুসলিমদের দুর্বলতা ও শোক দূর করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

" সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে যদি তোমরা [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উভয় জগতে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য অর্জনের জন্য মুসলমানদেরকে প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে। প্রকৃত বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন অন্যের জন্য ভালোবাসা, যা নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য একজনকে ইসলামিক শিক্ষা ও আমল করতে হবে। শিক্ষা এই মনোভাবের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আর যদি মুসলমানরা তা অর্জন করতে চায় তাহলে তাদের অবশ্যই এই সঠিকভাবে পরিচালিত মনোভাবের দিকে ফিরে আসতে হবে। যেহেতু মুসলমানরা পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস করে তাদের উচিত এই সহজ শিক্ষাটি বোঝা এবং এর উপর আমল করা।

কুরআন সংকলন

কুরআন সংগ্রহ করা

ইয়ামামার যুদ্ধের পর, যার ফলে অনেক মুসলমান হতাহত হয়েছিল, যাদের মধ্যে অনেকেই পবিত্র কুরআন মুখস্ত করেছিলেন, উমর ইবনে খাত্তাব আবু বক্করকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, পবিত্র কুরআনকে বই আকারে সংগ্রহ করতে এই ভয়ে যে আয়াতগুলি হারিয়ে যেতে পারে যদি পবিত্র কুরআনের মুখস্থকারীরা মারা যেতে থাকে বা যুদ্ধে শহীদ হতে থাকে। এর আগে পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো কোনো একটি বইয়ে ছিল না, বরং সেগুলো হয় মুখস্থ করা হতো বা বিভিন্ন বস্তুর ওপর লেখা হতো, যেমন পাথর, যা বিভিন্ন মানুষের দখলে ছিল। প্রাথমিকভাবে, আবু বক্কর (রাঃ) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি এমন কিছু করতে চাননি যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কিন্তু অবশেষে যখন উমর অটল ছিলেন, তখন আবু বক্কর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য এটিই সর্বোত্তম পদক্ষেপ। আবু বক্কর জায়েদ বিন সাবিতকে এই গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। পবিত্র কুরআনকে বই আকারে সংগ্রহ করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। কপিটি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে থেকে যায়, যতক্ষণ না তিনি মারা যান, তারপর তা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এবং অবশেষে তাঁর কন্যা এবং মুমিনদের মা হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করা হয়। তার সাথে সন্তুষ্ট সহীহ বুখারীর ৭১৯১ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ভবিষ্যত মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের অধিকার পূরণের মাধ্যমে তাদের মহান উত্তরাধিকারকে সম্মান করতে হবে, কারণ এটিই ছিল তাদের ত্যাগের উদ্দেশ্য।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানের শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং এটিকে শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

আপনার যত্ন অধীনে

যখন কেউ আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্ব পর্যবেক্ষণ করেন, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অধিকার পূরণ করেছিলেন। বর্ধিতভাবে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং সেই সময়ের প্রকৃত মুসলমানরাও তাই করেছিলেন। এর ফলে একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজ গড়ে ওঠে।

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য একজন অভিভাবক এবং দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে বাহ্যিক জিনিস যেমন সম্পদ এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস যেমন একজনের দেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলিমের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখকে হালাল জিনিস দেখার জন্য এবং তাদের জিহ্বা ব্যবহার করে শুধুমাত্র হালাল এবং দরকারী শব্দ উচ্চারণ করা।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদের যেমন আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছেও প্রসারিত হয়। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জন্য তাদের জন্য প্রদান করা এবং মন্দ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করার মতো অধিকারগুলো পূরণ করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের পথ দেখাতে হবে উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে কারণ এটিই এখন পর্যন্ত শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, কার্যত আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদীস অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ।

বিশ্বাস শান্তি আনে

যখন কেউ আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্ব পর্যবেক্ষণ করেন, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অধিকার পূরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে প্রয়োগ করেছেন। বর্ধিতভাবে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং সেই সময়ের প্রকৃত মুসলমানরাও তাই করেছিলেন। এর ফলে একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজ গড়ে ওঠে।

দুর্ভাগ্যবশত, তারা এমন কিছু যারা দাবি করে যে এই পৃথিবীতে ঈমানের প্রয়োজন নেই এবং অন্যরা যারা মুসলিম তারা দাবি করে যে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের সাথে ইসলামকে সমর্থন না করেই ইসলামকে স্বীকার করাই যথেষ্ট। কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে অপরাধ বৃদ্ধি ঈমানের গুরুত্ব প্রমাণ করে এবং জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে তা শক্তিশালী করে। এর কারণ হল অপরাধ এবং পাপ শুধুমাত্র তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি মনে করেন যে তারা হয় তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য কোন পরিণতির সম্মুখীন হবেন না, যেমন জেল, অথবা তারা কোনভাবে তাদের থেকে পালিয়ে যাবে, উদাহরণস্বরূপ, দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা যে কাজই করুক না কেন, প্রকাশ্য বা গোপন, বড় বা ছোট, এবং তারা যে কৌশলের চেষ্টাই করুক না কেন, নিঃসন্দেহে সেখানে আসবে যেখানে তাদের সমস্ত কাজের জন্য জবাবদিহি করা হবে করার আগে সর্বদা দুবার চিন্তা করবে। একটি অপরাধ বা একটি পাপ। ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা হলে তা অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত থাকবে। মানুষ এভাবে কাজ করলে সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে পড়ত। অপরাধের হার হ্রাস পাবে এবং সময়গুলি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঠিক নির্দেশিত খলিফাদের সময়ের সাথে

ঘনিষ্ঠভাবে মিলবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এই সত্যটিই বিশ্বাসের গুরুত্বকে নির্দেশ করে এবং সমাজের মধ্যে জ্ঞান অর্জন ও তার উপর কাজ করার মাধ্যমে এটিকে শক্তিশালী করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 90:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের [সাহায্য] করার নির্দেশ দেন এবং অনৈতিক কাজ, মন্দ আচরণ ও জুলুম থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, সম্ভবত তোমরা স্মরণ করিয়ে দেবে।"

মন্দ প্লট

ধর্মত্যাগী যুদ্ধ থেকে শেখার একটি প্রধান শিক্ষা হল যে, যখন কেউ শেষ পর্যন্ত মন্দ চক্রান্ত করে, শীঘ্রই বা পরে, তারা এই পৃথিবীতে তাদের খারাপ আচরণের পরিণতির মুখোমুখি হবে। আর যদি তারা তওবা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এই দুনিয়ার পর যা আসবে তা তাদের জন্য আরও বিপর্যয়কর হবে।

অতএব, একজন মুসলমানের কখনই একটি খারাপ কাজ করার ষড়যন্ত্র করা উচিত নয়, কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপর পাল্টা আঘাত করবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী বিশ্বে বিলম্বিত হয় তবে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের মুখোমুখি হবে। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর ভালোবাসা, সম্মান ও স্নেহ কামনা করে তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের ষড়যন্ত্র তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 18:

“এবং তারা তার শার্টের উপর মিথ্যা রক্ত নিয়ে এসেছিল। [জ্যাকব] বললেন, "বরং, তোমার আত্মা তোমাকে কিছুতে প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্য্য সবচেয়ে উপযুক্ত..."

একজন যত বেশি মন্দ ষড়যন্ত্র করবে, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের ইচ্ছা অর্জন করে, মহান আল্লাহ, তারা যে জিনিসটি চেয়েছিলেন তা উভয় জগতে তাদের

জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবেন যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?

বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া

মুরতাদদের সাথে মোকাবিলা করার পর, আবু বক্কর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, তারপর তার পুরো মনোযোগ সেই সময়ের দুটি পরাশক্তির দ্বারা সৃষ্ট বিপদ মোকাবেলায় স্থানান্তরিত করেন: রোমান এবং পারস্য। এই দুই পরাশক্তিই মুসলমানদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছিল। উদাহরণস্বরূপ, তারা ধর্মত্যাগীদের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা ঘিরে থাকা অঞ্চলগুলিতে সৈন্য পাঠাতে শুরু করেছিল। উপরন্তু, তারা তাদের অঞ্চলে ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রচারে বাধা দিচ্ছিল এবং তাদের নাগরিকদের ইসলাম বিবেচনা করার জন্য হুমকি দিচ্ছিল। এটি আরেকটি কারণ ছিল যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 551-552-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যখনই কেউ অন্যকে ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানায়, ভালোর আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে, তারা অন্য অনেকের গাফিলতিহীন জীবনধারাকে চ্যালেঞ্জ করে যা তাদের যেভাবেই হোক সত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে অনুপ্রাণিত করবে । অতীতের সকল জাতি তাদের নবী (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান করার প্রধান কারণ ছিল এই কারণেই। তারা তাদের জীবনধারা ও বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করতে পারেনি এবং তাদের রক্ষায় আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল । মহিমান্বিত , এবং তাদের মহানবী সা তার উপর হতে যখন কেউ এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি গ্রহণ করে তখন তাদের নিজের আত্মীয়-স্বজন সহ অন্যদের দ্বারা সৃষ্ট অনেক কষ্টের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকতে হবে। মহানবী , শান্তি তাদের উপর থাকুক, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় উন্নত, তবুও তারা অগণিত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তাদের জাতি থেকে। একজনকে শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস অধ্যয়ন করতে হবে এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক, এই

সত্যটি পালন করার জন্য। যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, একবার একটি হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছে জামি আত তিরমিযী, 2472 নম্বরে পাওয়া যায় যে , সৃষ্টির মধ্যে কেউই আল্লাহর পথে নির্যাতিত হয়নি। মহিমান্বিত, তার চেয়েও বেশি।

এই ধরনের ক্ষেত্রে অন্যের খারাপ মনোভাবের প্রতিক্রিয়া শিক্ষিত, শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং মৃদু। এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 19 মরিয়ম , আয়াত 46 - 47:

"[তার পিতা] বললেন, "হে ইব্রাহীম, তোমার কি আমার দেবতাদের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা নেই? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর ছুঁড়বো, তাই আমাকে দীর্ঘ সময় এড়িয়ে যাও।" [ইবরাহীম] বললেন, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হবে। আমি তোমার জন্য আমার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহশীল।

এখানে মহানবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সদয় ও শ্রদ্ধাশীল জবাব তার উপর, তার বড়ের কঠোর মনোভাবের প্রতি আলোচনা করা হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে , একজন ব্যক্তির অবশ্যই একটি চরিত্রের ত্রুটি থাকতে হবে যদি তারা সকলের সাথে মিলিত হওয়ার দাবি করে। সমাজের সদস্যদের মধ্যে পার্থক্যের কারণে একজন ব্যক্তি কখনই সবার সাথে মিলিত হতে পারে না। তারা সর্বদা এক বা একাধিক হবে যারা দ্বিমত পোষণ করে তাদের মানসিকতা, জীবনধারা এবং পরামর্শ দিয়ে। এই বৈচিত্র্য উত্তেজনা এবং মাঝে মাঝে সমস্যা

সৃষ্টি করবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা দ্বিমুখী হয়ে ভন্ডদের মানসিকতা অবলম্বন করেছে। যদি মহানবী সা তাদের উপর হতে, সবাই দ্বারা প্রিয় ছিল না একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে পারে এই মর্যাদা অর্জন? এই কারণেই অপপ্রচারে বিশ্বাস করা উচিত নয় কারণ এইভাবে সবচেয়ে বেশি দুর্ব্যবহার করা দলটি ছিলেন নবী , শান্তি। তাদের উপর হতে এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ, হযরত মূসা (আঃ) একবার একজন নির্লজ্জ মহিলা কর্তৃক অবৈধ সম্পর্কের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সে আল্লাহর শত্রু দ্বারা তাকে অপবাদ দিতে প্রলুব্ধ হয়েছিল মহিমান্বিত , কুরাউন। যখন সে অভিযুক্ত হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাকে, প্রকাশ্যে একটি ধর্মীয় সমাবেশের সময় তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। যখন তিনি তার প্রতিক্রিয়া দেখেন তখন তিনি অবিলম্বে তার অভিযোগ প্রত্যাহার করেন এবং সত্য স্বীকার করেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা উচুঁ, ধ্বংস করা কুরাউন পৃথিবীকে আদেশ দিয়ে তাকে এবং তার বিশাল ভান্ডারকে গ্রাস করে। এই ঘটনাটি ইমাম যাহাবীর দ্য মেজর সিনস, পৃষ্ঠা 166 - 167 এ লিপিবদ্ধ হয়েছে। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 81:

" এবং আমি তাকে এবং তার ঘরকে মাটিতে গ্রাস করে দিয়েছিলাম..."

মহানবী , শান্তি তাদের উপর অনেক সময় অপবাদ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা তাদের মিশনে অবিচল ছিল যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় লাভ করে। উন্নত মহান আল্লাহ যখন কোন কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন, যেমন

তাকে সাহায্য করা বিশ্বাসের সত্য বাণী ছড়িয়ে দেয় সমগ্র সৃষ্টি সম্মিলিতভাবে তাকে থামাতে পারে না।

মুসলমানদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে শব্দটি ছড়িয়ে দেওয়ার সময় তারাও কষ্টের সম্মুখীন হবে ইসলামের তাই তাদের অবশ্যই মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে , শান্তি তাদের উপর বর্ষিত হোক, অসুবিধার মুখে অবিচল থাকার মাধ্যমে । এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের মনোভাব তাদের সঙ্গে সন্তুষ্ট, এবং ধার্মিক পূর্বসূরীদের. যদি কেউ তাদের সাথে পরবর্তী জগতে যোগদান করতে চায় তবে তাদেরও এই মনোভাব অবলম্বন করতে হবে।

পারস্যদের বিরুদ্ধে অভিযান

সহজ জিনিস মেকিং

হযরত আবু বক্কর (রাঃ) ইরাকে পারস্যদের দিকে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন: খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং ইয়াদ ইবনে ঘানাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মুসলিম সৈন্যদের তাদের অভিযানে যোগ দিতে বাধ্য করবেন না। . পরিবর্তে, তিনি তাদের প্রত্যেক সৈন্যকে একটি বিকল্প দিতে আদেশ দেন, হয় তাদের সাথে এগিয়ে যেতে বা তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 555-556-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি এমন একজন ছিলেন যিনি সর্বদা অন্যদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করার চেষ্টা করেছিলেন, এমনকি যদি এটি তার নিজের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। বিপজ্জনক সময়ে মুসলিম জাতিকে সমর্থন করা মুসলমানদের কর্তব্য ছিল, তবুও তিনি লোকেদের তালিকাভুক্ত করতে বাধ্য করেননি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অন্যদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করার এই আচরণটি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

এই দিন ও যুগে অজ্ঞতার কারণে পিতামাতার মতো মানুষের অধিকার পূরণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। যদিও একজন মুসলমানের কাছে কোনো অজুহাত নেই কিন্তু সেগুলো পূরণ করার জন্য চেষ্টা করা মুসলমানদের একে অপরের প্রতি দয়াশীল হওয়া জরুরি। সহীহ বুখারি, 6655 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন যারা অন্যদের প্রতি করুণাময়।

এই করুণার একটি দিক হল একজন মুসলমান অন্যের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি না করা। পরিবর্তে, তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করতে এবং অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তির মতো উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে, যখন একজন মুসলিম অন্যদের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে এবং তারা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাদের শাস্তি হতে পারে। অন্যদের প্রতি করুণাময় হওয়ার জন্য তাদের তাই কিছু ক্ষেত্রে তাদের অধিকার দাবি করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম অন্যের অধিকার পূরণের জন্য চেষ্টা করবেন না বরং এর অর্থ হল যে তাদের অধিকার রয়েছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে মাফ করে দিতে পারেন এবং যদি তারা নিজেরা কষ্ট না করে তা করার উপায় রাখে, বিশেষ করে যদি তারা কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা ও করুণা শুধু মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও করুণাময় করে তুলবে না বরং এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে সে পাপী নয় তবে তারা এইভাবে আচরণ করলে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করা এবং আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া এবং পরকালে সবকিছু সহজ করে দেবেন।

শ্রবণ এবং আনুগত্য

যখন আবু বক্কর, আল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইরাকের দিকে বাহিনী প্রেরণ করেন, তখন তিনি তার কিছু নেতাকে একক নেতার নেতৃত্ব অনুসরণ করার নির্দেশ দেন, কারণ বিভ্রান্তি এড়াতে যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে হতে হবে। তার সমস্ত নেতারা তার আদেশের প্রতি আনুগত্য করেছিলেন এবং তাদের যা অনুসরণ করতে আদেশ করা হয়েছিল তাদের আন্তরিকতার সাথে পালন করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 556-557-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তারা এইভাবে আচরণ করেছিল যে তারা মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক ছিল এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিস কামনা করেনি। তারা কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল, এর অর্থ তারা অন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছে বা অনুসরণ করছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

পরিণতির সম্মুখীন

ইরাক অভিযানের সময়, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং তার সেনাবাহিনী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, আরেকটি মুসলিম বাহিনীকে সমর্থন করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হন, ইয়াদ ইবনে ঘানামের নেতৃত্বে একটি বাহিনী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন। যখন পূর্ববর্তীটি দাউমাতুল জান্দালে পৌঁছেছিল, তখন শত্রু বাহিনীর একজন নেতা, উকাইদির ইবনে আবদুল মালিক, অন্যান্য শত্রু নেতাদের পিছু হটতে এবং খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে জড়িত না হওয়ার জন্য উত্সাহিত করেছিলেন, যেমন তারা আগে পথ অতিক্রম করেছিল। মদিনায় হিজরতের পর নবম বছরে সংঘটিত তাবুকের যুদ্ধের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উকাইদিরকে বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যিনি নেতাদের একজন ছিলেন। শত্রু বাহিনীর। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে বন্দী করার পর তাঁর কাছ থেকে আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দয়া করে উকাইদিরকে মুক্ত করেন। তিনি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং ফলস্বরূপ সর্বদা তার জীবনের জন্য ভয় পান। উকাইদির তখন দাউমাতুল জান্দাল থেকে পালিয়ে যায় কিন্তু একবার খালিদের হাতে ধরার বিরুদ্ধে ছিল, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তার অনেক বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 593-594-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটা শেখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তির যতই শারীরিক বা সামাজিক শক্তি থাকুক না কেন একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন তারা তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি তাদের জীবনের সময় ঘটে যেখানে একজন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ তাদের সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, যেমন জেল এবং অবশেষে তারা পরকালেও তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে। এটা শুধু নেতা নয় সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

তাই একজন মুসলমানের কখনোই অন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়, যেমন তাদের আত্মীয়দের। ইতিহাসের অত্যাচারী নেতাদের কাছ থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যারা এখনও তাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল, একটি দিন অবশ্যই এসেছিল যখন তাদের শক্তি তাদের উপকারে আসেনি এবং তারা তাদের খারাপ কাজের পরিণতির মুখোমুখি হয়েছিল। সামাজিক প্রভাব এবং শক্তি হল চঞ্চল জিনিস কারণ এগুলি দ্রুত ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে চলে যায়, দীর্ঘকাল কারও সাথে থাকে না। অতএব, এমন শক্তির অধিকারী একজন মুসলিমের উচিত নিজের এবং অন্যদের উপকার করার মাধ্যমে এটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। কিন্তু যদি তারা তাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে তাহলে শেষ পর্যন্ত তারা করবে একটি শাস্তি সম্মুখীন যা থেকে কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

উপরন্তু, এটা গুরুত্বপূর্ণ কারও কর্তৃত্বের অপব্যবহার না করা কারণ এটি তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। প্রতিটি অত্যাচারীকে তাদের সৎ কাজ তাদের শিকারকে দিতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করতে হবে। এতে অনেক অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলিমকে কখনই তাদের কাজের জন্য নিজেদেরকে জবাবদিহি করতে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যারা করবে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু যারা নিজেরা বিচার করবে না তারা আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখবে এবং অন্যদের ক্ষতি করতে থাকবে। না জেনে যে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরই ক্ষতি

করছে। কিন্তু যখন তারা এই সত্যটি উপলব্ধি করবে তখন তাদের শাস্তি থেকে বাঁচতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

ভালো সঙ্গী নির্বাচন করা

ইরাক অভিযানের সময়, ইরাকের অমুসলিমদের মধ্যে বসবাসকারী দুই মুসলিম যুদ্ধের একটিতে অনিচ্ছাকৃতভাবে নিহত হয়েছিল। যখন আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই বিষয়ে অবহিত করা হয় তখন তিনি অ-ইসলামী অঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত মুসলিমদের কাছে একটি চিঠি লিখে সতর্ক করেছিলেন যে তারা অমুসলিমদের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে এটি ঘটেছে। অর্থ, তাদের ইসলাম নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে স্থানান্তরিত হওয়া উচিত ছিল, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়। অথবা অন্ততপক্ষে, মুসলিম সৈন্যদের কাছে তাদের বিশ্বাস প্রকাশ করার জন্য তাদের আসন্ন মুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 598-599-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও তারা এমন পরিস্থিতির কারণে হতে পারে যা দুই মুসলমানকে একটি অমুসলিম ভূমিতে থাকতে বাধ্য করেছিল, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, কোনটিই কম নয়, এই ঘটনাটি ভাল সাহচর্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ অমুসলিমদের সাথে তাদের সাহচর্য নেতৃত্বে ছিল। তাদের মৃত্যুর জন্য।

সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে তাকে তাদের একজন হিসাবে গণ্য করা হয়।

সমস্ত মুসলিম তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে গণনা করতে এবং পরবর্তী পৃথিবীতে ধার্মিকদের সাথে শেষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, একজন মুসলমান কেবলমাত্র একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তাদের সাথে শেষ পর্যন্ত হবে যদি তারা ধার্মিকদের অনুকরণ করে। এই অনুকরণ একটি ব্যবহারিক জিনিস শুধু শব্দের মাধ্যমে ঘোষণা নয়। এই অনুকরণটি মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে সঠিকভাবে করা হয়।

কিন্তু যারা মৌখিকভাবে ধার্মিকদের প্রতি তাদের ভালবাসা ঘোষণা করে এবং তাদের অনুকরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে মুনাফিক এবং পাপীদের মধ্যে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুকরণ করে তাদের একজন হিসাবে বিবেচিত এবং বিচার করা হবে। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের বিশ্বাস হারাবে তবে এর অর্থ তাদের অবাধ্য মুসলমান হিসাবে বিচার করা হবে। কিভাবে একজন অবাধ্য মুসলমানকে একজন আজ্ঞাবহ মুসলমান হিসাবে গণ্য করা যায় এবং ধার্মিকদের সাথে শেষ করা যায়? এটা শুধুমাত্র ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা যার ইসলামে কোন মূল্য নেই। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 20:

"জাহান্নামের সঙ্গী এবং জান্নাতের সাথী সমান নয়। জান্নাতের সাথী- তারাই [সাফল্যের]।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ মনোভাব

ইরাকে অর্জিত সাফল্যের পর, খালিদ বিন ওয়ালিদ, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর সেনাবাহিনীকে এর মধ্যে অবস্থান করার নির্দেশ দেন এবং গোপনে পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ্জ) পালনের জন্য মক্কার দিকে রওনা হন। তিনি এটিকে গোপন রেখেছিলেন কারণ তিনি চাননি যে শত্রু বাহিনী শিখুক যে তিনি ইরাক ত্যাগ করেছেন, কারণ এটি কেবল তাদের আত্মবিশ্বাস দেবে। পবিত্র তীর্থযাত্রা করার পর তিনি ইরাকে তার সেনাবাহিনীর কাছে ফিরে যান। আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, পবিত্র তীর্থযাত্রার মরসুম শেষ হওয়ার পরে কী ঘটেছিল তা শিখেছিলেন। প্রাথমিকভাবে, আবু বক্কর বিরক্ত হয়েছিলেন যে খালিদ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, একটি দুর্বল সময়ে তার সেনাবাহিনী ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি চাননি, তিনি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন এবং তার গঠনমূলক সমালোচনাকে কেবল শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৬০১-৬০২-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সমস্যাটিকে দীর্ঘস্থায়ী যুক্তিতে পরিণত করতে পারতেন কিন্তু পরিবর্তে বুদ্ধিমানের সাথে এটি না করা বেছে নিয়েছিলেন কারণ তর্ক প্রায়শই আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, জামে আত তিরমিযী, 1993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সঠিক হলেও তর্ক করা এড়িয়ে চলে তাকে জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘর দেওয়া হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন সত্যিকারের মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হল নিজেকে এবং তাদের মতামত প্রচার করার জন্য তর্ক বা বিতর্ক করা নয়। সত্য প্রচার করার জন্য তাদের পরিবর্তে তথ্য উপস্থাপন করা উচিত। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। যার উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা সে তর্ক করবে না। যে নিজেকে উন্নীত করার চেষ্টা করছে কেবল সে-ই করবে। অনেকের বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তিতে জয়লাভ করলে কারো পদমর্যাদা বাড়ে না। উভয় জগতেই একজনের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় যখন তারা তর্ক করা এড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তে সত্য উপস্থাপন করে বা যখন তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তা গ্রহণ করে। একজন মুসলিমের উচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় অন্যদের সাথে পিছিয়ে যাওয়া এড়ানো উচিত কারণ এটি তর্ক করার একটি বৈশিষ্ট্য। এটি এই সঠিক মানসিকতা যা 16 অধ্যায় আন নাহল, আয়াত 125 এ নির্দেশিত হয়েছে:

"প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার প্রভুর পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সর্বোত্তম..."

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তাদের দায়িত্ব মানুষকে কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য করা নয়। তাদের কর্তব্য হল সত্যকে সহজভাবে উপস্থাপন করা কারণ জোরপূর্বক তর্ক করার বৈশিষ্ট্য।

অন্যরা তাদের মতামতের সাথে একমত না হলে একজন মুসলমানের তাদের সময় নষ্ট করা বা চাপ দেওয়া উচিত নয়। যখন কেউ সময়ের সাথে সাথে এই মতবিরোধকে ধরে রাখে তখন এটি তাদের এবং অন্যদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করতে পারে, যা ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক হতে পারে। এটি এমনকি মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ হতে পারে। সুতরাং এই ধরনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে যেতে দেওয়া এবং তাদের মতামত

এবং পছন্দের সাথে একমত না এমন কারো প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ না করা। এর পরিবর্তে তাদের উচিত অসম্মতিতে সম্মত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে চাপ দেওয়া এবং কোনো অসুস্থ অনুভূতি ছাড়াই পরিস্থিতি থেকে এগিয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে নিজেকে সর্বদা তর্ক করতে এবং অন্যের জন্য শত্রুতা পোষণ করে কারণ তারা তাদের বৈশিষ্ট্য এবং মানসিকতার পার্থক্যের কারণে নির্দিষ্ট বিষয় এবং বিষয়ে অন্যদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য। এই নীতি বোঝা এই পৃথিবীতে শান্তি খোঁজার একটি শাখা।

কর্মের সাথে বিশ্বাস

একজন সাহাবী, শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ, একবার আবু বকরকে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং বর্ণনা করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। দীর্ঘ স্বপ্নটি ইঙ্গিত দেয় যে মহান আল্লাহ আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সিরিয়ায় বিজয় দান করবেন এবং তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। স্বপ্নটি শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং মন্তব্য করলেন যে তিনি সৎকাজের আদেশ দিতে থাকবেন, অসৎকাজে নিষেধ করবেন এবং যারা মহান আল্লাহর হুকুম পরিত্যাগ করবে তাদের প্রতি কঠোর হবেন। তিনি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেন এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে দুর্বলতা বা অলসতাকে কাবু হতে দেবেন না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৬২১-৬২৩-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি কর্মের সাথে নিজের বিশ্বাসকে সমর্থন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। শুধুমাত্র জিহ্বা দিয়ে ঈমান ঘোষণা করা যথেষ্ট নয়।

কুফরী হতে পারে ইসলামকে আক্ষরিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা বা কর্মের মাধ্যমে, যার মধ্যে আল্লাহকে অমান্য করা জড়িত, যদিও কেউ তাকে বিশ্বাস করে। এটি একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যদি একজন অসচেতন ব্যক্তিকে অন্য একটি সিংহের কাছ থেকে সতর্ক করা হয় এবং অসচেতন ব্যক্তি নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ নেয় তবে তারা এমন একজন বলে বিবেচিত হবে যিনি তাদের দেওয়া সতর্কবার্তায় বিশ্বাস করেছিলেন কারণ তারা সতর্কতার ভিত্তিতে তাদের আচরণকে মানিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, যদি অসচেতন ব্যক্তি সতর্ক করার পরে কার্যত তাদের আচরণ পরিবর্তন না করে, তবে লোকেরা সন্দেহ করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত সতর্কীকরণে বিশ্বাস করে না এমনকি যদি অসচেতন ব্যক্তিটি তাদের প্রদত্ত সতর্কতায় মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করে।

কিছু লোক দাবি করে যে তাদের বিশ্বাস এবং তাদের ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য তাদের অন্তরে রয়েছে এবং তাই তাদের বাস্তবিকভাবে এটি প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। দুর্ভাগ্যবশত, এই মূর্খ মানসিকতা অনেক মুসলমানকে সংক্রামিত করেছে যারা বিশ্বাস করে যে তারা বিশুদ্ধ বিশ্বস্ত হৃদয়ের অধিকারী যদিও তারা ইসলামের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যখন কারো অন্তর পবিত্র হয় তখন তার শরীর পবিত্র হয় যার অর্থ তার কর্ম সঠিক হয়। কিন্তু কারো হৃদয় কলুষিত হলে শরীর কলুষিত হয় যার অর্থ তাদের কাজ হবে কলুষিত ও ভুল। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে না, কার্যত তাদের কর্তব্য পালন করে সে কখনো বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করা বাস্তবিকভাবে তাদের প্রমাণ ও প্রমাণ যা বিচার দিবসে জান্নাত লাভের জন্য প্রয়োজন। এই ব্যবহারিক প্রমাণ না থাকাটা একজন ছাত্রের মতোই নির্বোধ যে তার শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে তাদের জ্ঞান তাদের মনে আছে তাই তাদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এটি লিখতে হবে না। নিঃসন্দেহে এই ছাত্রটিও একইভাবে ব্যর্থ হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য ব্যতিরেকে বিচার দিবসে উপনীত হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে, যদিও তাদের বিশ্বাস থাকে। তাদের হৃদয়

রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান

কাউন্সেল চাইছেন

ইরাকে অর্জিত সাফল্যের পর, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। রোমানরা যখন সৈন্যদেরকে ইসলামী জাতির সীমান্তে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা তাদের আক্রমণ করার আগে এটি কেবল সময়ের ব্যাপার। তিনি উর্ধ্বতন সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাঁর চিন্তাভাবনা সম্পর্কে এবং তারা সবাই এই বিষয়ে তাঁর কথা শুনতে ও মানতে রাজি হলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 624-628-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের অবশ্যই আবু বক্করের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, শুধুমাত্র তাদের বিষয়ে কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করে। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতে স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যেমন তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকা হবে, তেমনি একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা।

উপরন্তু, একজন মুসলিম শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

অন্যদের গাইডিং

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করার পর, তিনি ইয়েমেনের মুসলমানদেরকে এই অভিযানে যোগদানের নির্দেশ না দিয়ে উৎসাহিত করে চিঠি পাঠান। তিনি তাদের বাহ্যিক হুমকি থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য তাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং এই সত্য যে মহান আল্লাহ কেবলমাত্র সেই মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হন যারা তাদের কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসের ঘোষণাকে সমর্থন করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬২৮-৬২৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাঁর সারা জীবন ধরে, আবু বক্কর (রাঃ) তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের প্রতি অন্যদের উৎসাহিত করেছেন।

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদেরকে পাপের পথ দেখায় তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্ক হওয়া জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে

মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না শুধুমাত্র এই দাবি করে যে তারা অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন । তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যাতে তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেরা করতে পারে না এমন কাজের জন্য পুরস্কার লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয় অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

দৃঢ় হৃদয়

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করার পর, তিনি ইয়েমেনের মুসলমানদেরকে এই অভিযানে যোগদানের নির্দেশ না দিয়ে উৎসাহিত করে চিঠি পাঠান। তিনি তাদের বাহ্যিক হুমকি থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য তাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং এই সত্য যে মহান আল্লাহ কেবলমাত্র সেই মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হন যারা তাদের কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসের ঘোষণাকে সমর্থন করে। এর প্রতিক্রিয়ায়, ইয়েমেন থেকে অনেক মুসলিম এই অভিযানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েছিলেন। তাদের অনেকেই মদিনায় পৌঁছেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মসজিদে প্রবেশ করার পরে এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শোনার পর এতে উল্লেখিত গভীর অনুপ্রবেশকারী সত্যের কারণে তারা কেঁদে ফেলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুও কেঁদেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তারা পবিত্র কুরআনের প্রতি এভাবেই আচরণ করত কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় শক্ত হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬২৮-৬৩১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মন্তব্যে বিনয়ী ছিলেন, বাস্তবে সাহাবায়ে কেরামের অন্তর পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রতি এতটাই দৃঢ় হয়ে উঠেছিল যে, তা তাদের দিকে পরিচালিত করেছিল। শান্ত ও সমবেত হয়ে ওঠে, যদিও তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় মহান আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ বিনীত ছিল। পবিত্র কুরআন শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের

দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানের শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং এটিকে শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

উপরন্তু, পবিত্র কুরআন শেখা এবং আমল করা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের আলোকে, একটি নরম আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে নিয়ে যায়।

সহীহ বুখারির ৫২ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, কারো আধ্যাত্মিক হৃদয় সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ হয়ে যায় কিন্তু যদি তার আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয় তবে পুরো শরীরই সুস্থ হয়ে যায়। দুর্নীতিগ্রস্ত

প্রথমত, এই হাদিসটি সেই মূর্খ বিশ্বাসকে খণ্ডন করে যেখানে কেউ তার কথা ও কাজ খারাপ হওয়া সত্ত্বেও একটি শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী বলে দাবি করে। কারণ ভিতরে যা আছে তা শেষ পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পাবে।

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের পরিশুদ্ধি তখনই সম্ভব যখন কেউ নিজের থেকে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে এবং ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে তাদের প্রতিস্থাপন করে। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখে এবং তার উপর আমল করে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তাকে। এইভাবে আচরণ করা একটি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করবে। এই শুদ্ধিকরণ তখন শরীরের বাহ্যিক অঙ্গে প্রতিফলিত হবে, যেমন একজনের জিহ্বা এবং চোখ। অর্থ, তারা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি প্রকৃতপক্ষে সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধার্মিক বান্দার প্রতি ভালবাসার একটি চিহ্ন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই শুদ্ধি একজনকে সমস্ত জাগতিক অসুবিধার মধ্যে সফলভাবে পথ দেখাবে যাতে তারা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় সাফল্য অর্জন করতে পারে।

উচ্চতর বেশী

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করার পর, তিনি ইয়েমেনের মুসলমানদেরকে এই অভিযানে যোগদানের নির্দেশ না দিয়ে উৎসাহিত করে চিঠি পাঠান। তিনি তাদের বাহ্যিক হুমকি থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য তাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং এই সত্য যে মহান আল্লাহ কেবলমাত্র সেই মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হন যারা তাদের কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসের ঘোষণাকে সমর্থন করে। এর প্রতিক্রিয়ায়, ইয়েমেন থেকে অনেক মুসলিম এই অভিযানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েছিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকেই মদিনায় পৌঁছেছেন। এই স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে একজন ছিলেন ইয়েমেনের জনগণের ধনী মহীয়সী নেতা, যার নাম ছিল ধিল কিলা। তিনি, বেশিরভাগ ধনী নেতাদের মতো, সুন্দর পোশাক এবং খাবারের মতো বিশ্বের বিলাসিতা উপভোগ করতেন। তিনি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সরল স্বভাবকে লক্ষ্য করলেন। সমগ্র ইসলামী জাতির নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোন সুন্দর পোশাক বা মূল্যবান রত্ন পরিধান করেননি। তিনি যা দেখেছিলেন তা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ঢিল কিলা তার সূক্ষ্ম পোশাক এবং গহনাগুলি সরিয়ে ফেলে এবং সাধারণ পোশাকের সাথে বিনিময় করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬৩১-৬৩৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ধিল কিলা আবূ বক্করকে দেখে তার আচরণ পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন। এটি ইঙ্গিত দেয় যে তিনি তার কর্মের পাশাপাশি তার বক্তৃতার মাধ্যমে ইতিবাচক উপায়ে অন্যদের প্রভাবিত করেছিলেন।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সর্বোত্তম মানুষ তারা যারা অন্যদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন তারা পালন করা হয়।

এটি তাদের উল্লেখ করে না যারা ইসলামিক বাহ্যিক চেহারা গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরিধান করে, কারণ এই লোকেদের অনেকেই অন্যদেরকে আল্লাহ, মহান,কে মোটেও স্মরণ করিয়ে দেন না। এই হাদিসটি তাদের বোঝায় যারা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। তার উপর। এটি একজনের হৃদয়ের পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে যা তাদের বাহ্যিক অঙ্গগুলির পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অন্যরা যখন এই ধার্মিক মুসলমানদের পর্যবেক্ষণ করবে তখন মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে। আর এই স্মরণ তখনই বাড়বে যখন এই ধার্মিক মুসলিমরা কথা বলে যেমন তারা শুধু মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে কথা বলে, অর্থাত্, তারা মন্দ ও অনর্থক কথা পরিহার করে এবং শুধুমাত্র দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য উপকারী বিষয়ে কথা বলে। এই স্মরণ আরও বৃদ্ধি পায় যখন কেউ তাদের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করে যখন তারা কার্যত ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে, অপছন্দ করে, দান করে এবং বন্ধ করে দেয়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার দিকে নিয়ে যায়।

একজন সরল নেতা

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করার পর, তিনি ইয়েমেনের মুসলমানদেরকে এই অভিযানে যোগদানের নির্দেশ না দিয়ে উৎসাহিত করে চিঠি পাঠান। তিনি তাদের বাহ্যিক হুমকি থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য তাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং এই সত্য যে মহান আল্লাহ কেবলমাত্র সেই মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হন যারা তাদের কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসের ঘোষণাকে সমর্থন করে। এর প্রতিক্রিয়ায়, ইয়েমেন থেকে অনেক মুসলিম এই অভিযানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েছিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকেই মদিনায় পৌঁছেছেন। এই স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে একজন ছিলেন ইয়েমেনের জনগণের ধনী মহীয়সী নেতা, যার নাম ছিল ধিল কিলা। তিনি, বেশিরভাগ ধনী নেতাদের মতো, সুন্দর পোশাক এবং খাবারের মতো বিশ্বের বিলাসিতা উপভোগ করতেন। তিনি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সরল স্বভাবকে লক্ষ্য করলেন। সমগ্র ইসলামী জাতির নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোন সুন্দর পোশাক বা মূল্যবান রত্ন পরিধান করেননি। তিনি যা দেখেছিলেন তা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ঢিল কিলা তার সূক্ষ্ম পোশাক এবং গহনাগুলি সরিয়ে ফেলে এবং সাধারণ পোশাকের সাথে বিনিময় করে। যখন তাঁর লোকেরা সাহাবায়ে কেরামের সামনে তাদের বিব্রত করার জন্য তাঁর সমালোচনা করেছিল, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে তারা কি তার জন্য একজন অত্যাচারীর মতো জীবনযাপন করতে চায়, যেমনটি তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, মহান আল্লাহর আনুগত্য কেবল নম্রতা এবং জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। ইয়েমেনের অন্যান্য ধনী নেতাদের অনেকেই তার আচরণ অনুসরণ করেছিলেন এবং তাদের দামী পোশাক মুসলমানদের সরকারি কোষাগারে ভর্তি করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬৩১-৬৩৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে তত কম তারা পার্থিব জিনিসের উপর চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি আখেরাতের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে তারা তত বেশি চাপ দেবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে একটি কঠিন ও কঠিন জবাবদিহিতার দিকে নিয়ে যাবে।

সহীহ বুখারী, ২৮৮৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ও সুন্দর পোশাকের দাসদের সমালোচনা করেছেন। এসব মানুষ পেলে খুশি হয় আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, এটি সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সমালোচনা তাদের প্রতি নির্দেশিত নয় যারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য জড় জগতে সংগ্রাম করে কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ। কিন্তু এটা তাদের দিকেই নির্দেশিত যারা হয় সম্পদ ও অন্যান্য পার্থিব জিনিস অর্জনের জন্য হারামের পেছনে ছুটছে তাদের কামনা-বাসনা এবং অন্যের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। এবং এটি তাদের জন্য নির্দেশিত যারা অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসগুলিকে এমনভাবে অনুসরণ করে যে এটি তাদের সঠিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে অবহেলা করে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি তাদের পরকাল এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখে।

উপরন্তু, এই সমালোচনা তাদের জন্য যারা অধৈর্য হয় যখন তারা এই দুনিয়ায় তাদের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা অর্জন করে না। এই মনোভাব একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। অর্থ, যখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অর্জন করে তখন তারা তাঁর আনুগত্য করে কিন্তু যখন তারা তা পায় না তখন তারা তাঁর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করবে তার জন্য পবিত্র কুরআন উভয় জগতেই মারাত্মক ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করেছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

মুসলমানদের বরং ধৈর্য্য ও সন্তুষ্ট থাকতে শেখা উচিত তাদের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে কারণ সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিস অনুযায়ী এটাই সত্যিকারের ঐশ্বর্য। বাস্তবে, আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ব্যক্তি হল অভাবী অর্থ, দরিদ্র যদিও তার কাছে অনেক সম্পদ আছে। একজন মুসলমানের আল্লাহকে জানা উচিত, মহান, মানুষকে তাদের জন্য সর্বোত্তম কী দান করেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নয় কারণ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

“আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

মহৎ উপদেশ

ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নেতৃত্বে সিরিয়ায় পাঠানো আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চারটি সৈন্যবাহিনীর একজন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু, বিদায় নেওয়ার সময় তাঁর পাশে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 634-635-এ আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি প্রথমে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি তার যোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য তাকে নেতা নিয়োগ করছেন। যদি তিনি ভাল করেন তবে তিনি তার অবস্থান বজায় রাখবেন এবং আরও দায়িত্ব দেওয়া হবে। তবে খারাপ কাজ করলে তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

যদিও ইয়াযীদ, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, কুরাইশ গোত্রের একজন প্রবীণ সদস্য ছিলেন, একই গোত্র মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও কম নয়, তাঁর সাথে তাঁর যোগ্যতার ভিত্তিতে আচরণ করা হয়েছিল, তাঁর নয়। বংশ এটি ইসলামে সমতার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোনো কাজ করার সময় একজন মুসলিমকে সর্বদা তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা উচিত, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের পুরস্কৃত করবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করবে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলিম সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে এই ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের থেকে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়ার অর্থ, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাই একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যে তার অধিকার এবং মানুষের অধিকার পূরণের মাধ্যমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের কিছু আছে বা তাদের আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা । বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এরপরের বিষয় আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি সর্বদা মহান আল্লাহকে ভয় করতে হবে, যেমন তিনি একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখেন যেমন তিনি তার বাহ্যিক অবস্থা দেখেন।

মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ নিয়ত ও অনুভূতি এবং তার বাহ্যিক কাজকর্ম সহ সকল বিষয়েই পূর্ণ অবগত।

যে মুসলিম এটা বোঝে তারা নিশ্চিত করবে যে তারা কেবল সৎ কাজই করবে না বরং সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে করবে এটা জেনে যে তারা মানুষকে বোকা বানাতে পারবে কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন এবং তাদের জবাবদিহি করবেন। এটা অনুযায়ী

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে উপকারী পার্থিব ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার চেষ্টা করে এই

ঐশী নামের উপর আমল করতে হবে। উপরন্তু, তারা ক্রমাগত তাদের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অবস্থা তদারকি করতে হবে। এর মাধ্যমে তারা তাদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তা সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হবে। একজন মুসলিম তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে গাফেল থাকা উচিত নয়। এর পরিবর্তে তাদের উচিত পূর্ণ সচেতনতার সাথে জীবনযাপন করা এবং তাই মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহর নিকটতম ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর প্রতি সর্বাধিক আনুগত্যশীল এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেছেন।

সহীহ বুখারী নং 6502-এ পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর একটি ঐশী হাদিসে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, যখন কেউ বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে এবং স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজ সম্পাদনে প্রচেষ্টা চালায়, মহান আল্লাহ, তাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে আশীর্বাদ করে যাতে তারা তার আনুগত্যের জন্য তাদের ব্যবহার করে। এই নেক বান্দা খুব কমই পাপ করবে। দিকনির্দেশনার এই বৃদ্ধি 29 অধ্যায় আল আনকাবুত, 69 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

এই মুসলিম শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তখন হয় যখন একজন মুসলিম কাজ করে,

যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে। যারা এই স্তরে পৌঁছেছে সে তাদের মন ও শরীরকে পাপ থেকে রক্ষা করবে। এই সেই ব্যক্তি যে যখন তারা কথা বলে তারা মহান আল্লাহর জন্য কথা বলে, যখন তারা চুপ থাকে তারা মহান আল্লাহর জন্য নীরব থাকে। যখন তারা কাজ করে তখন তারা তার জন্য কাজ করে এবং যখন তারা এখনও থাকে তারা তার জন্য। এটি একেশ্বরবাদের একটি দিক এবং মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, এই মুসলিমের দোয়া পূর্ণ হবে এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যারা হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করে তাদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট শিক্ষা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাদের প্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিত নয়। কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষক বা অন্য কেউ একজন ব্যক্তিকে জিনিস প্রদান করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে এবং সেগুলি অর্জন করার জন্য তাদের ভাগ্য থাকে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, প্রাক-ইসলামিক জাহেলিয়াতের পথে ফিরে যাবেন না, কারণ মহান আল্লাহ সেই পথ এবং সেই পথ অনুসরণকারী লোকদের ঘৃণা করেন।

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলিম তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার এই দুটি সূত্রের ভিত্তি নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে এই দুটি দিকনির্দেশনার উত্স শিখতে এবং কাজ করতে মুসলিমদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই দুটি পথ নির্দেশনা শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে এবং শুধুমাত্র তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকাজের উপর কাজ করতে হবে যদি তাদের সময় ও শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাঁকে উপদেশ দেন যে যখন তিনি সিরিয়ায় তাঁর সৈন্যদের কাছে পৌঁছান, তখন তিনি যেন তাদের ভালো সঙ্গী হন।

এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যেভাবে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়। সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে।

এর মানে এই নয় যে, এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে একজন মুসলমান তাদের ঈমান হারাবে। এর অর্থ হল, যতক্ষণ না তারা এই উপদেশের উপর আমল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমের ঈমান পূর্ণ হবে না। এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিম তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। এটি সহীহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত, নম্বর 6586। এটি পরামর্শ দেয় যে মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের একটি অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ ব্যথা ভাগ করে নেয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণা করা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে।

একজন মুসলিম তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে। এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভাল কামনা করতে বাধ্য করবে। সুতরাং বাস্তবে এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে, ক্ষমাশীল হওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষের মতো মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যের জন্য ভালো চাওয়া তাদের ভালো জিনিস থেকে হারিয়ে যেতে পারে। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য ভাল কামনা করার মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন আর্থিক বা মানসিক সমর্থন, যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করতে চান। অতএব, এই ভালবাসা কেবল কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে। এমনকি যখন একজন মুসলিম মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং অন্যের ইচ্ছার পরিপন্থী উপদেশ দেয় তখন তাদের উচিত এমনভাবে করা উচিত যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সদয় উপদেশ দিক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি পারস্পরিক ভালবাসা এবং যত্নের বিরোধিতাকারী সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন হিংসা। ঈর্ষা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদের অধিকারী হতে চায় যা শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন তা অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নিয়ামত বিতরণের জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ এবং হিংসাকারীর নেক আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুনান আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যের কাছে থাকা হালাল জিনিসগুলি কামনা করতে হয় তবে তাদের উচিত অন্য ব্যক্তিকে না হারিয়ে একই বা অনুরূপ জিনিস দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা উচিত। আশীর্বাদ। এই ধরনের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তিকে হিংসা করা উচিত যে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির

প্রতি ঈর্ষান্বিত হন যিনি তাদের জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারে ব্যবহার করেন।

একজন মুসলমানের উচিত শুধু অন্যের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য নয় বরং উভয় জগতের ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্যও ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার জন্য আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করে। এই ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা ইসলামে স্বাগত জানানো হয়েছে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 26:

"... সুতরাং এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই অনুপ্রেরণা একজন মুসলিমকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করতে এবং দূর করার জন্য নিজেদের মূল্যায়ন করতেও অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই দুটি উপাদান অর্থকে একত্রিত করে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

তাই একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসার দাবি করা উচিত নয় বরং তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাতে হবে। আশা করা যায় যে এইভাবে অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন সে উভয় জগতে

মহান আল্লাহর উদ্বেগ লাভ করবে। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাঁকে উপদেশ দেন যে, তিনি যখন তাঁর সৈন্যদের উপদেশ দেন, তখন তিনি যেন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কেননা কথার প্রকৃতি এমন যে, শ্রোতাকে এর কিছু অংশ ভুলে যায়।

প্রতিটি ইসলামিক বক্তৃতা একটি সংক্ষিপ্ত এবং দরকারী বার্তা প্রদান করা উচিত. দুর্ভাগ্যবশত , কেউ কেউ শুধুমাত্র সেই সমাবেশে যোগ দেয় যা গল্প বলার সমন্বয়ে গঠিত কোন বাস্তব উদ্দেশ্য এবং অর্থ ছাড়া. এই সমাবেশগুলি শুধুমাত্র ফুলের কিন্তু অর্থহীন বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে খুশি করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। কিছু লেকচারার ভুলভাবে বিশ্বাস করেন যে সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের শ্রোতাদের ঘন্টার মূল্যের তথ্য প্রদান করতে হবে। কিন্তু তারা কিছু ভাল শব্দ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যা দর্শকদের উন্নতির দিকে অনুপ্রাণিত করে অনেক ভালো। একটি সমাবেশ তখনই কার্যকর হয় যখন শ্রোতারা নিজেদের সংস্কারের আন্তরিক অভিপ্রায় নিয়ে চলে যায়। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন যে বিশ্বাসের বাণী ছড়িয়ে দিতে চায় তাকে মৌলিক বিষয়ের উপর কাজ করার আগে নতুন ধারণা এবং ধারণা অনুসন্ধানের ভুল মনোভাব থেকে দূরে সরে যেতে হবে।

আবু বক্কর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, তারপর তাকে পরামর্শ দিলেন যে তিনি নিজেকে উন্নত করতে হবে এবং এর ফলে তার চারপাশের লোকেরাও উন্নতি করবে।

সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তারা অন্যদেরকে যা পরামর্শ দেয় তার উপর আমল করা। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা তাদের প্রচারের উপর কাজ করেছিল তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেয়নি। সর্বোত্তম উদাহরণ হ'ল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি কেবল যা প্রচার করেছিলেন তা অনুশীলন করেননি বরং সেই শিক্ষাগুলি অন্য কারও চেয়ে কঠোরভাবে মেনে চলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের সাথে মুসলমানদের বিশেষ করে, পিতামাতারা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করে কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে মিথ্যা বলে তার সন্তানরা তার পরামর্শে কাজ করার সম্ভাবনা কম। একজন ব্যক্তির কর্ম সবসময় তার বক্তব্যের চেয়ে অন্যদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তবে সে নিজেই তার উপর আমল করে। কঠিন শাস্তি জাহান্নামে. অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশের উপর নিজে আমল করার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক এবং অন্যদেরকেও তা করার পরামর্শ দেওয়া। দৃষ্টান্ত দ্বারা

নেতৃত্ব দেওয়া হল সমস্ত নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য, এবং অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছেন যে, তাকে অবশ্যই ফরয নামায তাদের সময়ে আদায় করতে হবে এবং সেগুলি পরিপূর্ণতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে এবং সে সময় সতর্ক থাকতে হবে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, এই পরামর্শটি যুদ্ধের সময় দেওয়া হয়েছিল, যখন যে কোনও মুহূর্তে শত্রু আক্রমণ হতে পারে।

জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল ফরজ নামায ত্যাগ করা।

এই দিন এবং যুগে এটি অনেক বেশি সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেকে তুচ্ছ কারণে তাদের ফরজ নামাজ ত্যাগ করে যা নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত। যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত তার জন্য যদি নামাযের ফরজ বাদ না দেওয়া হয় তবে তা অন্য কারো থেকে কিভাবে সরানো যাবে? অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 102:

"এবং যখন আপনি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর কমান্ডার] তাদের মধ্যে থাকবেন এবং তাদের নামাযে নেতৃত্ব দেবেন, তখন তাদের একটি দল আপনার সাথে [প্রার্থনায়] দাঁড়াবে এবং তাদের অস্ত্র বহন করুক। এবং যখন তারা সেজদা করে,

তখন তাদের আপনার পিছনে [অবস্থানে] থাকতে দিন এবং অন্য দলটিকে এগিয়ে আসতে দিন যারা [এখনও] নামায পড়েনি এবং তারা সতর্কতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে আপনার সাথে সালাত আদায় করুক..."

মুসাফির বা অসুস্থ কেউই তাদের ফরয নামায পড়া থেকে রেহাই পায় না। মুসাফিরকে তাদের জন্য বোঝা কমানোর জন্য কিছু ফরজ নামাজে চক্রের পরিমাণ কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা সেগুলি নামায থেকে রেহাই পায়নি। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 101:

"এবং যখন আপনি সারা দেশে ভ্রমণ করেন, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করার জন্য আপনার উপর কোন দোষ নেই.."

অসুস্থদের শুকনো অযু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যদি পানির সংস্পর্শে তাদের ক্ষতি হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 6:

"...তবে যদি তুমি অসুস্থ হও বা সফরে থাকো বা তোমাদের মধ্যে কেউ স্বস্তির স্থান থেকে আসে বা নারীদের সাথে যোগাযোগ করে পানি না পেয়ে, তাহলে পরিষ্কার মাটির সন্ধান করো এবং তা দিয়ে তোমার মুখমন্ডল ও হাত মুছে ফেলো..."

এছাড়াও, অসুস্থ ব্যক্তিরা ফরজ সালাত এমনভাবে আদায় করতে পারে যা তাদের পক্ষে সহজ। অর্থ দাঁড়াতে না পারলে তাদের বসতে দেওয়া হবে এবং

বসতে না পারলে শুয়ে ফরজ নামাজ পড়তে পারবে। জামে আত তিরমিযী, 372 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আবার, অসুস্থ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয় না যদি না কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয় যা তাদের নামাযের বাধ্যবাধকতা বুঝতে বাধা দেয়।

অন্য প্রধান সমস্যা হল যে কিছু মুসলমান তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে এবং তাদের সঠিক সময়ের পরে আদায় করে। এটা পরিষ্কারভাবে পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে কারণ বিশ্বাসীদেরকে তাদের ফরজ নামাজ যথাসময়ে আদায়কারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 103:

"... অবশ্যই, মুমিনদের উপর নামায ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।"

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি তাদের নির্দেশ করে যারা অকারণে তাদের ফরজ নামাজে বিলম্ব করে। তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড 10, পৃষ্ঠা 603-604-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 107 আল মাউন, আয়াত 4-5:

"অতএব যারা নামাজ পড়ে তাদের জন্য দুর্ভোগ। [কিন্তু] যারা তাদের নামাযের প্রতি উদাসীন।"

এখানে যারা এই মন্দ স্বভাব অবলম্বন করেছে তাদের উপর মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে অভিশাপ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকলে দুনিয়া বা পরকালে সফলতা কিভাবে পাওয়া যাবে?

সুনানে আন নাসাই নং 512-এ পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, ফরয নামায অকারণে বিলম্বিত করা মুনাফিকির লক্ষণ। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ হল ফরজ নামাজ আদায়ে ব্যর্থ হওয়া। অধ্যায় 74 আল মুদ্দাত্থির, আয়াত 42-43:

"[এবং তাদের জিজ্ঞাসা], "কি আপনাকে সাকারে ফেলেছে?" তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

ফরয নামায ত্যাগ করা এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যে, জামে আত তিরমিযী, ২৬২১ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, যে এ পাপ করবে সে ইসলামে কাফের।

উপরন্তু, অন্য কোন নেক আমল একজন মুসলিমকে উপকৃত করবে না যতক্ষণ না তাদের ফরজ নামাজ কায়েম হয়। সহীহ বুখারি, 553 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যদি কেউ দুপুরের ফরজ সালাত মিস করে তাহলে তার নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। যদি একটি ফরজ নামায পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে এমন হয় তাহলে কি সবগুলো পরিত্যাগের শাস্তি কল্পনা করা যায়?

সহীহ মুসলিমের ২৫২ নম্বর হাদিসে সঠিক সময়ে ফরয নামায পড়াকে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে নির্ণয় করা যায় যে, ফরয নামাযকে সময় অতিক্রম করতে বিলম্ব করা বা ফরয নামায আদায় করা। তাদের সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত মহান আল্লাহ দ্বারা সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ এক.

তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করা সকল প্রবীণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাতে তারা তাদের উপর আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই তা প্রতিষ্ঠা করে। যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা এটি বিলম্বিত করে এবং বাচ্চাদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ব্যর্থ হয়েছে। যে শিশুদের শুধুমাত্র ফরয নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল যখন এটি তাদের উপর ফরয হয়ে যায় তারা খুব কমই তাদের দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে তাদের কয়েক বছর লেগে যায়। আর দোষটা পড়ে পরিবারের বড়দের, বিশেষ করে বাবা-মায়ের ওপর। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ফরজ নামাজ পড়তে উত্সাহিত করে।

অন্য একটি বড় সমস্যা যা অনেক মুসলমানের মুখোমুখি হয় তা হল তারা ফরজ নামাজ পড়তে পারে কিন্তু সঠিকভাবে করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, অনেকে নামাজের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না এবং এর পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 757 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ পড়ে সে আদৌ নামাজ পড়েনি। অর্থ, তারা তাদের সালাত আদায়কারী ব্যক্তি হিসাবে লিপিবদ্ধ নয় এবং

তাই তাদের বাধ্যবাধকতা পূর্ণ হয়নি। জামে আত তিরমিযী, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতিটি অবস্থানে স্থির থাকে না তার দোয়া কবুল হয় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি নামাজে সঠিকভাবে রুকু বা সেজদা করে না তাকে নিকৃষ্ট চোর বলে বর্ণনা করেছেন। মুওয়াত্তা মালিক, বই নম্বর 9, হাদিস নম্বর 75-এ পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা তাদের ফরজ এবং অনেক স্বেচ্ছায় নামাজ আদায় করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করেছে তারা দেখতে পাবে যে তাদের কেউই গণনা করেনি এবং এইভাবে তারা হবে। যারা তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করেনি তাকে হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 1313 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন সাধারণত একটি মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ পড়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 43:

"... আর রুকু কর তাদের সাথে যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে]।

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের কারণে কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের জন্য এটিকে ফরজ ঘোষণা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে আবু দাউদ, 550 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে সমস্ত মুসলিমরা

মসজিদে জামাতের সাথে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করবে না তাদেরকে সাহাবীগণ মুনাফিক বলে গণ্য করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি কোনো বৈধ অজুহাত ছাড়াই মসজিদে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ পুরুষদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এটি সহীহ মুসলিম, 1482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যে সমস্ত মুসলিমরা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তাদের এই দাবি করা উচিত নয় যে তারা অন্য ধার্মিক কাজ করছে যেমন তাদের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করা। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি রেওয়ায়েত, তবে তার রেওয়ায়েতের গুরুত্বকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস না করা গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি এটি করে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করে না তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসরণ করছে যদিও তারা একটি সৎ কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিস উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে যখন ফরয সালাতের সময় হবে তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাঁকে উপদেশ দেন যে, তিনি যখন অন্যের পরামর্শ চান, তখন তাঁর কথাবার্তায় সত্যবাদী হতে হবে এবং ফলস্বরূপ তাঁকে সত্যবাদী পরামর্শ দেওয়া হবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সত্যবাদিতা অবলম্বন করা একজন ব্যক্তির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব

সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। অধিকাংশ মৌখিক পাপ সংঘটিত হয় কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের

আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

আবু বক্কর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন নেতা হিসাবে, যারা এটি প্রাপ্য তাদের শাস্তি দিতে তিনি অবশ্যই ভয় পাবেন না।

সমাজ বিমুখ হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করেছে। সহীহ বুখারি 6787 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের শাস্তি দিত যখন তারা আইন ভঙ্গ করত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নিজের মেয়ে অপরাধ করলে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি কার্যকর করবেন। যদিও সাধারণ জনগণের সদস্যরা তাদের নেতাদের তাদের ক্রিয়াকলাপে ঠিক থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে তবে তারা তাদের সমস্ত লেনদেন এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 3544 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথে লেনদেন করুক না কেন তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ স্বতন্ত্র স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে তবে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী অবস্থানে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা চান বা না চান তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবে।

আবু বক্কর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, তারপর তাকে পরামর্শ দিলেন যে তিনি কখনই তার সৈন্যদের গুপ্তচরবৃত্তি করবেন না বা তাদের গোপনীয়তা প্রকাশ করবেন না। তার সৈন্যরা তাকে বাহ্যিকভাবে যা দেখিয়েছে তাতে তার বরং সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

মহান আল্লাহ তায়ালা যে দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রেখেছেন তা উদঘাটনের জন্য অন্যের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করা একটি বড় পাপ। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"... এবং গুপ্তচরবৃত্তি করবেন না ..."

সহীহ বুখারীর ৭০৪২ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কেউ অন্যের উপর গোয়েন্দাগিরি করে, যেমন তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথন সহজে ছেড়ে দেওয়া, তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। বিচার দিবস।

মুসলমানদের বোঝা উচিত যে, মহান আল্লাহ যদি সর্বজ্ঞ, তবুও অন্যের দোষ গোপন করে থাকেন, তাহলে সীমিত ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী মুসলমানদের তাদের দোষ এবং ব্যক্তিগত বিষয় উদঘাটনের উদ্দেশ্যে অন্যদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি উন্মোচন করে, মহান আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 2546 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিবর্তে মুসলিমদের

উচিত এই হাদীসের অন্য অংশের উপর আমল করা যা অন্যের দোষ গোপন করা যাতে মহান আল্লাহ তাদের দোষ গোপন করেন।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাকে উপদেশ দিলেন যে, সে যেন মূর্খ লোকদের সাথে না যায় যারা তাদের সময় নষ্ট করে। পরিবর্তে, তিনি সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গী করা উচিত।

সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে তাকে তাদের একজন হিসাবে গণ্য করা হয়।

সমস্ত মুসলিম তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে গণনা করতে এবং পরবর্তী পৃথিবীতে ধার্মিকদের সাথে শেষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, একজন মুসলমান কেবলমাত্র একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তাদের সাথে শেষ পর্যন্ত হবে যদি তারা ধার্মিকদের অনুকরণ করে। এই অনুকরণ একটি ব্যবহারিক জিনিস শুধু শব্দের মাধ্যমে ঘোষণা নয়। এই অনুকরণটি মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে সঠিকভাবে করা হয়।

কিন্তু যারা মৌখিকভাবে ধার্মিকদের প্রতি তাদের ভালবাসা ঘোষণা করে এবং তাদের অনুকরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে মুনাফিক এবং পাপীদের মধ্যে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুকরণ করে তাদের একজন হিসাবে বিবেচিত

এবং বিচার করা হবে। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের বিশ্বাস হারাবে তবে এর অর্থ তাদের অবাধ্য মুসলমান হিসাবে বিচার করা হবে। কিভাবে একজন অবাধ্য মুসলমানকে একজন আজ্ঞাবহ মুসলমান হিসাবে গণ্য করা যায় এবং ধার্মিকদের সাথে শেষ করা যায়? এটা শুধুমাত্র ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা যার ইসলামে কোন মূল্য নেই। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 20:

"জাহান্নামের সঙ্গী এবং জান্নাতের সাথী সমান নয়। জান্নাতের সাথী- তারাই [সাফল্যের]।

আবু বক্কর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর তাকে পরামর্শ দিলেন যে তিনি যখন শত্রুর মোকাবেলা করবেন তখন তাকে আন্তরিক এবং সত্য হতে হবে।

এটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের ভিতরের শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়, তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু

তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলিম এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র প্রদান করা হয় যাকে পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাঁকে উপদেশ দিলেন যে, তিনি যেন কাপুরুষ আচরণ না করেন, অন্যথায় তাঁর সৈন্যরাও কাপুরুষ আচরণ করবে।

সুনানে আবু দাউদ, 2511 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কাপুরুষ আচরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। এই মনোভাব মহান আল্লাহ, এবং তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমন একজনের নিশ্চিত বিধানের উপর আস্থা রাখতে বাধা দেয়। এটি সন্দেহজনক এবং বেআইনি উপায়ে তাদের বিধান অনুসন্ধান করতে পারে যা উভয় জগতের একজন ব্যক্তিকে ধ্বংস করবে। মহান আল্লাহ এমন কোন কাজ কবুল করেন না যার ভিত্তি হারাম। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, কাপুরুষ হওয়া একজনকে শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বাধা দেয় এবং একজনের অভ্যন্তরীণ শয়তান যার জন্য প্রকৃত সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। এটি একজনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এবং তাই এটি তাদের জনগণের অধিকার পূরণে বাধা দেবে। পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা এবং সময় প্রয়োজন। একজন কাপুরুষ এই সংগ্রাম করতে খুব ভয় পাবে এবং পরিবর্তে অলস হবে যা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়।

আবু বক্কর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন, তারপর তাকে উপদেশ দেন যে যুদ্ধের গনীমত থেকে তাকে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ এটি একজনকে দারিদ্র্যের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং বিজয়কে প্রতিহত করে।

সাধারণভাবে বলা যায়, হারাম ব্যবহার করা একটি বড় পাপ। এর মধ্যে রয়েছে বেআইনি সম্পদ ব্যবহার, বেআইনি জিনিস ব্যবহার করা এবং বেআইনি খাবার খাওয়া। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে নির্দিষ্ট জিনিসগুলিকে ইসলাম হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে যেমন অ্যালকোহল শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলিই হারাম

নয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি হালাল জিনিসগুলিও হারাম হয়ে যেতে পারে যদি সেগুলি হারাম জিনিসের মাধ্যমে লাভ করা হয়। যেমন, হালাল খাদ্য হারাম হয়ে যেতে পারে যদি তা হারাম সম্পদ দিয়ে কেনা হয়। তাই, মুসলমানদের জন্য এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কেবলমাত্র হালাল জিনিসগুলির সাথেই লেনদেন করে কারণ এটি কাউকে ধ্বংস করতে হারামের একটি উপাদান লাগে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সহীহ মুসলিম, 2346 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি হারাম ব্যবহার করবে তার সমস্ত প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হবে। যদি তাদের দোয়া মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে কি তাদের কোনো ভালো কাজ কবুল হওয়ার আশা করা যায়? প্রকৃতপক্ষে এর উত্তর সহীহ বুখারি, 1410 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদীসে পাওয়া গেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহই কেবল হালালকে গ্রহণ করেন। অতএব, অবৈধ সম্পদের সাথে পবিত্র তীর্থযাত্রা করার মতো যে কোনো কাজ যা হারামের ভিত্তি রয়েছে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 3118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, বিচারের দিন এই ধরনের ব্যক্তিকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

" এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না বা শাসকদের কাছে [ঘুষের মাধ্যমে] পাঠাও না যাতে [তারা সাহায্য করতে পারে] জনগণের সম্পদের একটি অংশ পাপে ভোগ করতে, যদিও তোমরা জান [এটি অবৈধ।]"

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পরের কথাটি ছিল যে, তিনি যেন অন্যায়ভাবে যুদ্ধের গনীমত থেকে গ্রহণ না করেন, কারণ এটি একজনকে দারিদ্র্যের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং বিজয় থেকে রক্ষা করে।

সফলতা স্মৃতিতে নিহিত

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, সিরিয়ায় প্রেরিত চার বাহিনীর একজনের নেতৃত্বে ছিলেন শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বিদায়ের সময় তাঁর পাশে গিয়েছিলেন এবং ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা তাঁকে দিয়েছিলেন, তবে তিনি আরও যোগ করেছেন যে যুদ্ধের সময়ও তাঁকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। মহান আল্লাহ, প্রতিনিয়ত এবং সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতিতে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬৪০-৬৪১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারির ৬৪০৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য জীবিত ব্যক্তির মতো। একটি মৃত ব্যক্তি।

যারা মহান আল্লাহর সাথে একটি দৃঢ় সংযোগ তৈরি করতে চায় তাদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা এই দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলভাবে আল্লাহকে যতটা সম্ভব স্মরণ করতে পারে। সহজ কথায়, তারা যত বেশি তাকে স্মরণ করবে ততই তারা এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করবে।

মহান আল্লাহর স্মরণের তিনটি স্তরে কার্যত আমল করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। প্রথম স্তর হল মহান আল্লাহকে অন্তরে ও নীরবে স্মরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে

খুশি করার জন্য কাজ করে। দ্বিতীয়টি হল জিহ্বা দ্বারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে বন্ধন দৃঢ় করার সর্বোচ্চ ও কার্যকরী উপায় হল কার্যতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাঁকে স্মরণ করা। তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। এর জন্য একজনকে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে হবে যা উভয় জগতের সকল কল্যাণ ও সাফল্যের মূল।

যারা প্রথম দুই স্তরে থাকবে তারা তাদের নিয়তের উপর নির্ভর করে পুরষ্কার পাবে কিন্তু তারা আল্লাহর স্মরণের তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই।

এই পর্যায়গুলি উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের চাবিকাঠি। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় যে চারটি সৈন্য প্রেরিত হয়েছিল তার একজনের নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রা.)। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকেও সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন যা তিনি ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে দিয়েছিলেন, যা ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৬৪১-এ আলোচনা করা হয়েছে। 642।

কিন্তু তিনি যোগ করেছেন যে তাকে ভাল উপদেশ মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত, এর মাধ্যমে তাকে দেওয়া আদেশগুলি কার্যকর করার ইচ্ছা রয়েছে।

যদিও, সময়ের সাথে সাথে প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তথ্য অ্যাক্সেস করা সহজ হয়েছে তবুও মুসলিমদের শক্তি কেবল দুর্বল হয়েছে। এর একটি কারণ হল যে অনেক মুসলিম এমন একটি মানসিকতা গ্রহণ করেছে যা তাদের ইসলামিক জ্ঞান শেখা এবং তার উপর কাজ করতে বাধা দিয়েছে, তারা বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান শোনাই সফল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এটি শয়তানের একটি ফাঁদ এবং এটি সাহাবায়ে কেরামের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি এবং সৎ পূর্বসূরিদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা শুধু ধর্মীয় জ্ঞানই শোনেননি বরং তারা যে জ্ঞান শুনেছেন তার উপর আমল করার মাধ্যমে তারা এই অভিপ্রায়কে পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। এভাবে কাজ না করার ফলে মুসলমানদের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই কারণেই কিছু মুসলিম কয়েক দশক ধরে ধর্মীয় সমাবেশে এবং আলোচনায় যোগদান করেছে, তবুও এর উন্নতি হয়নি। এই মনোভাবের বিপদ হল যে শেষ পর্যন্ত লোকেরা এই বিশ্বাস করে নীচে নেমে যাবে যে তারা ধর্মীয় শিক্ষা শোনা বা আমল করার প্রয়োজন ছাড়াই কেবল তাদের জিহ্বা দিয়ে ইসলাম ঘোষণা করতে পারে।

মুসলমানদেরকে তাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে অজ্ঞতা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে যা তাদেরকে কেবল ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

আবু বক্কর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, আরও যোগ করেছেন যে যখন সত্য আসে তখন তার উচিত সবার সাথে সমান আচরণ করা।

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলিম জাতি ও গোষ্ঠী সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব গ্রহণ করেছে এবং কিছু লোককে এই গোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলিম যত বেশি মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তার নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তারা তত বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলিমদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে।

হযরত আবু বক্কর (রাঃ) আরও যোগ করেছেন যে তিনি সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে, কারণ তিনিই তার জন্য একজন সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট।

যদিও, মানুষের প্রতি আশা রাখা কোন পাপ নয়, কিন্তু তারা অসিদ্ধ হওয়ায় একজন মুসলিম সর্বদা হতাশ হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে, আসলে এটা অবশ্যম্ভাবী। বরং তাদের উচিত মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার চেষ্টা করা। এটি কেবলমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয় একজন মুসলিম যে অবাধ্য সে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করবে না। তখন তাদের উচিত তাদের কাছ্ থেকে বিনিময়ে কোনো কিছুর আশা বা আশা না করে সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা। এটি তাদের উপর নির্ভরতা দূর করতে সহায়তা করবে। মহান আল্লাহ একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে সঠিকভাবে তাঁর উপর নির্ভর করবে, সে উভয় জগতের সমস্ত সমস্যা থেকে যথেষ্ট হবে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

যেমন মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকেন, যখন কেউ তাঁর উপর নির্ভর করে, তখন তারাও অটল ও অটল হয়ে ওঠে যখন অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু যদি তারা এমন লোকদের উপর নির্ভর করে যারা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনের প্রবণতা রাখে তারা চঞ্চল হয়ে উঠবে এবং অবিচল থাকতে ব্যর্থ হবে।

একজনের সাহায্যকারী এবং আশ্রয় যত শক্তিশালী হবে তারা তত শক্তিশালী হবে। যদি একজন মুসলমান আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন, যিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান, তারা সমস্ত

অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। কিন্তু যদি তারা আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এমন লোকদের উপর নির্ভর করে, যারা তাদের স্বভাবে দুর্বল, তারাও অসুবিধার মুখে দুর্বল হয়ে পড়বে। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে ঝড়ের সময় একটি শক্তিশালী দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং অন্য একজন যে খড়ের কুঁড়েঘরে আশ্রয় নেয়। কে সফলভাবে ঝড়ের অসুবিধা কাটিয়ে উঠার সম্ভাবনা বেশি তা নির্ধারণ করতে কোনও প্রতিভা লাগে না।

আবু বক্কর (রাঃ) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তার সর্বদা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত, কারণ তিনি একজন অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট।

জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে। অথচ মূর্খ ইচ্ছুক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে এবং তারপর মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের ইচ্ছা পূরণের প্রত্যাশা করে।

মুসলমানদের জন্য এই দুটি মনোভাবকে বিভ্রান্ত না করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা একটি ইচ্ছাপ্রসূত চিন্তাবিদ হিসাবে বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু এড়াতে পারে কারণ এই ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বা পরের জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা এমন একজন কৃষকের মতো যে রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়, বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হয়, জমিতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারপরে একটি বিশাল ফসলের আশা করে। এটি সাধারণ মূর্খতা এবং এই কৃষকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যেখানে, প্রকৃত আশা হল একজন

কৃষকের মত যে জমি প্রস্তুত করে, বীজ রোপণ করে, জমিতে জল দেয় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের একটি বিশাল ফসলের আশীর্বাদ করবেন। মূল পার্থক্য হল যে প্রকৃত আশার অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে। তার উপর। এবং যখনই তারা পিছলে যায় তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে না, বরং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করবে এবং তবুও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলে আশা করবেন।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মূল পার্থক্যটি শিখতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশা গ্রহণ করতে পারে, যা সর্বদা উভয় জগতেই ভাল এবং সাফল্য ছাড়া কিছুই নিয়ে যায় না। সহীহ বুখারী, ৭৪০৫ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ধরনের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা যা অতীতের জাতি এবং এমনকি মুসলিম জাতিকে প্রভাবিত করেছিল যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে এবং বিচারের দিনে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের রক্ষা করবে। জাহান্নাম থেকে। যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত একটি সত্য এবং অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজাহ, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়, এমনকি তাঁর সুপারিশে কিছু মুসলিমও কম নয়। এর দ্বারা যার শাস্তি লাঘব হবে তখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে একটি মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে প্রকৃত আশা গ্রহণ করা উচিত।

যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না তাদের শয়তান বিশ্বাস করে যে তারা সেই দিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে এই দাবি করে যে তারা এতটা খারাপ ছিল না কারণ তারা হত্যার মতো বড় অপরাধ এড়িয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করেছে যে তাদের আবেদন গৃহীত হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠানো হবে যদিও তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল। এটি অবিশ্বাস্যভাবে মূর্খ কারণ মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির সাথে আচরণ করবেন না যে তাকে বিশ্বাস করে এবং তার আনুগত্য করার চেষ্টা করে যে তাকে অবিশ্বাস করেছিল। একটি একক শ্লোক এই ধরণের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে মুছে দিয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

" আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্যকে দ্বীন হিসাবে চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় যে চারটি সৈন্য প্রেরিত হয়েছিল তার একজনের নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রা.)। তাকে উপদেশ দেওয়ার পর, আবু বক্কর রা.-কে ডেকে পাঠালেন এবং কায়েস ইবনে হাইবারাহ (রা.)-এর সাথে কথা বললেন, একজন বিখ্যাত যোদ্ধা যিনি আবু উবাইদাহ (রা.)-এর সেনাবাহিনীতে যোগ দেবেন। হযরত আবু বক্কর (রা.) তাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন যার মাধ্যমে মুসলমানদের তাদের নিযুক্ত নেতার অধীনে একত্রিত করা। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬৪২-৬৪৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তাঁর নেতা আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গুণাবলী উল্লেখ করেন। তিনি কায়েস ইবনে হাইবারাহকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ বিশ্বস্ত উপাধি দিয়েছিলেন। এটি সহীহ মুসলিমের ৬২৫২ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলিমদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তাঁর নেতা আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গুণাবলী উল্লেখ করেন। তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন একজন ছিলেন যিনি অন্যদের উপর সীমালঙ্ঘন করেননি, এমনকি যখন তারা তার বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করেছিল। অন্যায় হলে ক্ষমা করে দিতেন।

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

"আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্নের উপরে পা রাখা একজন মুসলমানকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন তাই ধৈর্য ধরে রাখা উচিত, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়, তাদের পাপ ক্ষমা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য কারণ প্রতিশোধ নেওয়া কেবল জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, যাদের অন্যকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং সর্বদা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং বরং তাদের প্রতিটি ছোট-খাটো পাপ যাচাই করেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে চলতে দেওয়া কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমা এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তাঁর নেতা আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গুণাবলী উল্লেখ করেন। তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে আবু উবাইদাহ (রাঃ) তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যিনি মানুষের সাথে সম্পর্ক সংশোধন করতেন, এমনকি অন্যরা তাদের ছিন্ন করলেও।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোনো অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ তার ব্যথায় অংশ নেয়।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, নিজের জীবনে এতটা আত্মমগ্ন না হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে এমন আচরণ করা হয় যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘুরছে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যাগুলির উপর এত বেশি মনোযোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে যে তারা বড় চিত্রের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলে যা অধৈর্যতার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি গাফিলতি করে যার ফলে তাদের উপায় অনুসারে অন্যদের সমর্থন করার ক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমানের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরেও প্রসারিত এবং এতে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য যেমন ভালো এবং আন্তরিক পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমানদের উচিত নিয়মিত সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা এবং যারা সারা বিশ্বে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে। এটি তাদের আত্মকেন্দ্রিক হওয়া এড়াতে এবং পরিবর্তে অন্যদের সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে সে একটি পশুর চেয়েও নিচু হয়, এমনকি তারা তাদের সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানকে তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্যদের জন্য কার্যত যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুদের চেয়ে উত্তম হওয়া উচিত।

যদিও একজন মুসলিম পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারে না কিন্তু তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন এবং আশা করেন।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তাঁর নেতা আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গুণাবলী উল্লেখ করেন। তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুমিনদের প্রতি করুণাময় ছিলেন।

সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, মহান আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন না যে অন্যের প্রতি দয়া করে না।

ইসলাম একটি অতি সরল ধর্ম। এর একটি মৌলিক শিক্ষা এতই সহজ যে, এমনকি অশিক্ষিত লোকেরাও সেগুলি বুঝতে এবং তার উপর আমল করতে পারে, অর্থাৎ মানুষ অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করবে তা হল মহান আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, যারা অন্যের ভুল উপেক্ষা করতে এবং ক্ষমা করতে শেখে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

যারা অন্যদেরকে উপকারী পার্থিব এবং ধর্মীয় বিষয়ে যেমন মানসিক বা আর্থিক সাহায্যে সমর্থন করে, তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহ সমর্থন করবেন। সুনান আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই

একই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করবেন।

সোজা কথায়, কেউ যদি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে সদয় ও সম্মানের সাথে আচরণ করে তবে মহান আল্লাহ তাদের সাথে একই আচরণ করবেন। এবং যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাদের সাথে মহান আল্লাহ অনুরূপ আচরণ করবেন, এমনকি যদি তারা ফরয নামাযের মতো বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে। এর কারণ হল একজন মুসলিমকে সফলতা অর্জনের জন্য উভয় দায়িত্বই পালন করতে হবে যথা, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা সদয় আচরণ করবেন, যদি তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেন। যদি তারা অন্য কোন কারণে তা করে তবে তারা নিঃসন্দেহে এই শিক্ষাগুলিতে বর্ণিত সওয়াব হারাবে। সকল কর্মের ভিত্তি এবং ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৪৭-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তাঁর নেতা আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গুণাবলী উল্লেখ করেন। তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আবু উবাইদাহ (রা.) কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন।

এই কঠোরতা বলতে বোঝায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যখন কাউকে খারাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। একজনকে অবশ্যই কুফরের বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে যা অবিশ্বাসের ফলে হয়, মানুষের বিরুদ্ধে কঠোর নয়। মুসলমানদের তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত নয় যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটা বাস্তবে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুনান আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে, একজন মুসলিম তাদের বন্ধুর ধর্মে রয়েছে। এর অর্থ হল একজন ব্যক্তি ভাল বা খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে যা তার সঙ্গীদের রয়েছে।

এছাড়া মুসলিম ও অমুসলিম সকলের সাথে সদয় আচরণ করা একজন প্রকৃত মুসলিম ও প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে অমুসলিম সহ অন্যান্য লোকদের তাদের খারাপ কথাবার্তা ও কাজ থেকে নিরাপদ রাখে। আর একজন প্রকৃত মুমিন তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে মানুষ বা তাদের সম্পদের ক্ষতি করে না। তাই এই উপদেশ মুসলমানদেরকে ধার্মিকদের সাথে চলার জন্য সতর্ক করে কারণ তারা তাদেরকে মহান আল্লাহর রহমত ও আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যদের সাথে সুস্থ সামাজিক আচরণ এবং অন্যদের সাথে গভীর বন্ধুত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গভীর বন্ধুত্ব একজনকে তাদের সঙ্গীর প্রতি ভালবাসার কারণে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করার দিকে নিয়ে যেতে পারে যেখানে, অন্যদের সাথে ভাল সামাজিক আচরণ কখনই একজনকে এই স্তরে নিয়ে যেতে পারে না। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই প্রত্যেকের সাথে উত্তম চরিত্র ও আচার-আচরণ অবলম্বন করতে হবে তবে তাদের জন্য গভীর বন্ধুত্ব

সংরক্ষণ করতে হবে যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করবে। এটা শুধুমাত্র একজন মুসলিম অন্য মুসলমানের জন্য করতে পারে। অন্যদিকে একজন অমুসলিম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হতে উৎসাহিত করবে, যদিও তারা এটা নাও চায়। এর কারণ হল একজন অমুসলিম তার পরে একজন মুসলিমের আলাদা আচরণবিধি অনুযায়ী জীবনযাপন করে। আর যে আচরণ একজন অমুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য তা ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তাঁর নেতা আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গুণাবলী উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি তাকে আবূ উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আদেশ অমান্য না করতে বা তাঁর মতের বিরোধিতা না করার নির্দেশ দেন, কারণ তিনি শুধুমাত্র ভালো জিনিসের আদেশ দিতেন।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, কায়েস ইবনে হাইবারাহকেও মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে যারা তাদের শক্তি ও সামর্থ্যকে ইসলামের প্রচারের জন্য ব্যবহার করবে। একটি অসাধারণ পুরস্কার পান।

এটি অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7 এর সাথে সংযুক্ত :

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"

এই আয়াতের অর্থ হল কেউ যদি ইসলামকে সাহায্য করে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের উভয় জগতেই সাহায্য করবেন। এটা আশ্চর্যজনক যে অগণিত মানুষ মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবুও মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে এই আয়াতের প্রথম অংশটি পূরণ করে না। . বেশিরভাগ লোকেরা যে অজুহাত দেয় তা হল তাদের সৎ কাজ করার সময় নেই। তারা মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবুও তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দেবে না। এটা কোনো কিছু হলো? যারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে না এবং তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে মহান আল্লাহর সাহায্যের আশা করে তারা নিতান্তই মূর্খ। এবং যারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তবুও তাদের অতিক্রম করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তারা যে সাহায্য পাবে তা সীমিত। একজন কিভাবে আচরণ করে তাদের সাথে কিভাবে আচরণ করা হয়। যত বেশি সময় এবং শক্তি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা হবে, তারা তত বেশি সমর্থন পাবে। এটা সত্যিই যে সহজ।

একজন মুসলমানকে বুঝতে হবে যে অধিকাংশ ফরয কর্তব্য, যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, শুধুমাত্র একজনের দিনে অল্প সময় লাগে। একজন মুসলমান দিনে মাত্র এক ঘণ্টা ফরজ নামাজের জন্য উৎসর্গ করার আশা করতে পারে না এবং তারপর সারাদিনের জন্য মহান আল্লাহকে অবহেলা করে এবং এখনও সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও তাঁর অবিরাম সমর্থন আশা করতে পারে না। একজন ব্যক্তি

এমন একজন বন্ধুকে অপছন্দ করবে যে তাদের সাথে এমন আচরণ করে। তাহলে বিশ্বজগতের রব মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে এমন আচরণ কিভাবে করা যায়?

কেউ কেউ শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় নিবেদন করে, যখন তারা কোন পার্থিব সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে তা সমাধানের দাবি করে যেন তারা স্বেচ্ছায় সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ করেছেন। এই মূর্খ মানসিকতা স্পষ্টতই মহান আল্লাহর দাসত্বের বিরোধিতা করে। এটা আশ্চর্যজনক যে এই ধরনের ব্যক্তি কীভাবে তাদের অন্যান্য অবসরের কাজগুলি করার জন্য সময় খুঁজে পান, যেমন পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো, টিভি দেখা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা কিন্তু মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উত্সর্গ করার জন্য কোন সময় খুঁজে পান না। তারা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার এবং গ্রহণ করার সময় খুঁজে পায় না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন ও আমল করার সময় খুঁজে পাচ্ছেন বলে মনে হয় না। এই লোকেরা কোনওভাবে তাদের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা ব্যয় করার জন্য সম্পদ খুঁজে পায় তবে স্বেচ্ছায় দাতব্য দান করার মতো কোনও সম্পদ খুঁজে পায় না।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুসলমানের সাথে তাদের আচরণ কেমন হবে সে অনুযায়ী আচরণ করা হবে। অর্থ, যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় উৎসর্গ করে, তাহলে তারা নিরাপদে সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন পাবে। কিন্তু যদি তারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় বা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য কোন সময় নিবেদন না করে শুধুমাত্র তা পালন করে, তাহলে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবে। সহজ করে বললে, কেউ যত বেশি দেবে তত বেশি পাবে। কেউ বেশি না দিলে বিনিময়ে বেশি আশা করা উচিত নয়।

আনুগত্য উপর ফোকাস

সিরিয়া অভিযানের সময়, আবু বক্কর আমর ইবনে আল-আস, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, একটি সেনাবাহিনীর নেতা হিসাবে ফিলিস্তিনে প্রেরণ করেন। তিনি বিদায় নেওয়ার আগে আবু বকর (রা.) তাঁকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৭১৭-৭১৮ এ আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আবু বক্কর (রাঃ) তাকে সর্বজনীন ও গোপনে মহান আল্লাহকে ভয় করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, 2347 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর প্রকৃত বন্ধু সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা, প্রকাশ্যে ও গোপনে। একান্তে এটি করা একজন ব্যক্তির মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়, যার অর্থ, তারা কেবলমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। এই সেই ব্যক্তি যে দৃঢ়ভাবে মনে রাখে যে তারা যেখানেই থাকুক না কেন তাদের সত্তার অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দিকগুলি সর্বদা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। যদি কেউ এই বিশ্বাসের উপর অটল থাকে তবে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণ করবে যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ তারা কাজ করে, যেমন

সালাত আদায় করা, যেন তারা মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তাদের দেখছে। এটি সৎকাজকে উৎসাহিত করে এবং পাপ থেকে বিরত রাখে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সংগ্রাম এবং পরকালের জন্য কাজ করার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে সামান্য প্রদর্শন করাও শিরক।

এটি একটি ছোট ধরনের শিরক যার কারণে কারো ঈমান নষ্ট হয় না। পরিবর্তে এটি সওয়াবের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে কারণ এই মুসলিমটি মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করেছিল যখন তাদের মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা উচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, বিচার দিবসে এই লোকদের বলা হবে যে তারা তাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাও, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

যদি শয়তান কাউকে সৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে না পারে তবে সে তাদের উদ্দেশ্য নষ্ট করার চেষ্টা করবে যার ফলে তাদের পুরস্কার নষ্ট হবে। যদি তিনি তাদের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে কলুষিত করতে না পারেন তবে তিনি সূক্ষ্ম উপায়ে এটিকে কলুষিত করার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে রয়েছে যখন লোকেরা সূক্ষ্মভাবে অন্যদের কাছে তাদের ধার্মিক কাজগুলি প্রদর্শন করে। কখনও কখনও এটি এতই

সূক্ষ্ম হয় যে ব্যক্তি নিজেই তারা কী করছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নয়। যেহেতু জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা সকলের জন্য কর্তব্য, সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, দাবী করা অজ্ঞতাকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহ কবুল করবেন না।

সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শন প্রায়ই সামাজিক মিডিয়া এবং একজনের বক্তব্যের মাধ্যমে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম অন্যদেরকে জানাতে পারে যে তারা রোজা রাখছে যদিও কেউ তাদের সরাসরি জিজ্ঞাসা করেনি যে তারা রোজা রাখছে কিনা। আরেকটি উদাহরণ হল যখন কেউ প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে স্মৃতি থেকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে যাতে অন্যদের দেখায় যে তারা পবিত্র কোরআন মুখস্ত করেছে। এমনকি প্রকাশ্যে নিজের সমালোচনা করাকেও অন্যের কাছে নম্রতা দেখানো বলে বিবেচিত হতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, সূক্ষ্মভাবে দেখানো একজন মুসলমানের পুরস্কার নষ্ট করে এবং তাদের সৎ কাজগুলোকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। এটা শুধুমাত্র ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে সম্ভব, যেমন একজনের কথাবার্তা কিভাবে রক্ষা করা যায়।

আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁকে তাঁর নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিদের সাথে একজন স্নেহময় পিতার মতো আচরণ করার পরামর্শ দেন।

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য একজন অভিভাবক এবং দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে বাহ্যিক জিনিস যেমন সম্পদ এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস যেমন একজনের দেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলিমের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখকে হালাল জিনিস দেখার জন্য এবং তাদের জিহ্বা ব্যবহার করে শুধুমাত্র হালাল এবং দরকারী শব্দ উচ্চারণ করা।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদের যেমন আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছেও প্রসারিত হয়। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জন্য তাদের জন্য প্রদান করা এবং মন্দ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করার মতো অধিকারগুলো পূরণ করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন

মুসলিমকে অবশ্যই তাদের পথ দেখাতে হবে উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে কারণ এটিই এখন পর্যন্ত শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, কার্যত আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদীস অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ।

হযরত আবু বক্কর (রাঃ) তাকে বাধ্যতামূলক নামায কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তার সৈন্যরা তা নিশ্চিত করতেন।

সহীহ বুখারী, 574 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি দুটি শীতল ফরজ নামাজ কায়েম করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দুটি শীতল ফরজ নামাজ বলতে ভোর ও শেষ বিকেলের ফরজ নামাজকে বোঝায় কারণ এই দুটি সময়ে আবহাওয়া অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতল থাকে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে।

ফরয নামায কায়েম করার মধ্যে রয়েছে তাদের সকল শর্ত ও শিষ্টাচার সঠিকভাবে পালন করা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যথাসময়ে আদায় করা। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে অর্পণ করা মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলির একটি। এটি সহীহ মুসলিমের 252 নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

যদিও, পাঁচটি ফরজ নামায রয়েছে যা এখনও কায়েম করতে হবে, আলোচনায় মূল হাদীসে মাত্র দুটির কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হল এই দুটি নামাজ তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সবচেয়ে কঠিন। ফরজ ফজরের নামায এমন সময়ে হয় যখন অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। অতএব, সঠিকভাবে অফার করার জন্য একজনের আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে যাওয়ার জন্য অনেক শক্তি এবং প্রেরণা প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক দেরী বিকালের প্রার্থনা বেশিরভাগই এমন সময়ে ঘটে যেখানে বেশিরভাগ লোকেরা তাদের কর্মদিবস শেষ করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছে। তাই তাদের ফরজ নামাজ সঠিকভাবে আদায় করার জন্য ক্লান্তিকর এবং এমনকি চাপযুক্ত দিনের পর অবসর ত্যাগ করা কঠিন। অতএব, কেউ যদি এই দু'টি নামায সঠিকভাবে কায়েম করে তবে তারা মহান আল্লাহর রহমতে অন্যান্য ফরয নামায কায়েম করা সহজ হবে, যা সাধারণত আরও সুবিধাজনক সময়ে হয়।

তাই মুসলমানদের উচিত তাদের সকল ফরয নামায কায়েম করার জন্য সচেষ্ট হওয়া কারণ এটিই ইসলামের সারমর্ম এবং এটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসকে কুফর থেকে পৃথক করে। জামি আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

হযরত আবু বক্কর (রাঃ) তাঁকে তাঁর সৈন্যদের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও আমল করতে উৎসাহিত করার পরামর্শ দেন।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। নিষ্ঠাবান মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁকে তাঁর সৈন্যদেরকে প্রাক-ইসলামী জাহেলিয়াতের দিনগুলি নিয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ এটি কেবল উপজাতীয়তার প্রেমের দিকে পরিচালিত করে, যা ফলস্বরূপ অনৈক্যের দিকে পরিচালিত করে।

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো

বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলিম জাতি ও গোষ্ঠী সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব গ্রহণ করেছে এবং কিছু লোককে এই গোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলিম যত বেশি মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তার নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তারা তত বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে

অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলিমদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে জড় জগতের প্রলোভন থেকে দূরে সরে যেতে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পরকালের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য অবিচল থাকার পরামর্শ দেন।

এই মহৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই জড় জগত ও পরকাল সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ও উপলব্ধি অর্জন করতে হবে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় জড় জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। পার্থিব আশীর্বাদ যাই হোক না কেন এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সর্বদা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা নেই। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যেটি তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে কখনও পৌঁছাতে পারে না।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী

অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর জলের ফোঁটাকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম শাশ্বত পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

হযরত আবু বক্কর (রা.) তাকে মহান নেতা হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত আয়াতের বৈশিষ্ট্যগুলি মেনে চলার পরামর্শও দিয়েছিলেন। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 73:

"এবং আমি তাদেরকে আমাদের নির্দেশে পথপ্রদর্শক করেছিলাম। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদানের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি। এবং তারা ছিল আমাদের উপাসক।"

অবশেষ নম্র

ইরাকে অর্জিত সাফল্যের পর, আবু বক্কর খালিদ বিন ওয়ালিদ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সিরিয়ার দিকে, অর্থাৎ রোমান সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তাকে এবং অন্যদেরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি যে বিজয়গুলি অর্জন করেছেন তাতে তার গর্বিত হওয়া উচিত নয় কারণ সেগুলি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দেয়নি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৬০২-৬০৩-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি আল ফুরকান 25 অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, আয়াত 63:

"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে সহজে চলাফেরা করে..."

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়, সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। .

একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয় জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজন হাঁটার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

"আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি

তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আস্থা গড়ে তোলা

রোমান সাম্রাজ্যের সাথে জড়িত থাকার জন্য সিরিয়ার দিকে যাওয়ার আদেশ পাওয়ার পর, খালিদ বিন ওয়ালিদ, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, রোমানরা, যারা তাদের সীমান্ত পাহারা দিচ্ছিল তাদের সতর্ক না করার জন্য, ইরাক থেকে সিরিয়ায় একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। . দীর্ঘ ও কঠিন যাত্রার প্রস্তুতির জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের পর তিনি মন্তব্য করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহর সাহায্য একজন মুসলমানের সাথে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া উচিত নয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৬০৫-৬০৬-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উভয় দিকই পূরণ করেছিলেন। প্রথমটি হল মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করা। এবং দ্বিতীয়টি হল আত্মবিশ্বাসের সাথে বিশ্বাস করা যে পরিস্থিতির ফলাফল, যা সর্বদা মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়, জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম হবে।

মুসলমানরা প্রায়শই প্রশ্ন করে যে কিভাবে তারা মহান আল্লাহর উপর তাদের আস্থা গড়ে তুলতে এবং শক্তিশালী করতে পারে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। এটি করার একটি প্রধান উপায় হল মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এর কারণ এই যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অবাধ্য, সে সর্বদা আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, তাদের সাহায্য করবে না যা তার প্রতি তাদের আস্থাকে দুর্বল করে দেয়। অথচ, আনুগত্যকারী মুসলমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, তারা যেহেতু তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, মহান আল্লাহ অবশ্যই তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে

তাদের প্রতি সাড়া দেবেন, যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহর উপর তাদের আস্থা শক্তিশালী হবে।

উপরন্তু, সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির প্রতি তাদের উপলব্ধি অনুযায়ী সাড়া দেন। অবাধ্য ব্যক্তির অবাধ্যতার কারণে সর্বদা মহান আল্লাহ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা থাকবে। যদিও, একজন আনুগত্যকারী মুসলিম সর্বদা তাদের আনুগত্যের কারণে মহান আল্লাহ সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করবে। এই চিন্তাশক্তি মহান আল্লাহর প্রতি একজন মুসলিমের বিশ্বাসকে দুর্বল বা শক্তিশালী করতে পারে। আনুগত্যশীল মুসলিম বিশ্বাস করে যে যদি তারা একটি ব্যবসায়িক চুক্তির তাদের পক্ষ পূরণ করে তবে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদারও একই কাজ করবে। একইভাবে, একজন আনুগত্যশীল মুসলিম বিশ্বাস করে যে তারা যেমন মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন তাদের সারা জীবন বিশেষ করে, অসুবিধার মধ্যে সাহায্য করার মাধ্যমে। যদিও, যে ব্যক্তি একটি ব্যবসায়িক চুক্তির তাদের পক্ষ পূরণ করে না সে বিশ্বাস করবে না বা আশা করবে না যে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদার তাদের পক্ষ পূরণ করবে। একইভাবে, একজন অবাধ্য ব্যক্তি বিশ্বাস করবে না যে মহান আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন কারণ তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি আস্থা রাখা এবং তার আনুগত্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। একজন যত বেশি আনুগত্য করবে তত বেশি তারা তাঁর উপর আস্থা রাখবে। তারা যত কম আনুগত্য করবে তত কম তারা তাঁর উপর আস্থা রাখবে।

আল্লাহর জন্য ঐক্যবদ্ধ (SWT)

সিরিয়ায় থাকাকালীন খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং তার বাহিনী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কানাত বুসরায় পৌঁছেন। সেখানে তিনি অনেক সাহাবীকে দেখতে পান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা একটি ভিন্ন বাহিনীর অংশ ছিল এবং তারাও শহর আক্রমণ করছিল। এই সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, স্বেচ্ছায় খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং শহরটি জয় করার জন্য একসাথে কাজ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৬০৯-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা সুস্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তারা সর্বদা তাদের মতভেদকে একপাশে রেখে সমস্ত পার্থিব উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পতাকাতলে একত্রিত হয়। তারা ঐক্য তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, পদক্ষেপগুলি সমস্ত মুসলমানকে নিতে হবে।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান

করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায় । যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলিমকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যার প্রতি ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের অন্তর থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সম্মান ও সদয় আচরণ করে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করার জন্য কিন্তু তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসতে থাকা উচিত।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট আলেমকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে

তাদের উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করে। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন নির্দিষ্ট আলেমের অনুসারী মুসলমানের এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদেরকে অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে আলেমকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, মুসলমানদের একে অপরের থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরের বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানের উচিত অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়ানো যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্যান্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাজায় অংশ নেওয়া এবং তাদের উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

সুনানে আবু দাউদ 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমকে লাঞ্ছিত করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি

একজন মুসলিমকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তাই, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা মহান আল্লাহর সাথে যেভাবে যোগাযোগ করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপ অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জীবন, সম্পদ ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলিমকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিম সহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে ব্যবহার করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

অসুবিধা সম্মুখীন

সিরিয়া অভিযানের সময়, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং তার বাহিনী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, একটি যুদ্ধের সময় পরাজয়ের সম্মুখীন হন, কারণ তারা প্রচুর পরিমাণে ছিল এবং কার্যত চারদিক থেকে বেষ্টিত ছিল। তারা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং সিরিয়ার সীমান্তে চলে যায়। যুদ্ধের সময় খালিদের পুত্রসহ অনেক মুসলমান নিহত হয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬১৯-৬২০ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এমন অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য মহান আল্লাহ মুসলমানদের কাছে দাবি করেন না। উদাহরণস্বরূপ, তারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে যেখানে তারা তাদের পরিবার, ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য রেখে এক বিচিত্র দেশে হিজরত করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

তুলনামূলকভাবে, মুসলমানরা এখন যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন তা ততটা কঠিন নয় যতটা ধার্মিক পূর্বসূরিরা সম্মুখীন হয়েছিল। তাই মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাদের শুধুমাত্র কয়েকটি ছোট কুরবানী করতে হবে, যেমন ফরজ ফজরের নামাজ পড়ার জন্য কিছু ঘুম কুরবানী এবং বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করার জন্য কিছু সম্পদ। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের বাড়িঘর ও পরিবার পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এই কৃতজ্ঞতা অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে একজনের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি ব্যবহার করে কার্যত দেখাতে হবে।

উপরন্তু, যখন একজন মুসলমান সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের উচিত ধার্মিক পূর্বসূরিরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল এবং কীভাবে তারা মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের কাটিয়ে উঠেছিল তা মনে রাখা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই জ্ঞান একজন মুসলিমকে তাদের অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে শক্তি প্রদান করতে পারে কারণ তারা জানে যে ধার্মিক পূর্বসূরিরা মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল, তবুও তারা ধৈর্যের সাথে আরও কঠিন সমস্যা সহ্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী (সাঃ) তাদের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সহ্য করেছেন এবং তারা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

একজন মুসলমান যদি ধার্মিক পূর্বসূরিদের অটল মনোভাব অনুসরণ করে তবে আশা করা যায় যে তারা পরকালে তাদের সাথেই থাকবে।

আল্লাহর সঙ্গ (SWT)

সিরিয়া অভিযানের সময়, মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতারা আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে শক্তিবৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কারণ রোমান সৈন্যবাহিনী সংখ্যায় বিশাল এবং যুদ্ধে শক্তিশালী ছিল। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাছে আবার চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি তাদের শক্তিবৃদ্ধি পাঠাবেন কিন্তু তাদের মনে করিয়ে দিলেন যে মুসলিম সৈন্যরা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কারণ তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করেছে এবং তাই যদি তারা যুদ্ধ করে। সংখ্যায় ছাড়িয়ে গিয়েছিল, অলঙ্ঘনীয় সমর্থন তাদের সাথে ছিল যথা, মহান আল্লাহ। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬৪৯-৬৫১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, যিনি তাঁকে স্মরণ করেন তিনি তাঁর সাথে আছেন।

বিষণ্নতার মতো মানসিক সমস্যা এবং ব্যাধির উত্থানের সাথে, এই ঘোষণার গুরুত্ব বোঝা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক। একজন ব্যক্তির মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার একটি ছোট সম্ভাবনা থাকে যখন তারা ক্রমাগত তাদের ঘিরে থাকে এবং তাকে সত্যিকারের ভালবাসে এমন কাউকে সাহায্য করে। যদি এটি একজন ব্যক্তির জন্য সত্য হয় তবে নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর জন্য আরও উপযুক্ত, যিনি তাকে স্মরণকারীর সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধুমাত্র এই ঘোষণার উপর কাজ করা সমস্ত মানসিক সমস্যা যেমন বিষণ্নতা দূর করবে। এ কারণেই অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা অন্যদের মধ্যে থাকা নেককার পূর্বসূরিদের মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করেনি কারণ তারা সর্বদা মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে ছিল। এটা স্পষ্ট যে, যখন কেউ মহান

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে, তখন তারা পরকালে তাঁর নৈকট্য না পাওয়া পর্যন্ত সকল বাধা-বিপত্তি সফলভাবে অতিক্রম করবে।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে এই ঘোষণাকে কোনভাবেই সীমাবদ্ধ করেননি। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ঘোষণা করেননি যে তিনি শুধুমাত্র ধার্মিকদের সাথে বা যারা নির্দিষ্ট ভাল কাজ করে তাদের সাথে ছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মুসলমানকে তাদের বিশ্বাসের শক্তি বা তারা কত পাপ করেছেন তা নির্বিশেষে পরিবেষ্টন করেছিলেন। তাই একজন মুসলিমের কখনই মহান আল্লাহর রহমত থেকে আশা হারানো উচিত নয়। কিন্তু এই হাদীসে উল্লেখিত শর্তটি লক্ষ্য করা জরুরী অর্থাৎ মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। এটি কেবল জিহ্বা দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা নয় বরং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল নিজের কাজের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা। এটি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এটাই মহান আল্লাহর প্রকৃত স্মরণ। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে মহান আল্লাহর সঙ্গ ও সমর্থনে ধন্য হবে।

সহজ কথায়, যে ব্যক্তি যত বেশি মহান আল্লাহকে মান্য করবে, ততই তার সাহচর্য পাবে। একজন যা দেয় তাই তারা পাবে।

পুরস্কার লাভ

সিরিয়া অভিযানের সময়, মুসলিম সেনাদের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল কারণ তাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। ফলস্বরূপ, আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, স্বেচ্ছাসেবকদের তাদের সাথে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং হাশেম ইবনে উতবাহ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। তার চাচা থেকে বিদায় নেওয়ার সময়, জ্যেষ্ঠ সাহাবী, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি এগিয়ে যেতে এবং যুদ্ধ করতে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কোন পার্থিব উদ্দেশ্যের জন্য নয়। তিনি আরও বলেন, একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র একটি সত্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং একটি ভাল কাজ করবে যা তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছে, যখন তারা এই পৃথিবী থেকে চলে যাবে। হাশিম, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি এই উপদেশ মেনে চলার চেষ্টা করবেন এবং মন্তব্য করেছেন যে তিনি নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন যদি তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে মানুষের জন্য কাজ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬৫৩-৬৫৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে লোক দেখানোর মতো কাজ করে। , মহিমান্বিত, কেয়ামতের দিন তাদের পুরষ্কার লাভের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য তারা কাজ করেছে যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কাজের ভিত্তি এমনকি ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। সহীহ বুখারীর ১ নম্বর হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিচার করেন। একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা সকল ধর্মীয় ও উপকারী পার্থিব কর্ম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পালন করে, যাতে তারা উভয় জগতে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করুন । এই সঠিক মানসিকতার একটি চিহ্ন হল যে এই ব্যক্তিটি তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আশা করে না বা চায় না। যদি কেউ এটি কামনা করে তবে এটি তাদের ভুল উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

উপরন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা দুঃখ এবং তিক্ততাকে প্রতিরোধ করে কারণ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের বিরক্ত এবং তিক্ত করে তুলবে কারণ তারা মনে করে যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন, তিনি তাদের সন্তানদের মতো অন্যদের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে কখনই তিক্ত বা ক্রোধান্বিত হবেন না। এই মনোভাব মানসিক প্রশান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে নিয়ে যায় কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের সৎ কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। এইভাবে সমস্ত মুসলমানদের কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে পড়ে থাকতে পারে।

আশীর্বাদ পালন

সিরিয়া অভিযানের সময়, মুসলিম সেনাদের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল কারণ তাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। ফলস্বরূপ, আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, স্বেচ্ছাসেবকদের তাদের সাথে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হুদাইম (রা.) এর নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। নামাযের মূল আহবানকারী বিলাল, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হলেন, এই বাহিনী নিয়ে চলে যাওয়ার অনুমতির জন্য। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রতি তাঁর প্রবল ভালোবাসার কারণে তাঁকে যেতে দিতে নারাজ, কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। আবু বক্কর চলে যাওয়ার আগে, বিলাল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সর্বদা ভাল কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ তারা এই পৃথিবীতে তার জীবিকা হবে এবং তার মৃত্যুর পরে একটি উত্তম প্রতিদানের দিকে নিয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬৫৫-৬৫৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সৎকর্মের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। যে এগুলি করবে সে কেবল এই দুনিয়াতেই শান্তি ও সাফল্য পাবে না বরং তারা এই পার্থিব নিয়ামতগুলিকে চিরস্থায়ী পুরস্কারের আকারে পরকালে নিয়ে যাবে। কিন্তু যারা তাদের নেয়ামতের অপব্যবহার করে তারা দুনিয়াতে শান্তি লাভ করতে পারবে না এবং এই পার্থিব নেয়ামতগুলো তাদের কবরে পৌঁছে তাদের পরিত্যাগ করবে।

সহীহ বুখারী, 6442 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রকৃত সম্পদ হল যা সে আখিরাতে প্রেরণ করে অথচ তারা যা রেখে যায় তা বাস্তবে তার সম্পদ। উত্তরাধিকারী

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সম্পদের মতো যতটা বরকত পাঠাতে পারে, সেগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করে যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর মধ্যে অযথা, অত্যধিক বা অপব্যয় না করে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কোন মুসলমান যদি তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করে তাহলে উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এবং যদি তারা তাদের মজুদ করে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যায় তবে তারা তাদের পাওয়ার জন্য দায়ী হবে যদিও তারা চলে যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের উপভোগ করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৯ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, যদি তাদের উত্তরাধিকারীরা নিয়ামতগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, এবং যে এটি সংগ্রহ করবে সে বিচারের দিন খালি হাতে থাকবে। অথবা তাদের উত্তরাধিকারী নেয়ামতের অপব্যবহার করবে যা নিয়ামত অর্জনকারী এবং তাদের উত্তরাধিকারী উভয়ের জন্যই বড় আফসোস হয়ে যাবে, বিশেষ করে, যদি তারা তাদের উত্তরাধিকারী যেমন তাদের সন্তানকে শিক্ষা না দেয়, তাহলে দোয়াগুলোকে কিভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে কারণ এটি একটি কর্তব্য। তাদের উপর এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা এবং নিশ্চিত করা যে তারা তাদের বাকি নেয়ামতগুলোকে

ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরকালে নিয়ে যাবে। অন্যথায়, তারা হাশরের দিনে খালি হাতে এবং অনুশোচনায় পূর্ণ থাকবে।

বিনয়ী হচ্ছে

সিরিয়া অভিযানে যোগদানের জন্য অনেক মুসলিম মদিনায় প্রবেশ করছিলেন। এই মুসলিমদের মধ্যে অনেকেরই ইসলামী আচার-আচরণ এবং শিষ্টাচার সম্পর্কে তেমন জ্ঞান ছিল না এবং ফলস্বরূপ তারা প্রায়শই অনিচ্ছাকৃতভাবে মদিনার বাসিন্দাদের বিরক্ত করত। এই বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ কেউ আবু বক্করের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যিনি প্রকাশ্যে তাদেরকে বিদেশী মুসলমানদের প্রতি ধৈর্যশীল ও নম্র থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের সেবা করা এবং মহান আল্লাহকে খুশি করা। মদিনার অধিবাসীরা তার আবেদন গ্রহণ করে এবং তাদের বিদেশী মুসলিম ভাইদের প্রতি সর্বোত্তম আচরণ প্রদর্শন করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬৫৬-৬৫৭ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদের বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে

তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলিমকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তারা কখনোই নবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারবে না এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হবে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ) কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা, কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ

ইসলামে ঐক্যবদ্ধ

সিরিয়া অভিযানের সময়, মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতারা, আবু বক্কর (রা.)-এর অনুমতি নিয়ে, রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তের কাছাকাছি ইয়ারমুকের ভূমিতে পশ্চাদপসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। আবু বক্কর খালিদ বিন ওয়ালিদ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সমস্ত সেনাবাহিনীর নেতা হিসাবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নেতাদেরকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন কিন্তু তাদের মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলিও তুলে ধরতে তার পথের বাইরে চলে গিয়েছিলেন, যাতে তারা খালিদকে নিয়োগের জন্য বিচ্ছিন্ন বোধ না করে, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন। খালিদ, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তিনি তার এবং তার মুসলিম ভাইদের মধ্যে কোন নেতিবাচক অনুভূতি চান না হিসাবে একই কাজ. কিন্তু যেহেতু এই নেতারা ছিলেন মহান সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেছিলেন, তারা তাঁর নেতৃত্বকে উন্মুক্ত অস্ত্র দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬৬১-৬৬৪ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তারা এইভাবে আচরণ করেছিল যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একত্রিত হয়েছিল, পার্থিব কারণে নয়।

সময়ের সাথে সাথে লোকেরা প্রায়শই বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে তাদের একসময়ের শক্তিশালী সংযোগ হারায়। এর অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি । এটি সাধারণত জানা যায় যে যখন একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন ভবনটি সময়ের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এমনকি ধসে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষকে সংযুক্ত করার বন্ধনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যকার বন্ধনগুলি অবশেষে দুর্বল বা এমনকি ভেঙ্গে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন। যদিও, বেশিরভাগ মুসলিমরা আজকে উপজাতীয়তা, ভ্রাতৃত্বের জন্য এবং অন্যান্য পরিবারকে দেখানোর জন্য মানুষকে একত্রিত করে। যদিও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগকারী বন্ধনের ভিত্তি ছিল যথার্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন শক্তিশালী থেকে শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও আজকাল অনেক মুসলমান রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সময়ের সাথে সাথে তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে আলাদা হয়ে গেছে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যদি তাদের বন্ধন টিকে থাকার এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জনের ইচ্ছা থাকে তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং একসাথে এমনভাবে কাজ করে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

বিশ্বাস অনুশীলন করা

খালিদ বিন ওয়ালিদ, তাঁর উপর সন্তুষ্ট হওয়ার পর, ইয়ারমুকের ভূমিতে পশ্চাদপসরণ করার জন্য সংগ্রামরত মুসলিম সেনাবাহিনীর একটিকে সাহায্য করার পর, সমস্ত মুসলিম অবশেষে ইয়ারমুকে পৌঁছে যেখানে তারা শিবির স্থাপন করেছিল। রোমান সেনাবাহিনী, যা মুসলিম সেনাবাহিনীর চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বড় ছিল, তারাও ইয়ারমুকে শিবির স্থাপন করেছিল। প্রতিটি মুসলিম ডেপুটি, সৈন্যদের একটি ইউনিটের দায়িত্বে, মুসলমানদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে অবিচল থাকতে উত্সাহিত করে খুতবা দিয়েছিল। তারা সকলেই কর্মের মাধ্যমে নিজের ঈমানের অনুশীলনের গুরুত্ব তুলে ধরেন, এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর পথে লড়াই করা। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬৬৯-৬৭১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি মহান আল্লাহর প্রতি ইচ্ছাপূরণ ও আশার মধ্যে পার্থক্য করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা একজন ব্যক্তিকে কার্যত মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয়, যেখানে মহান আল্লাহর প্রতি আশা করার সারমর্ম হল তাঁর আন্তরিক আনুগত্য।

যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহর রহমত অসীম এবং সকল পাপকে অতিক্রম করতে পারে। এবং মহান আল্লাহর অসীম করুণার প্রতি আশা ছেড়ে দেওয়াকে অধ্যায় 12 ইউসুফ, 87 নং আয়াতে অবিশ্বাস হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

"... প্রকৃতপক্ষে, কাফের লোকেরা ছাড়া আল্লাহর কাছ থেকে আর কেউ নিরাশ হয় না।"

তবুও, একটি সত্য বোঝা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। যথা, একজন মুসলিম তাদের বিশ্বাসের অর্থ সহ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি, একজন মুসলিম অমুসলিম হিসাবে মারা যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। যদি এমন হয় তবে এই ব্যক্তি আখেরাতে কোথায় থাকবেন তা উপসংহারে পৌঁছাতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। এটি তখন ঘটতে পারে যখন একজন মুসলিম পাপের উপর অটল থাকে, বিশেষ করে বড় পাপ, যেমন মদ পান করা এবং তাদের ফরজ নামাজ পড়তে ব্যর্থ হওয়া এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে তাদের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই কারণেই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের সমস্ত পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে এবং তাদের সমস্ত বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে কারণ এটি এমন একটি কাজ যা তারা নিঃসন্দেহে পূরণ করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি তাদের আশা আছে বলে বিশ্বাস করে তাদের প্রতারিত করা উচিত নয়। মহান আল্লাহর রহমতের প্রকৃত আশা হিসাবে, কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা সমর্থিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি করতে ব্যর্থ হওয়া এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা, তাঁর রহমতের আশা নয়, এটি নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তা যার কোন ওজন বা তাৎপর্য নেই। জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি

হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন।

আন্তরিকতার সাথে আসছে

ইয়ারমুকের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, একজন রোমান সেনাপতি জারজাহ আলাপচারিতার জন্য খোলা যুদ্ধের ময়দানে খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে দেখা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের এমন কিছু শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন যা সম্পর্কে তিনি অনিশ্চিত ছিলেন। কিছু মৌলিক বিষয় শোনার পর, যেমন সাম্যের গুরুত্ব, তিনি খালিদ (রাঃ) এর সাথে মুসলিম শিবিরে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর জীবনী আবু বকর আস সিদ্দিক, পৃষ্ঠা ৬৭৫-৬৭৭-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জারজাহ জটিল বা গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেননি যা তাকে বিস্মিত করেছিল এবং তাকে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে বোঝানোর জন্য কোন অলৌকিক ঘটনাও দেখানো হয়নি, তবুও তিনি সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে তার বিশ্বাস, আচরণ এবং জীবনধারা পরিবর্তন করেছিলেন। এর কারণ তিনি আন্তরিকতার সাথে সত্যের সন্ধান করতে এসেছেন। যখন কেউ এই ঘোষণা করে আন্তরিকতা অবলম্বন করে যে তারা সত্যকে গ্রহণ করবে এবং তাদের সাধ্যমত তা অনুসরণ করবে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে, তখন এমনকি সরলতম সত্য, অন্যদের দ্বারা উপেক্ষিত সত্যগুলিও তাদের সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে আসে, চেরি-পিকিং মনোভাব নিয়ে এবং শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলিকে গ্রহণ করে এবং অনুসরণ করে যা তাদের খুশি করে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে এমন বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে সে কখনই সঠিকভাবে সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, যদিও সে মুসলিম হয়। এই আন্তরিকতার কারণেই ইতিহাসের অনেক মানুষ গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নয় বরং সহজতম জিনিসের মুখোমুখি হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই আন্তরিকতা মুসলমানদের অবশ্যই গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ এটি ছাড়া ইসলামকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

অন্যদের জন্য অনুভূতি

ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময়, মুসলিম সেনাবাহিনীর অন্যতম নেতা ইকরিমা ইবনে আবু জাহল (রা.) এবং তার অনেক সৈন্য মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। যুদ্ধের ময়দানে শুয়ে তাদের পানীয় জলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা নিজেরা পান করার পরিবর্তে জল-বাহককে আগে অন্যদের দিতে নির্দেশ দিত। ফলে তাদের অনেকেই পানির স্বাদ না খেয়ে মারা যায়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬৭৮-৬৭৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ছিল তাদের একে অপরের প্রতি গভীর আন্তরিকতার স্তর।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"... শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ

থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

একটি সৎ উত্তর

কিছু তীব্র লড়াইয়ের পর ইয়ারমুকের যুদ্ধ মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়। রোমান রাজা হারাকল যখন খবরটি শুনেছিলেন তখন তিনি রাগান্বিত এবং দুঃখিত ছিলেন। তিনি তার নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন যে কিভাবে এই পরাজয় সম্ভব হয়েছিল যখন তাদের সেনাবাহিনী মুসলিম সেনাবাহিনীর চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বড় ছিল। শুধুমাত্র একজন প্রবীণ নেতার সৎ উত্তর দেওয়ার সাহস ছিল, যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 685-686-এ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রবীণ নেতা উত্তর দিলেন যে তারা পরাজিত হয়েছে কারণ মুসলমানরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য রাতে দাঁড়িয়েছিল।

সহীহ বুখারী, 1145 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তাঁর অসীম মহিমা অনুসারে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর কাছে অনুরোধ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাদের চাহিদা পূরণ করুন যাতে তিনি তাদের পূরণ করতে পারেন।

স্বেচ্ছায় রাতের ইবাদত মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না। এটি প্রদান করা মহান আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের একটি মাধ্যম। আর এটা তাঁর কাছে একজনের দাসত্বের নিদর্শন। এর অগণিত ফজিলত রয়েছে উদাহরণস্বরূপ,

সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস ঘোষণা করে যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

"এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

জামি আত তিরমিযী, 3579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান রাতের শেষ অংশে মহান আল্লাহর নিকটতম। অতএব, এই সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করলে কেউ অগণিত নিয়ামত লাভ করতে পারে।

সকল মুসলমানই কামনা করে যে তাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হোক এবং তাদের চাহিদা পূরণ হোক। অতএব, তাদের স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে প্রতি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামায কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি একজন ব্যক্তিকে অর্থহীন সামাজিক সমাবেশ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, একজনকে পাপ পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে আনুগত্যকারীরা স্বেচ্ছায় রাতের সালাত আদায় করা সহজ বলে মনে করে।

প্রবীণ নেতা আরও যোগ করেছেন যে তারা পরাজিত হয়েছিল কারণ মুসলমানরা দিনের বেলা রোজা রাখে।

সুনানে আন নাসাই, 2219 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, রোজা ব্যতীত সমস্ত সৎ কাজ নিজের জন্য করা হয় কারণ এটি মহান আল্লাহর জন্য এবং তিনি তা করবেন। সরাসরি পুরস্কৃত করুন।

এই হাদিসটি রোজার স্বতন্ত্রতা নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করার একটি কারণ হল অন্যান্য সমস্ত সৎ কাজ লোকেদের কাছে দৃশ্যমান, যেমন নামায, বা সেগুলি মানুষের মধ্যে থাকে, যেমন গোপন দান। যদিও, উপবাস হল একটি অনন্য ধার্মিক কাজ কারণ অন্যরা জানতে পারে না যে কেউ শুধুমাত্র তাদের পালন করে উপবাস করছে।

উপরন্তু, রোজা একটি সৎ কাজ যা নিজের প্রতিটি দিকের উপর তালা লাগিয়ে দেয়। অর্থ, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে তাকে মৌখিক ও শারীরিক গুনাহ থেকে বিরত রাখা হবে, যেমন হারাম জিনিস দেখা ও শোনা। এটি প্রার্থনার মাধ্যমেও অর্জন করা হয় তবে প্রার্থনাটি কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য করা হয় এবং অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয় যেখানে, উপবাস সারা দিন ঘটে এবং অন্যদের কাছে অদৃশ্য। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

নিচের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে যে ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত ঈমানদার হবে না কারণ দুটি সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যদি কোনো মুসলমান বৈধ কারণ ছাড়া একটি ফরজ রোজা পূর্ণ না করে তবে সে রোজা পূরণ করতে পারবে না। সারাজীবন রোজা রাখলেও সওয়াব ও আশীর্বাদ হারিয়ে যায়।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা নির্দেশিত রোজা সঠিকভাবে তাকওয়া বাড়ে. অর্থ, শুধু দিনের বেলায় ক্ষুধার্ত থাকা তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে না বরং গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকাজের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নম্বর হাদিসটিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা ও কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তাহলে রোজা তাৎপর্যপূর্ণ হবে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1690 নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস সতর্ক করে যে কিছু রোজাদারদের ক্ষুধা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। যখন কেউ মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ব্যাপারে আরও সচেতন ও সতর্ক হয়ে ওঠে, তখন তারা রোজা রাখে এই অভ্যাসটি শেষ পর্যন্ত তাদের প্রভাবিত করে যাতে তারা রোজা না থাকা সত্ত্বেও একই রকম আচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রকৃত তাকওয়া।

পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতে উল্লিখিত ধার্মিকতা উপবাসের সাথে যুক্ত কারণ উপবাস একজনের মন্দ ইচ্ছা এবং আবেগকে হ্রাস করে। এটি অহংকার এবং পাপের উৎসাহ রোধ করে। কারণ রোজা পেটের ক্ষুধা ও শারীরিক কামনা-বাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই দুটি জিনিস অনেক গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, এই দুটি জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য হারাম জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। সুতরাং যে ব্যক্তি রোজার মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে সে দুর্বল মন্দ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর করবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে রোজার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। রোযার প্রথম এবং সর্বনিম্ন স্তর হল যখন কেউ এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে যা তার রোজা ভঙ্গ করে, যেমন খাবার। পরবর্তী স্তর হল পাপ থেকে বিরত থাকা যা একজনের রোযার ক্ষতি করে যার ফলে তার রোযার সওয়াব কমে যায়, যেমন মিথ্যা বলা। সুনানে আন নাসায়ী, 2235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জড়িত রোজা পরবর্তী স্তর। এটি হল যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ গুনাহ থেকে রোজা রাখে যেমন, চোখ হারামের দিকে তাকানো থেকে, কান হারামের কথা শোনা থেকে ইত্যাদি। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ রোজা না থাকা অবস্থায়ও এইভাবে আচরণ করে। পরিশেষে, সিয়ামের সর্বোচ্চ স্তর হল এমন সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত নয়।

একজন মুসলমানের অভ্যন্তরীণভাবে রোজা রাখা উচিত যেমন তাদের শরীর পাপ বা অসার চিন্তা থেকে বিরত থেকে বাহ্যিকভাবে রোজা রাখে। তাদের ইচ্ছার প্রতি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় অবিচল থেকে রোজা রাখা উচিত এবং তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা উচিত। উপরন্তু, তারা মহান আল্লাহর আদেশকে অভ্যন্তরীণভাবে চ্যালেঞ্জ করা থেকে রোজা রাখা উচিত, এবং এর পরিবর্তে ভাগ্য ছাড়া এবং যা কিছু আল্লাহকে জানার জন্য নিয়ে আসে, মহান আল্লাহ তায়ালা কেবলমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন যদিও তারা এই পছন্দগুলির পিছনে প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের রোজা গোপন রেখে সর্বোচ্চ সওয়াবের লক্ষ্য রাখা এবং অন্যদের না জানানো যদি তা পরিহার করা যায় কারণ অন্যদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জানানো সওয়াবের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কারণ এটি প্রদর্শনের একটি দিক।

প্রবীণ নেতা আরও যোগ করেছেন যে তারা পরাজিত হয়েছে কারণ মুসলমানরা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকির একটি দিক।

একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হল মহান আল্লাহর সাথে, যা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। লোকেদের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই রাখা উচিত যদি না একজনের কাছে একটি বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে যেগুলি একজন পিতামাতা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা শুধুমাত্র শিশুদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উত্সাহিত করে যে প্রতারক হওয়া একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারী, 2227 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে হবেন যে তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারপরে বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে। যার বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ আছেন, তিনি শেষ বিচারের দিন কিভাবে সফল হতে পারেন?

প্রবীণ নেতা আরও যোগ করেছেন যে তারা পরাজিত হয়েছে কারণ মুসলমানরা ভালর আদেশ দেয় এবং মন্দকে নিষেধ করে।

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে। তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ভাল কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা ছেড়ে না দেওয়া। একজন মুসলমানের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলমান অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, শেষ পর্যন্ত তাদের নেতিবাচক আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম বা আপাত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফিল হয়ে গেলেও তাদের পরিবারের মতো তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ কেবল তাদেরই বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন

করা উচিত তাদের নম্র উপায়ে পরামর্শ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেবলমাত্র এইভাবে তারা তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

প্রবীণ নেতা আরও যোগ করেছেন যে তারা পরাজিত হয়েছিল কারণ মুসলমানরা ন্যায়বিচারকে সমর্থন করেছিল।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময় ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। [1] *তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও..."*

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

প্রবীণ নেতা আরও যোগ করেছেন যে তারা পরাজিত হয়েছিল কারণ মুসলমানরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য রাতে দাঁড়িয়েছিল; তারা দিনের বেলা উপবাস করত; তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে; তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে। এবং ন্যায়বিচার সমর্থন করে। যদিও, রোমানরা মদ পান করেছিল, যদিও এটি পাপজনক ছিল।

সুনানে ইবনে মাজা, 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, একজন মুসলিমকে কখনই মদ সেবন করা উচিত নয় কারণ এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি।

দুর্ভাগ্যক্রমে, সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে এই মহাপাপ বৃদ্ধি পেয়েছে । এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি যেমন এটি অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়। এটি বেশ সুস্পষ্ট কারণ একজন মাতাল তাদের জিহ্বা এবং শারীরিক কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মদ্যপানের কারণে কতটা অপরাধ সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য একজনকে কেবল খবরটি দেখতে হবে। এমনকি যারা পরিমিত মদ্যপান করে তারা তাদের শরীরের ক্ষতি করে যা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। অ্যালকোহলের সাথে জড়িত শারীরিক এবং মানসিক রোগগুলি অসংখ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং করদাতাদের উপর একটি ভারী বোঝা সৃষ্টি করে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি একজন ব্যক্তির তিনটি দিককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে যেমন তাদের শরীর, মন এবং আত্মা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

এই আয়াতে শিরকবাদের সাথে যুক্ত জিনিসগুলির পাশে মদ পান করার বিষয়টিকে এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে।

এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যে, সুনানে ইবনে মাজা, 3376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত মদ পান করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সুনানে ইবনে মাজা, 68 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া জান্নাত লাভের চাবিকাঠি । তবুও, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 1017 নম্বরে একটি হাদিস পাওয়া যায়, যারা নিয়মিত মদ পান করে এমন কাউকে অভিবাদন না করার জন্য মুসলমানদের পরামর্শ দেয়।

অ্যালকোহল একটি অনন্য বড় পাপ কারণ এটি সুনানে ইবনে মাজা, 3380 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদীসে দশটি ভিন্ন কোণ থেকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এতে অ্যালকোহল নিজেই অন্তর্ভুক্ত, যিনি এটি তৈরি করেন, যার জন্য এটি তৈরি করা হয়, যার জন্য যে এটি বিক্রি করে, যে এটি ক্রয় করে, যে এটি বহন করে, যার কাছে এটি বহন করা হয়, যে এটি বিক্রি করে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে, যে এটি পান করে এবং যে এটি ঢেলে দেয়। যে ব্যক্তি এইভাবে

অভিশপ্ত কিছু নিয়ে কাজ করে সে প্রকৃত সফলতা পাবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

প্রবীণ নেতা আরও যোগ করেছেন যে তারা পরাজিত হয়েছিল কারণ মুসলমানরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য রাতে দাঁড়িয়েছিল; তারা দিনের বেলা উপবাস করত; তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে; তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে। এবং ন্যায়বিচার সমর্থন করে। অন্যদিকে, রোমানরা অবৈধ সম্পর্কে অংশ নিয়েছিল।

এটি আল ফুরকান 25 অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, আয়াত 68:

"...এবং বেআইনি যৌন মিলন করবেন না। আর যে এটা করবে তাকে শাস্তি দিতে হবে।"

মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা সকল প্রকার অবৈধ সম্পর্ক পরিহার করে। এই আয়াতে যে ব্যভিচারকে শিরকের পাশে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে তা এর তীব্রতা নির্দেশ করে।

অবৈধ সম্পর্কের প্রলোভন এড়াতে মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমত, তাদের দৃষ্টি নত করতে শেখা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজনকে সর্বদা তাদের জুতার দিকে তাকাতে হবে তবে এর অর্থ হল তাদের চারপাশে অপ্রয়োজনীয় বিশেষ করে সর্বজনীন স্থানে তাকানো এড়ানো উচিত।

তাদের উচিত অন্যের দিকে তাকানো এড়ানো এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা। একজন মুসলিম যেমন পছন্দ করে না যে কেউ তার বোন বা কন্যার দিকে তাকায়, সে অন্য লোকের বোন এবং কন্যাদের দিকে তাকাবে না। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 30:

"মুমিন পুরুষদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি[1] কম করে এবং তাদের গোপনাঙ্গ হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র..."

যখনই সম্ভব একজন মুসলমানের বিপরীত লিঙ্গের সাথে একা সময় কাটানো এড়িয়ে চলা উচিত যদি না তারা এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যা বিবাহ নিষিদ্ধ করে। সহীহ বুখারী, 1862 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই পরামর্শ দিয়েছেন।

মুসলমানদের পোশাক পরিধান করা এবং শালীন আচরণ করা উচিত। শালীনভাবে পোশাক পরা অপরিচিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এড়ায় এবং বিনয়ী আচরণ করা একজনকে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে যা একটি অবৈধ সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে যেমন বিপরীত লিঙ্গের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কথা বলা।

অবৈধ সম্পর্ক এড়ানোর আশীর্বাদ বোঝা তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার আরেকটি উপায়। যেমন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিহ্বা ও সতীত্ব রক্ষাকারীকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। জামি আত তিরমিযী, 2408 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অবৈধ সম্পর্কে জড়িত থাকার শাস্তির ভয়ে একজন মুসলিমকেও তাদের এড়াতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করছে তার থেকে ঈমান চলে যাবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4690 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাস্তবে, একজন মুসলিমের অবৈধ সম্পর্কের প্রয়োজন নেই যেহেতু ইসলাম বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে। যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তাদের প্রায়ই রোজা রাখা উচিত কারণ এটি একজনের ইচ্ছা এবং কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। সহীহ মুসলিমের ৩৩৯৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রবীণ নেতা আরও যোগ করেছেন যে তারা পরাজিত হয়েছিল কারণ মুসলমানরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য রাতে দাঁড়িয়েছিল; তারা দিনের বেলা উপবাস করত; তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে; তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে। এবং ন্যায়বিচার সমর্থন করে। অন্যদিকে, রোমানরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল এবং প্রকাশ্যে অন্যদের উপর অত্যাচার করেছিল।

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলিমকে অবশ্যই ঈমানের দুটি দিক পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে জীবন থেকে দূরে রাখে এবং অন্যদের সম্পত্তি।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু মানুষ এতটা ক্ষমাশীল নয় একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা তাদের মূল্যবান নেক আমল কিয়ামতের দিন কেড়ে নিয়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে। এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে। তাই উভয় জগতে সফলতা লাভের জন্য মুসলমানদের জন্য তাদের কর্তব্যের উভয় দিক পালনে সচেষ্ট হওয়া জরুরী।

প্রবীণ নেতা আরও যোগ করেছেন যে তারা পরাজিত হয়েছিল কারণ মুসলমানরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য রাতে দাঁড়িয়েছিল; তারা দিনের বেলা উপবাস করত; তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে; তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে। এবং ন্যায়বিচার সমর্থন

করে। অথচ, রোমানরা মন্দ কাজের আদেশ দিত এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে নিষেধ করত।

ভন্ডামির একটি অংশ হল যে একজন ব্যক্তি কেবল নিজেরাই খারাপ কাজ করে না এবং সৎ কাজ থেকে বিরত থাকে তবে তারা অন্যকেও একই কাজ করতে উত্সাহিত করে। তারা চায় অন্যরা তাদের মতো একই নৌকায় থাকুক যাতে তারা তাদের খারাপ চরিত্রে কিছুটা স্বস্তি পায়। তারা শুধু নিজেরাই ডুবে না, অন্যকেও তাদের সাথে নিয়ে যায়। মুসলমানদের অবশ্যই জানা উচিত যে একজন ব্যক্তি তাদের আমন্ত্রণের কারণে পাপ করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জবাবদিহি করা হবে। এই ব্যক্তিকে এমনভাবে গণ্য করা হবে যেন সে পাপ করেছে যদিও সে অন্যদেরকে এর দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 203 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই কারণেই কেউ কেউ বলেছেন যে ধন্য সেই ব্যক্তি যার মন্দ তাদের সাথে মারা যায় কারণ অন্যরা তাদের মন্দ উপদেশে কাজ করলে তাদের পাপ বৃদ্ধি পাবে যদিও তারা আর নেই। জীবিত

প্রবীণ নেতা আরও যোগ করেছেন যে তারা পরাজিত হয়েছিল কারণ মুসলমানরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য রাতে দাঁড়িয়েছিল; তারা দিনের বেলা উপবাস করত; তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে; তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে। এবং ন্যায়বিচার সমর্থন করে। অথচ রোমানরা পৃথিবীতে দুর্নীতি ছড়িয়ে দিয়েছে।

দুর্নীতি হল যখন একজন ব্যক্তি তার কাছে থাকা আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, বিশেষ করে তাদের সামাজিক প্রভাব, পার্থিব জিনিস, যেমন ক্ষমতা এবং সম্পদ লাভের জন্য। এটি মহান আল্লাহর প্রতি একজন মুসলিমের কর্তব্যকে প্রভাবিত

করে এবং মানুষের বিরুদ্ধে অনেক পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন নিপীড়ন।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে যখন সাধারণ জনগণ একে অপরের সাথে আর্থিকভাবে প্রতারণা করে, তখন মহান আল্লাহ তাদের উপর অত্যাচারী নেতা নিয়োগ করে তাদের শাস্তি দেন। এই নিপীড়নের একটি দিক হলো দুর্নীতি যা সাধারণ জনগণকে চরম দুর্ভোগের কারণ। একই হাদিস সতর্ক করে যে, যখন সাধারণ জনগণ মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা পরাভূত হবে যারা তাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। আবার, এটি দুর্নীতির একটি দিক যেখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা, যেমন সরকারি কর্মকর্তারা পরিণতির ভয় ছাড়াই অন্যের জিনিসপত্র অবাধে নিয়ে যায়। যখন সাধারণ জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তখন তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিরা এই আচরণকে সাধারণ জনগণ গ্রহণ করে বলে বিশ্বাস করে একইভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়। এটি জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে তবে তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা দুর্নীতিগ্রস্তভাবে কাজ করার সাহস করবে না এবং সাধারণ জনগণ এর পক্ষে দাঁড়াতে পারবে না। এবং পূর্বে উদ্ধৃত হাদিস অনুসারে, সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে তিনি তাদের প্রভাবশালী পদে লোক নিয়োগ করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবেন যারা ন্যায়বিচারে রয়েছেন।

বিশ্বে পরিলক্ষিত ব্যাপক দুর্নীতির জন্য অন্যকে দোষারোপ করার অপরিপক্ক পথ না নিয়ে মুসলমানদের উচিত তাদের নিজেদের আচরণের প্রতি সত্যিকারভাবে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তাদের মনোভাবকে সামঞ্জস্য করা। তা না হলে সময়ের সাথে সাথে সমাজে দুর্নীতি বাড়বে। কেউ বিশ্বাস করবেন না

যে তারা প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে না থাকায় সমাজে ঘটে যাওয়া দুর্নীতির উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। এই আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত দুর্নীতি সাধারণ জনগণের নেতিবাচক আচরণের কারণে ঘটে এবং তাই সাধারণ জনগণের ভালো আচরণের মাধ্যমেই তা দূর করা যায়। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 11:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করে..."

প্রবীণ নেতা আরও যোগ করেছেন যে তারা পরাজিত হয়েছিল কারণ মুসলমানরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য রাতে দাঁড়িয়েছিল; তারা দিনের বেলা উপবাস করত; তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে; তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে। এবং ন্যায়বিচার সমর্থন করে। যেখানে, রোমানরা মদ পান করত; অবৈধ সম্পর্কে অংশ নিয়েছে; তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে; অন্যদের নিপীড়িত; মন্দ কাজের আদেশ এবং মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট যা হারাম; এবং পৃথিবীতে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়। এই উত্তর শুনে রোমান রাজা হারাকল নিশ্চিত করলেন যে তিনি সত্য বলেছেন।

বোঝার জন্য একটি চূড়ান্ত বিষয় হল যে এই বৈশিষ্ট্যগুলির কোনটিই যুদ্ধের সাথে যুক্ত নয় তবুও এগুলিকে মুসলিম বিজয় এবং রোমানদের পরাজয়ের কারণ হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন ব্যক্তির প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপগুলি তাদের জীবনের সমস্ত দিকের সাফল্য এবং শান্তিকে প্রভাবিত করে। অর্থ, একজন মুসলমান কেবল নামাজের সময় মুসলমান হিসাবে আচরণ করতে পারে না, যা সম্পূর্ণ হতে দিনের এক ঘণ্টারও কম সময় লাগে। বরং তাদের অবশ্যই প্রতি নিঃশ্বাসে ইসলামের শিক্ষার অনুশীলন করতে হবে। অন্যথায় তারা তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাফল্য ও

শান্তি অর্জন করতে পারবে না। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এই বাস্তবতা সুস্পষ্ট, সুস্পষ্ট, অথচ আজ মুসলমানদের দ্বারা উপেক্ষিত।

কঠোরভাবে সত্য অনুসরণ

হযরত আবু বক্কর (রা.) তার নেতা ও সৈন্যদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন যার ফলে তারা ইসলামের সীমা অতিক্রম না করে, এমনকি তাদের কর্মকাণ্ড ন্যায়সঙ্গত মনে হলেও। তিনি সকলকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়ে এটি অর্জন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, একবার তার একজন নেতার প্রেরিত একজন বার্তাবাহক তার সাথে রোমানদের একজন নেতার কাটা মাথা নিয়ে এসেছিলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হন এবং যখন তাঁকে বলা হয় যে, যুদ্ধের সময় রোমানরা মুসলমানদের সাথে এইরকম আচরণ করে, তখন তিনি তাদের তিরস্কার করেন যে, তিনি কি রোমান ও পারস্যদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করবেন? , এর ফলে ইসলামের শিক্ষা ত্যাগ করা। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৬৯২-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের অমুসলিমদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ ও গ্রহণ করা উচিত নয়। যত বেশি মুসলিমরা এটি করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্য অনুসরণ করবে। এই দিন এবং যুগে এটি বেশ স্পষ্ট হয় কারণ অনেক মুসলিম অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করেছে যার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের দ্বারা কতগুলি অ-মুসলিম সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজনকে কেবলমাত্র আধুনিক মুসলিম বিবাহ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যা এটিকে আরও খারাপ করে তোলে তা হল যে অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে ইসলামিক অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এই কারণে অমুসলিমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না যা ইসলামের জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, অনার কিলিং হল একটি সাংস্কৃতিক প্রথা

যার ইসলামের সাথে এখনও কোন সম্পর্ক নেই কারণ মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং অমুসলিম সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করার অভ্যাসের কারণে সমাজে যখনই অনার কিলিং ঘটে তখনই ইসলামকে দায়ী করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে একত্রিত করার জন্য জাতি ও ভ্রাতৃত্বের আকারে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন তবুও অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক চর্চা অবলম্বন করে অজ্ঞ মুসলিমরা তাদের পুনরুত্থিত করেছে। সহজ কথায়, মুসলমানরা যত বেশি সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করবে, তারা পবিত্র কোরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর তত কম কাজ করবে।

আল্লাহর শক্তি (SWT)

মুসলিমরা কেন অসম্ভব পরিস্থিতির মুখে এত কঠিন লড়াই করেছিল এবং সফল হয়েছিল তার একটি প্রধান কারণ ছিল মহান আল্লাহ তায়ালার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও ইচ্ছা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান। তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের মৃত্যু একটি নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় সময়ের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল, তাই যুদ্ধ করা বা পালিয়ে যাওয়া এটি পরিবর্তন করবে না। তারা তাদের গৃহে লুকিয়ে থাকলেও তাদের যা মুখোমুখি হতে হবে তা ঘটবে। সুতরাং মহান আল্লাহ ও তাঁর আনুগত্যের পথে জিহাদ করা থেকে লজ্জা পাওয়ার কোন মানে হয় না।

জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহর অসীম এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে সমগ্র সৃষ্টি যদি একজন ব্যক্তির উপকার করতে পারে না। মহান আল্লাহ তাদের তা করতে চাননি। একইভাবে, মহান আল্লাহ না চাইলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রে কারো ক্ষতি করতে পারে না। এর অর্থ একমাত্র মহান আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত দেন তা মহাবিশ্বের মধ্যে ঘটে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই উপদেশটি ওষুধের মতো উপায় ব্যবহার ত্যাগ করার ইঙ্গিত দেয় না, তবে এর মানে হল যে কেউ উপায়গুলি ব্যবহার করতে পারে কারণ সেগুলি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তৈরি করেছেন, তবে তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে মহান আল্লাহই সকল কিছুর ফলাফল নির্ধারণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা অনেক অসুস্থ ব্যক্তি যারা ওষুধ খান এবং তাদের অসুস্থতা থেকে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তারা অন্য যারা ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয় না। এটি ইঙ্গিত করে যে আরেকটি কারণ চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করে, তা হল মহান আল্লাহর ইচ্ছা। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

"বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত আমরা কখনই আঘাত করব না..."

যিনি এটি বোঝেন তিনি জানেন যে তাদের প্রভাবিত করে এমন কিছু এড়ানো যেত না। এবং যে জিনিসগুলি তাদের মিস করেছে সেগুলি কখনই পাওয়া যেত না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, শেষ ফলাফল যাই হোক না কেন তা একজন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাদের ধৈর্য ধরে থাকা উচিত এবং সত্যই বিশ্বাস করা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম নির্বাচন করেছেন যদিও তারা ফলাফলের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যখন কেউ এই সত্যটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে তখন তারা সৃষ্টির উপর নির্ভর করা বন্ধ করে দেয় যে তারা জন্মগতভাবে তাদের ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। পরিবর্তে, তারা মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সমর্থন ও সুরক্ষা কামনা করে। এটি একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দিকে পরিচালিত করে। এটি একজনকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে ভয় করতে

উত্সাহিত করে, কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টি তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

নিজের জীবনে এবং মহাবিশ্বের মধ্যে যা কিছু ঘটে তা সবই মহান আল্লাহর কাছ থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা স্বীকার করা, মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝার একটি অংশ। এটি এমন একটি বিষয় যার কোন শেষ নেই এবং এটি কেবলমাত্র অতিমাত্রায় বিশ্বাস করার বাইরে চলে যায় যে মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। যখন এটি কারও হৃদয়ে স্থির হয় তখন তারা কেবল মহান আল্লাহর উপর আশা করে, তারা জানে যে একমাত্র তিনিই তাদের সাহায্য করতে পারেন। তারা কেবল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করবে এবং আনুগত্য করবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পেতে বা কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য অন্যের আনুগত্য করে। একমাত্র মহান আল্লাহই এটি প্রদান করতে পারেন তাই কেবলমাত্র তিনিই আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। যদি কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যের আনুগত্য পছন্দ করে, তাহলে তারা বিশ্বাস করে যে এই অন্যটি তাদের কোন প্রকার উপকার বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। এটা তাদের ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। যা কিছু ঘটে তার উৎস মহান আল্লাহ, তাই মুসলমানদের কেবল তাঁরই আনুগত্য করা উচিত। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 2:

"আল্লাহ মানুষকে যা কিছু রহমত দান করেন- কেউ তা আটকাতে পারে না; এবং যা তিনি আটকে রাখেন - এরপর কেউ তা ছেড়ে দিতে পারে না..."

উল্লেখ্য যে, এমন ব্যক্তির আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহর আনুগত্যকে উৎসাহিত করে, বাস্তবে মহান আল্লাহকে মান্য করা। যেমন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করা। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

উপলব্ধি

মুসলিমরা কেন অসম্ভব পরিস্থিতির মুখে এত কঠিন লড়াই করেছিল এবং সফল হয়েছিল তার একটি বড় কারণ ছিল তাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা। ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে তারা এই জড় জগতের তুলনায় আখেরাতের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ তারা মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মানতে পিছপা হয়নি, যদিও এর অর্থ নিশ্চিত মৃত্যুই হয়। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, পরকালের অনন্তকালের জন্য এই দুনিয়ার মুহূর্ত এবং পরকালের সাগরের জন্য এই দুনিয়ার বিন্দু বিন্দু বিসর্জন দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

মুসলমানদের জন্য সঠিক উপলব্ধি গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। ধার্মিক পূর্বসূরিদের কাছে এটিই ছিল এবং এটি তাদের জড় জগতের অতিরিক্ত বিলাসিতা এড়িয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উত্সাহিত করেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দু'জন লোক অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত এবং এক কাপ ঘোলা জল জুড়ে আসে। তারা উভয়েই তা পান করতে চায় যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এবং এর অর্থ হলেও তাদের এটি নিয়ে বিতর্ক করতে হবে। তাদের তৃষ্ণা বাড়ার সাথে সাথে ঘোলা জলের কাপের উপর আরও বেশি মনোযোগ দেয় তারা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তারা অন্য সমস্ত কিছুর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং বিশুদ্ধ পানির একটি নদী দেখে যা কেবলমাত্র অল্প দূরত্বে ছিল তারা অবিলম্বে পানির কাপের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে যেখানে তারা আর এটিকে গুরুত্ব দেবে না এবং এটি নিয়ে আর বিতর্ক করবে না। এবং পরিবর্তে তারা তাদের তৃষ্ণা সহ্য করবে ধৈর্য সহকারে জানবে যে একটি বিশুদ্ধ জলের নদী কাছাকাছি। যে ব্যক্তি নদী সম্পর্কে অবগত নয় সে সম্ভবত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখে অন্য

ব্যক্তিকে পাগল বলে বিশ্বাস করবে। এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষের অবস্থা। একদল লোভের সাথে বস্তুজগতের দিকে মনোনিবেশ করে। অন্য দলটি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে পরকাল এবং সেখানের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন নেয়ামতের দিকে। যখন কেউ তাদের আখেরাতের সুখের দিকে মনোনিবেশ করে তখন পার্থিব সমস্যাগুলি এত বড় ব্যাপার বলে মনে হয় না। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এই জগতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তবে তাদের কাছে সবকিছুই মনে হবে। তারা এর জন্য তর্ক করবে, লড়াই করবে, ভালবাসবে এবং ঘৃণা করবে। ঠিক যেমন আগে উল্লিখিত উদাহরণের ব্যক্তির মতো যিনি শুধুমাত্র ঘোলা জলের কাপে ফোকাস করেন।

এই সঠিক উপলব্ধি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

কিভাবে সফল হতে হয়

মুসলিমরা ইতিহাসের দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাশক্তিকে উৎখাত করতে সক্ষম হওয়ার একটি বড় কারণ: রোমান এবং পারস্য, এই সুপার পাওয়ারগুলির আচরণের সাথে যুক্ত। তাদের অধিকাংশ নেতা ও সাধারণ জনগণ অন্যায় ও পাপে নিমজ্জিত হয়েছিল এবং রোমান খ্রিস্টানরা তাদের ঐশী কিতাবের শিক্ষা পরিত্যাগ করেছিল। একটি সমাজ যখন অবক্ষয়ের এই স্তরে পৌঁছায় তখন তাদের ধ্বংস হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। যারা সত্য চায় তাদের জন্য ইতিহাস এই বাস্তবতাকে প্রাণবন্তভাবে এঁকেছে।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ অথচ গভীর পাঠ বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা কখনো ইহকাল বা পরকালে পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সফল হতে পারবে না। কালের ঊষালগ্ন থেকে এই যুগ পর্যন্ত এবং শেষ সময় পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারেনি এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে কখনোই হবে না। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অতএব, যখন একজন মুসলমান এমন একটি পরিস্থিতিতে থাকে যা থেকে তারা একটি ইতিবাচক এবং সফল ফলাফল অর্জন করতে চায় তখন তাদের কখনই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা বেছে নেওয়া উচিত নয়, তা যতই প্রলুব্ধ বা সহজ মনে হোক না কেন। এমনকি যদি একজনকে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়রা তা করার পরামর্শ দেয় কারণ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কখনই মহান আল্লাহ ও তাঁর শাস্তি থেকে তাদের এই দুনিয়া বা পরকালে রক্ষা করতে পারবে না। একইভাবে, মহান আল্লাহ, যারা তাঁর আনুগত্য করে তাদের সাফল্য দান করেন তিনি তাঁর অবাধ্যদের থেকে একটি সফল পরিণতি সরিয়ে দেন যদিও এই অপসারণটি সাক্ষী হতে সময় লাগে। একজন মুসলিমকে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি শীঘ্রই বা পরে ঘটবে। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছে যে, এই শাস্তি বিলম্বিত হলেও একটি মন্দ পরিকল্পনা বা কর্ম কেবলমাত্র কর্মকারীকে বেষ্টন করে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ব্যতীত ঘিরে রাখে না..."

অতএব, পরিস্থিতি এবং পছন্দ যতই কঠিন হোক না কেন মুসলমানদের সর্বদা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেওয়া উচিত কারণ এই সাফল্য অবিলম্বে স্পষ্ট না হলেও উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।

হৃদয় বাঁক

এটা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ্য যে, যদিও ইসলামি সাম্রাজ্যের কিছু অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে তবুও ইতিহাসের অন্য সব সাম্রাজ্যের বিপরীতে ভূমি বা ক্ষমতা লাভ করা লক্ষ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী ভূখন্ডের জনগণকে ইসলামের শিক্ষা শোনার সুযোগ দেওয়া, যা বিদেশী শক্তি দ্বারা বাধা দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যেহেতু ইসলাম একটি বিশ্বাস যা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে হবে, তাই তরবারির মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ আয়াত 256:

"ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি থাকবে না। সঠিক পথ ভুল থেকে আলাদা হয়ে গেছে..."

হযরত আবু বক্কর (রাঃ) তাঁর নেতাদের এবং সৈন্যদের সদ্য বিজিত ভূখন্ডের নাগরিকদের অধিকারকে সম্মান করতে এবং পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা একই অধিকার দিয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে সকল মুসলমানের পাওনা, যদিও তারা সম্প্রতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা হয় এবং এর মাধ্যমে বহু মানুষ ইসলামের ব্যাপক উপকারিতা ও সত্যতা প্রত্যক্ষ করে ইসলাম গ্রহণ করে। লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক, মুসলমানরা ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করার কারণে নাগরিকদের আনুগত্য অর্জন করেছিল।

বক্তৃতা বিপদ

উমর ইবনে খাত্তাব একবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসেছিলেন, যখন আবু বকর তাঁর নিজের জিহ্বা টানছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে থামতে অনুরোধ করলেন যার উত্তরে তিনি বললেন যে তার জিহ্বা তাকে বিপজ্জনক স্থানে নিয়ে এসেছে। ইমাম মালিকের, মুওয়াত্তা, বই 56, হাদিস নম্বর 12-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

এর অর্থ হল যে ব্যক্তি অনর্থক বা মন্দ কথা থেকে চুপ থাকে এবং কেবল ভাল কথা বলে তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ রক্ষা করবেন। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রধান কারণ তাদের কথাবার্তা। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিচারের দিন একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয় যা জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, সংখ্যা 2314।

বক্তৃতা তিন প্রকার হতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথাবার্তা যা যেকোনো মূল্যে পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়টি হল অনর্থক বক্তৃতা যা শুধুমাত্র একজনের সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনার কারণ হবে। উপরন্তু,

পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রথম ধাপ প্রায়ই অসার বক্তৃতা. তাই এই ধরনের কথাবার্তা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। চূড়ান্ত প্রকারটি ভাল বক্তৃতা যা সর্বদা গ্রহণ করা উচিত। এই দিকগুলির উপর ভিত্তি করে একজনের জীবন থেকে কথার দুই তৃতীয়াংশ মুছে ফেলা উচিত।

উপরন্তু, যারা খুব বেশি কথা বলে সে কেবল তাদের কর্ম এবং পরকালের প্রতি একটু ভাববে কারণ এর জন্য নীরবতা প্রয়োজন। এটি একজনকে তাদের কাজের মূল্যায়ন থেকে বিরত রাখবে যা একজনকে আরও সৎ কাজ করতে এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে। এই ব্যক্তি তখন আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকবে।

পরিশেষে, যারা খুব বেশি কথা বলে তারা প্রায়শই পার্থিব বিষয় এবং বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা বিনোদন এবং মজাদার। এটি তাদের এমন একটি মানসিকতা অবলম্বন করবে যার ফলে তারা মৃত্যু এবং পরকালের মতো গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করা বা শুনতে অপছন্দ করে। এটি তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে যা একটি বড় অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

এই সব এড়ানো যেতে পারে যদি কেউ পাপপূর্ণ এবং নিরর্থক কথাবার্তা থেকে নীরব থাকে এবং পরিবর্তে কেবল ভাল কথা বলে। অতএব, যে এভাবে নীরব থাকবে সে দুনিয়াতে কষ্ট ও পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

প্রতিবেশীদের সম্মান করা

আবু বকর একবার আবদুর রহমান ইবনে আউফের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন আবদুর রহমান তার প্রতিবেশীর সাথে তর্ক করছিল। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেছিলেন যে তার প্রতিবেশীর সাথে তর্ক করবেন না, কারণ অন্যরা তাদের ছেড়ে যাওয়ার পরে তারা একজন ব্যক্তির সাথে থাকবে। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা 95-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারী, 6014 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে প্রতিবেশীদের সাথে এমনভাবে সদয় আচরণ করার জন্য তাকে উত্সাহিত করা হয়েছিল যে তিনি মনে করেছিলেন যে একজন প্রতিবেশী প্রতিটি মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হওয়া সত্ত্বেও তার দায়িত্ব প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। প্রথমত, এটা লক্ষ করা জরুরী যে ইসলামে একজন ব্যক্তির প্রতিবেশী সেই সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে যারা চল্লিশ ঘরের মধ্যে বসবাস করে। প্রতিটি দিকে একজন মুসলমানের বাড়ির দিকে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 109 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস থেকে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৭৪ নম্বর হাদিসে প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং বিচার দিবসকে সংযুক্ত করেছিলেন । শুধুমাত্র এই হাদিসটিই প্রতিবেশীদের সাথে সদয় আচরণের গুরুত্ব বোঝাতে যথেষ্ট। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন মহিলা যে তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং অনেক স্বেচ্ছায় ইবাদত করেছে সে জাহান্নামে যাবে কারণ সে তার বক্তৃতার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। যদি কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে, তাহলে তার প্রতিবেশীর শারীরিক ক্ষতি কতটা গুরুতর তা কল্পনা করা যায়?

প্রতিবেশী দ্বারা দুর্ব্যবহার করলে একজন মুসলমানকে ধৈর্য ধরতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সাথে এই ধরনের ক্ষেত্রে সদয় আচরণ করা। ভালো দিয়ে ভালো শোধ করা কঠিন নয়। একজন ভালো প্রতিবেশী সেই যে তার ক্ষতির প্রতিদান ভালো দিয়ে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের প্রতিবেশীর সম্পত্তির ব্যক্তিগত স্থানকে সম্মান করা তবে একই সাথে তাদের অভ্যর্থনা জানানো এবং খুব বেশি হস্তক্ষেপ না করে তাদের সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়া। আর্থিক বা মানসিক সমর্থনের মতো একজন ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ যে কোনো উপায়ে তাদের সমর্থন করা উচিত।

একজন মুসলিমের উচিত সবসময় প্রতিবেশীর দোষ গোপন রাখা । যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করেন। আর যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন এবং প্রকাশ্যে তাদের অপমানিত করবেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4880 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সমস্ত অসুবিধা

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন মুসলমানকে সবকিছুর জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়, এমনকি পাথরের আঘাতে ব্যথা, তাদের জুতার চাবুক ভেঙ্গে যাওয়া বা এমন কিছু যা তারা হারিয়ে গেছে বলে মনে করে এবং তারপর তারা তাদের পোশাকে তা খুঁজে পায়। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা 99-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 492 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিমকে তার আকার নির্বিশেষে কোন ধরণের শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না, যেমন ছিদ্র করা। একটি কাঁটা, বা কোনো মানসিক অসুবিধা, যেমন চাপ, মহান আল্লাহ ছাড়া, এটি কারণে তাদের পাপ মুছে ফেলা হয়.

এটি ছোট পাপকে বোঝায় কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। এই পরিণতি ঘটে যখন একজন মুসলিম কষ্টের শুরু থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক লোক বিশ্বাস করে যে তারা প্রথমে অভিযোগ করতে পারে এবং পরে ধৈর্য দেখায়। এটি সত্য ধৈর্য নয় বরং এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা যা সময়ের সাথে সাথে ঘটে। সুনানে আন নাসাই, 1870 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে সারা জীবন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে কারণ একজন ব্যক্তি অধৈর্যতা দেখিয়ে তার পুরস্কার নষ্ট করতে পারে।

একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, তাদের ছোটখাট পাপগুলোকে এই অসুবিধার মধ্য দিয়ে মুছে ফেলার পর বিচার দিবসে পৌঁছানো অনেক ভালো।
একজন মুসলমানের উচিত ক্রমাগত অনুতপ্ত হওয়া এবং তাদের ছোটখাটো পাপ মোচনের জন্য সৎ কাজ করার চেষ্টা করা। এবং যদি তারা কোন শারীরিক বা মানসিক অসুবিধার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত তাদের ছোটখাট পাপ মুছে ফেলার এবং একটি অগণিত পুরস্কার পাওয়ার আশায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

সঠিকভাবে জিনিস ব্যবহার

তাঁর খিলাফতকালে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বাড়ি ছিল, যা সরকারি কোষাগার হিসেবে কাজ করত, যা প্রথমে মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল। পরে, এটি মদিনার কেন্দ্রীয় অংশে, তার বাড়ির মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। তিনি কখনও এটির উপর একজন প্রহরী নিয়োগ করেননি এবং পরিবর্তে এটি একটি তালা দিয়ে সুরক্ষিত করেছিলেন। যখনই কোন সরকারী সম্পদ তাঁর কাছে আসত তখনই তিনি তা সরকারী কোষাগারে জমা করতেন কিন্তু দ্রুত তা অভাবগ্রস্তদের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করার অভ্যাস ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু বক্কর কর্তৃক নিযুক্ত দুই ট্রাস্টির সাথে সরকারী কোষাগারে প্রবেশ করেন: আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। সেখানে প্রবেশ করার পর তারা ভিতরে কিছুই দেখতে পেল না, কারণ আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করা অপছন্দ করতেন। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা পৃষ্ঠা ৬৭-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, এমন একটি সত্য বুঝতে পেরেছিলেন যা আজকে অনেকেই উপেক্ষা করে, যেমন, সম্পদ তখনই উপযোগী হয় যখন এটি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা হয়। মজুদ করা বা এর অপব্যবহার এই সুবিধাকে বাধা দেয়।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়।

উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং কোন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

আবু বক্কর (রাঃ) এর অন্তিম অসুস্থতা

বাকি ফোকাসড

যখন খালিদ বিন ওয়ালিদ সিরিয়ার দিকে রওনা হন, তখন আল মুথান্নাহ ইবনে হারিদাহ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, ইরাক অভিযানের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পৌঁছা পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি ইরাক অভিযান শেষ করার জন্য পূর্ববর্তী মুরতাদদের মধ্যে কয়েকজনকে তালিকাভুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যারা এখন অনুতপ্ত হয়ে ইসলামের ভাঁজে ফিরে এসেছে। তিনি আবু বক্কর (রাঃ) এর কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য সাড়া পাননি এবং তারপরে ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যখন মদিনায় পৌঁছান তখন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। যদিও তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন, এটি তাকে মানুষের সেবা করার জন্য তার প্রচেষ্টাকে মনোনিবেশ করা থেকে বিরত করেনি। তিনি উমর ইবনে খাত্তাবকে আল মুথান্নার অনুরোধ পূরণের নির্দেশ দেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের উভয়কে তাদের উপর যে বিপদই আসুক না কেন, মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকার আহ্বান জানান। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৬১৪-৬১৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আবু বক্কর (রাঃ) তাঁর মৃত্যুশয্যায়ও ইসলাম ও জনগণের সেবায় মনোনিবেশ করা তাঁর অটল প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এই বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহর অবিচল আনুগত্যে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের

অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

পরবর্তী খলিফা মনোনীত - উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)

পরামর্শ চাচ্ছেন

তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ইসলামের পরবর্তী খলিফা মনোনীত করার ব্যাপারে সিনিয়র সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ চেয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 724-725।

মুসলমানদের উচিত তাদের বিষয়ে কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করা। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতে স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যেমন তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকা হবে, তেমনি

একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা।

উপরন্তু, একজন মুসলিম শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

বৃহত্তর ভালোর জন্য

তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ইসলামের পরবর্তী খলিফা মনোনীত করার ব্যাপারে সিনিয়র সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ চেয়েছিলেন। প্রত্যেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হতে পারেন, যাদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছিল যে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন, কারণ তিনি নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন, আবু বক্করের পরে দ্বিতীয়। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 724-725।

সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় যে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু পার্থিব কারণ যেমন পারিবারিক বন্ধন, বন্ধুত্ব ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পরবর্তী খলিফাকে বিবেচনা করছিলেন না। তিনি তার পুত্রের মত কোন আত্মীয়কে নিয়োগ করেননি। তার নাম চালিয়ে যেতে। আজকের নেতাদের থেকে ভিন্ন, তার সিদ্ধান্ত ছিল শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, এবং কাজের জন্য কে সেরা তার উপর ভিত্তি করে।

ধার্মিক পূর্বসূরিদের মৃত্যুর পর থেকে মুসলিম জাতির শক্তি নাটকীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা যৌক্তিক যে একটি দলে যত বেশি লোকের সংখ্যা তত বেশি হবে সেই দলটি তত শক্তিশালী হবে কিন্তু মুসলিমরা কোনো না কোনোভাবে এই যুক্তিকে অস্বীকার করেছে। মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মুসলিম জাতির শক্তি কমেছে। এটি হওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2 এর সাথে সংযুক্ত:

"... আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে কোনো ভালো বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কোনো বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন না করতে। ধার্মিক পূর্বসূরিরা এটিই করেছে কিন্তু অনেক মুসলিম তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক মুসলমান এখন তারা কী করছে তা দেখার পরিবর্তে কে একটি কাজ করছে তা পর্যবেক্ষণ করে। যদি ব্যক্তিটি তাদের সাথে সংযুক্ত থাকে, উদাহরণস্বরূপ, একটি আত্মীয়, তারা তাদের সমর্থন করে যদিও জিনিসটি ভাল না হয়। একইভাবে, যদি ব্যক্তির সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক না থাকে তবে জিনিসটি ভাল হলেও তারা তাদের সমর্থন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই মনোভাব ধার্মিক পূর্বসূরিদের ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা এটি করছে তা নির্বিশেষে তারা ভালভাবে অন্যদের সমর্থন করবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের উপর আমল করতে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে তারা এমনকি তাদের সমর্থন করবে যেগুলিকে তারা মেনে নিতে পারেনি যতক্ষণ না এটি একটি ভাল জিনিস ছিল।

এর সাথে যুক্ত আরেকটি বিষয় হল যে অনেক মুসলিম একে অপরকে ভালোভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা যাকে সমর্থন করছে তাদের থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে। এই অবস্থা এমনকি পণ্ডিত এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করেছে। তারা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য না করার জন্য খোঁড়া অজুহাত তৈরি করে কারণ তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই এবং তারা ভয় করে যে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভুলে যাবে এবং তারা যাদের সাহায্য করবে তারা সমাজে আরও সম্মান অর্জন করবে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ সত্যকে পর্যবেক্ষণ করতে ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা হয়, ততক্ষণ অন্যদের ভাল কাজে সহায়তা করা সমাজে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে আনবেন যদিও তাদের সমর্থন

অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সহজেই খিলাফতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন এবং তাঁর পক্ষে প্রচুর সমর্থন পেতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, আবু বক্কর সিদ্দিককে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত করা। উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তিনি অন্য ব্যক্তিকে সমর্থন করলে সমাজের দ্বারা ভুলে যাওয়া নিয়ে চিন্তা করেননি। তিনি পরিবর্তে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের আদেশ পালন করেছেন এবং যা সঠিক তা সমর্থন করেছেন। সহীহ বুখারি নম্বর 3667 এবং 3668 তে পাওয়া হাদিসগুলিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্মান ও সম্মান শুধুমাত্র এই কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যারা সচেতন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট।

মুসলমানদের অবশ্যই এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে এবং যারাই এটি করছে তা নির্বিশেষে অন্যদের ভালো করতে সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং তাদের সমর্থন তাদের সমাজে বিস্মৃত হওয়ার ভয়ে পিছপা হবে না। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো বিস্মৃত হবে না। প্রকৃতপক্ষে উভয় জগতেই তাদের সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

নেতৃত্বের ভয়ে

আবু বক্কর যখন উমর ইবনে খাত্তাবকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন পরবর্তী খলিফা নেতৃত্বের ট্রায়াল নিয়ে আসার ভয়ে খালিভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যতক্ষণ না তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাজি হতে বাধ্য করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৭২৮ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

এটা দেখায় যে, কোন মুসলমানের ঈমান নিরাপদ থাকে না যদি তারা এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ ও খ্যাতির জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, ঠিক যেমনটি খুব কমই কোনো ভেড়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লালসার কুফলের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন

ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহিহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা কামনা করে, তাকে নিজেরাই এটি মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এ দুটি জিনিস যা তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমানকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ভালো জিনিসে আনুগত্য করা

তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মদিনার জনগণকে প্রকাশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং তাঁকে ইসলামের পরবর্তী খলিফা হিসাবে উমর ইবনে খাত্তাবকে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন। তারা সবাই ঘোষণা করলেন যে তারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা শুনবে এবং মান্য করবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৭২৮ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একটি বর্ণনা অনুসারে, উমর ইবনে খাত্তাব নামকরণের আগে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি যাকে বেছে নিয়েছেন তাতে তারা সন্তুষ্ট হবে কিনা। আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, দাঁড়িয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু না হলে তারা খুশি হবে না। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, ৭১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা । এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

নিয়তিকে গ্রহণ করা

তার অন্তিম অসুস্থতার সময়, লোকেরা আবু বক্কর (রাঃ)-এর সাথে দেখা করতে গিয়েছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল যে তিনি একজন ডাক্তারকে ডেকেছেন কিনা। তিনি উত্তর দিলেন যে ডাক্তার ইতিমধ্যে তাকে দেখেছেন এবং বলেছেন, "আমি যা চাই তাই করি।" ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 53 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু মহান আল্লাহকে উল্লেখ করছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর হুকুম এবং পছন্দের সাথে সন্তুষ্টি গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর সমস্ত আদেশ জড়িতদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তাদের পিছনে প্রজ্ঞা লুকিয়ে থাকে।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ জিনিস বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যা তাদের ভাগ্যের সাথে ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করতে এবং এর ফলে আসা অসুবিধার সাথে সাহায্য করতে পারে। একজন ব্যক্তি আনন্দের সাথে একটি তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করেন যা তাদের ডাক্তার তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং পছন্দের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে এই বিশ্বাস করে যে তাদের ডাক্তার জানেন যে তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল কি। এটি সত্য যদিও তারা শুধুমাত্র মানুষ এবং ত্রুটি প্রবণ। তথাপি, অনেক মুসলিম মহান আল্লাহর উপর এই একই স্তরের আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়, যদিও তাঁর জ্ঞান অসীম এবং তাঁর পছন্দগুলি সর্বদা সবচেয়ে জ্ঞানী। মুসলমানদের উচিত নিয়তিকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করা এবং এটি যে সমস্যা নিয়ে আসে ঠিক সেভাবে তারা অভিযোগ না করে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো। তাদের বোঝা উচিত যে তারা যে সমস্যা এবং অসুবিধার মুখোমুখি হয় তা তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হয় যদিও তারা তাদের মধ্যে থাকা জ্ঞানগুলি বুঝতে বা পর্যবেক্ষণ না করে ঠিক যেমন তারা আনন্দের

সাথে গ্রহণ করা তিক্ত ওষুধের পিছনে বিজ্ঞান বুঝতে পারে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা যে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে তার পিছনের বিজ্ঞানটি তারা কখনই বুঝতে পারে না, একটি সময় অবশ্যই আসবে, ইহকাল হোক বা পরকালে, যখন তারা যে তিক্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তার পিছনের জ্ঞান তাদের কাছে প্রকাশিত হবে। তাই একজন মুসলিমের উচিত এই সময়টা ধৈর্য সহকারে জেনে রাখা যে শীঘ্রই সব প্রকাশ পাবে। এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা অসুবিধা মোকাবেলা করার সময় একজনের ধৈর্য বাড়াতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

বিচারের বাইরে

তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, আবু বক্কর তাঁর কন্যা আয়েশা রা.-কে বলেছিলেন, তাঁর খিলাফতকালে সরকারী কোষাগার থেকে যে কয়েকটি জিনিস তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তা উমর ইবনে খাত্তাব রা.-কে ফিরিয়ে দিতে। তারা ছিল একটি উট যার দুধ সে এবং তার পরিবার পান করত, একটি বাটি যাতে তারা খাবার তৈরি করত এবং কিছু কাপড় তারা পরত। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা পৃষ্ঠা ৬৬-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি মুসলমানদের নেতৃত্বে ব্যস্ত থাকায় এই জিনিসগুলি তাঁর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। তার পরিবারকে তার কাছ থেকে উত্তরাধিকারী হওয়ার অনুমতি না দিয়ে তিনি সেগুলোকে পরবর্তী খলিফার কাছে ফিরিয়ে দেন।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময় ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল

নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা । ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। [1] *তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও..."*

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের

অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

সর্বোত্তম আচরণ

তার চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, আবু বক্কর তার কন্যা আয়েশা রা.-কে বলেছিলেন, পবিত্র কুরআন অনুযায়ী তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তার নগণ্য সম্পদ বন্টন করতে এবং তার অনাগত সন্তানকে অন্তর্ভুক্ত করতে, কারণ তার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন। তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে অনাগত শিশুটি একটি মেয়ে এবং তার মৃত্যুর পরে তার জন্ম হয়েছিল। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, ৭১-৭২ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ইঙ্গিত দেয় যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর আত্মীয়দের সাথে সদয় ও ন্যায়বিচারের ব্যাপারে কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন। ইসলামের একটি শাখা যা প্রায়ই মুসলমানদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়।

জামে আত তিরমিযী, 2612 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি যে আচার-আচরণে সর্বোত্তম এবং তাদের পরিবারের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ তাদের নিজের পরিবারের সাথে খারাপ ব্যবহার করার সময় অ-আত্মীয়দের সাথে সদয় আচরণ করার খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করেছে। তারা এইভাবে আচরণ করে কারণ তারা নিজের পরিবারের সাথে সদয় আচরণ করার গুরুত্ব বোঝে না এবং তারা তাদের পরিবারের প্রশংসা করতে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমান কখনই সফলতা অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা ঈমানের উভয় দিক পূর্ণ করে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য

পালন করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা । দ্বিতীয়টি হল মানুষের অধিকার পূরণ করা যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। নিজের পরিবারের চেয়ে এই ধরনের আচরণের অধিকার আর কারো নেই। একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের পরিবারকে এমন সব বিষয়ে সাহায্য করতে হবে যা ভালো এবং খারাপ জিনিস ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভদ্রভাবে সতর্ক করতে হবে। তাদের খারাপ কাজে তাদের অন্ধভাবে সমর্থন করা উচিত নয় কারণ তারা তাদের আত্মীয় এবং তাদের প্রতি কিছু খারাপ অনুভূতির কারণে তাদের ভাল বিষয়ে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয় কারণ এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদের পথ দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হল একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে, কারণ এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং কেবল মৌখিক নির্দেশনার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

পরিশেষে, একজনকে সাধারণত সব বিষয়ে নম্রতা বেছে নেওয়া উচিত, বিশেষ করে, যখন তাদের পরিবারের সাথে আচরণ করা হয়। এমনকি যদি তারা পাপ করেও তবে তাদের সতর্ক করা উচিত নম্রভাবে এবং তারপরও তাদের সাহায্য করা উচিত যেগুলি ভাল বিষয়গুলিতে সাহায্য করা উচিত কারণ এই দয়া তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার চেয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি

তার চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, আয়েশা, তার পিতা আবু বক্করকে একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। কিন্তু তিনি তার মনোযোগ মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি নির্দেশ করেছিলেন: অধ্যায় 50 ক্বাফ, আয়াত 19:

" এবং মৃত্যুর নেশা সত্য নিয়ে আসবে; সেটাই আপনি এড়াতে চেয়েছিলেন।"

ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৭৩২-৭৩৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আবু বক্কর (রাঃ) তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন এবং অন্যদের দ্বারা, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির গুরুত্ব।

মৃত্যু এমন একটি বিষয় যা ঘটবে নিশ্চিত কিন্তু সময়টি অজানা তাই এটি বোঝা যায় যে একজন মুসলিম যে পরকালে বিশ্বাস করে সে তার জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয় যা ঘটতে পারে না, যেমন বিয়ে, সন্তান বা তাদের অবসর গ্রহণ। এটা আশ্চর্যজনক যে কত মুসলমান বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে যদিও তারা সাক্ষ্য দেয় যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং অনিশ্চিত অথচ আখেরাত চিরস্থায়ী এবং তাদের পৌঁছানো নিশ্চিত। কেউ যেভাবে আচরণ করুক না কেন তাদের কাজের ব্যাপারে তাদের বিচার করা হবে। একজন

মুসলমানকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে তারা ভবিষ্যতে পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে পারে এবং করবে কারণ এই মনোভাব তাদের মৃত্যু ঘটতে না হওয়া পর্যন্ত তাদের আরও বিলম্বিত করে এবং তারা অনুশোচনা নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় যা তাদের সাহায্য করবে না।

তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই নয় যে মানুষ মারা যাবে কারণ এটি অনিবার্য, তবে মূল বিষয় হল এমনভাবে কাজ করা যাতে কেউ এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে। এর জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার একমাত্র উপায় হল ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ ঘটতে না পারে এমন জিনিসগুলির জন্য প্রস্তুতির চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয়।

এগিয়ে পাঠানো ভাল

তার চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তার পরিবারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি তার পরা জামাকাপড় ধুয়ে ফেলবেন এবং তাকে কাফন হিসাবে একটি নতুন পোশাক কেনার পরিবর্তে সেগুলি দিয়ে দেবেন। যখন তাকে তার জন্য একটি নতুন কাফন কেনার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে মৃতের চেয়ে জীবিতরা নতুন পোশাকের বেশি যোগ্য। যদিও আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম জাতির খলিফা ছিলেন, তবুও তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতোই একটি সরল জীবন, দারিদ্র্যের জীবনযাপন বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তার নিজের প্রয়োজনের চিন্তা করার জন্য মানুষের উপকার করার চেষ্টা করতে ব্যস্ত ছিলেন। নিজের স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে তিনি তার জনগণের জীবনকে আরামদায়ক করার লক্ষ্য নিয়েছিলেন। খলিফা হিসাবে তিনি তার দুই বছরে কোষাগার থেকে যে সামান্য বেতন নিয়েছিলেন তাও সরকারী কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়েছিল যাতে তিনি নিশ্চিত করেন যে তিনি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুসলমানদের সেবা করেছেন। তিনি এই দুনিয়া থেকে কিছুই নেননি এবং দুনিয়া তাঁর কাছ থেকে কিছুই নেয়নি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৭৩৪-৭৩৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আবু বক্কর (রাঃ) তাঁর আখেরাতের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুতির দিকে আরও মনোনিবেশ করেছিলেন, তারপর এই দুনিয়ার বিলাসিতা সঞ্চয়, মজুদ এবং উপভোগ করার জন্য। এই বরকতময় মনোভাব থেকে আজকের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মুসলমানরা কত দূরে!

সহীহ বুখারী, 6514 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে দুটি জিনিস মৃতকে তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল একটি জিনিস তাদের কাছে থাকে। যে দুটি জিনিস তাদের পরিত্যাগ করে তা হল তাদের পরিবার ও সম্পদ এবং তাদের কাছে অবশিষ্ট থাকে তা হল তাদের আমল।

ইতিহাস জুড়ে লোকেরা সর্বদা তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেছে সম্পদ এবং একটি সুখী পরিবার অর্জনের জন্য। যদিও ইসলাম এই জিনিসগুলিকে নিষিদ্ধ করে না কারণ এগুলোর প্রয়োজন হতে পারে একজনের দায়িত্ব পালনের জন্য, উদাহরণস্বরূপ, একজনের নির্ভরশীলদের সমর্থন করার জন্য সম্পদের প্রয়োজন। ইসলাম শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে তাদের প্রয়োজনের বাইরে তাদের জন্য সংগ্রাম করতে নিরুৎসাহিত করে এবং সৎকর্ম সম্পাদনের মতো আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের উপর তাদের অগ্রাধিকার দেয়।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং এমন একটি পরিবার পেতে হবে যা তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে। এইভাবে ব্যবহার করা হলে এগুলি উভয়ই ভাল কাজ বলে বিবেচিত হয়। এটি সহীহ বুখারী, 6373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি এমন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিহ্ন যিনি সেই জিনিসটিকে অগ্রাধিকার দেন যা তাদের প্রয়োজনের মুহুর্তে সহ্য করবে এবং সমর্থন করবে যথা, সৎ কাজ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদের সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে আল্লাহর হুকুম পালনে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যস্ত রাখতে দেয় তাকে পবিত্র কুরআনে ক্ষতিগ্রস্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 9:

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ না করে। আর যে এটা করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।”

কেউ কেউ ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, কারণ তিনি তাদের প্রচুর সম্পদ এবং পরিবার দান করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ ঘোষণা করে তাদের বিভ্রান্তি দূর করে দেন যে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই তার প্রিয় ও নিকটবর্তী। অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 37:

"এবং আপনার সম্পদ বা আপনার সন্তান-সন্ততি আপনাকে অবস্থানে আমাদের নিকটবর্তী করে না, বরং এটি এমন একজন ব্যক্তি যে বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে..."

পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন যে, তাদের ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন আখেরাতে তাদের কোনো উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না তারা সুস্থ চিত্তে পরকালে পৌঁছায়। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

সুস্থ হৃদয়ের সংজ্ঞাটি সহজভাবে বলতে গেলে কেউ তা অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর

নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি না হয়। তাকে।

একজনের সম্পদ কেবলমাত্র তাদের পরকালে উপকার করতে পারে যদি তারা এটিকে চলমান দাতব্য প্রকল্পে ব্যয় করে তাদের আগে পাঠায়। জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একই হাদিস মানবজাতিকে জানায় যে একজন নেক সন্তান তাদের মৃত পিতা-মাতার মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করলেও কবুল হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই দিন এবং যুগে অনেক শিশু তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করার জন্য তাদের উত্তরাধিকার খুঁজতে ব্যস্ত।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ধার্মিক সন্তানকে লালন-পালন করা যে তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করে তা অর্জন করা সম্ভব নয় যদি পিতামাতারা তাদের জীবনে সৎ কাজ না করেন। দ্বিতীয়ত, এটা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবীগণের পথ নয়, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, সৎকাজ করা থেকে বিরত থাকুন এবং আশা করি অন্যরা এ থেকে সরে যাওয়ার পর তাদের জন্য দোয়া করবেন। বিশ্ব একজনকে জীবিত অবস্থায় সৎকাজের জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং তারপর আশা করা উচিত যে তারা মারা যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে শুধুমাত্র একজন যে সম্পদ পাঠাবে তা তাদের উপকার করবে। এটি তাদের সন্তানদের শিক্ষার মতো একজনের দায়িত্ব পালনে ব্যয় করে অর্জন করা যেতে পারে। ভুলভাবে ব্যয় করা সমস্ত সম্পদ মালিকের জন্য বোঝা হয়ে উঠবে এবং তাদের শাস্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। যারা লোভের বশবর্তী হয়ে ফরজ সদকা থেকে বিরত থাকে তাদের ভয়ানক শাস্তির

ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এই গুরুতর পাপ করবে বিচারের দিন তার সাথে একটি বিশাল বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা তাদের চারপাশে আবৃত করবে এবং অবিরাম দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

“আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

সুনানে আবু দাউদ, 1658 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, বিচারের দিন কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সোনা ও রৌপ্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং যদি তারা বাধ্যতামূলক সদকা করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের শরীরে দাগ দেওয়া হবে। এটার উপর বকেয়া

মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ অন্যদের ভোগ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে যখন মৃত ব্যক্তি তা সংগ্রহ করার জন্য দায়ী থাকবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি কোন ব্যক্তি জেনেশুনে এমন কোন ব্যক্তির কাছে সম্পদ ছেড়ে দেয় যে এটি অধিকার করার উপযুক্ত নয় এবং এভাবে তার অপব্যবহার করে তাহলে মৃত ব্যক্তিও এর জন্য দায়ী হতে পারে। বিপরীতে, যদি কেউ সঠিকভাবে ব্যয়কারী ব্যক্তির কাছে সম্পদ রেখে যায় তবে মৃত ব্যক্তিকে বিচারের দিন অনেক অনুশোচনা করতে হবে যখন তারা সঠিকভাবে ব্যয়কারীকে দেওয়া মহাপুরস্কার দেখবে।

সহীহ মুসলিমের ৭৪২০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, বাস্তবে একজন ব্যক্তি তার সম্পদ শুধুমাত্র তিনটি উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। প্রথমটি হল সম্পদ যা তাদের খাদ্যের জন্য ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয়টি হল তাদের পোশাকের জন্য ব্যয় করা সম্পদ এবং শেষ সম্পদ হল যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করে। অন্যান্য সমস্ত সম্পদ অন্য লোকেদের ভোগ করার জন্য রেখে দেওয়া হয় যখন মৃত ব্যক্তিকে তা সংগ্রহ করার জন্য দায়ী করা হয়।

মজুদ করা এবং ভুলভাবে সম্পদ ব্যয় করা একজনকে বস্তুগত জগতকে ভালবাসতে এবং পরকালকে অপছন্দ করতে অনুপ্রাণিত করে কারণ তারা তাদের প্রিয় সম্পদকে পিছনে ফেলে যেতে অপছন্দ করে, যা তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে। যে আখেরাতকে অপছন্দ করে সে তার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে না।

উপরন্তু, কেউ যদি সত্যিকারের তাকওয়া অবলম্বন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর..."

প্রকৃতপক্ষে, সম্পদ একটি অদ্ভুত সঙ্গী কারণ এটি কেবল তখনই কাউকে উপকৃত করে যখন এটি তাদের অর্থ ছেড়ে দেয়, যখন এটি সঠিক উপায়ে ব্যয় করা হয়।

একজন ব্যক্তি যদি কোনো বিধান ছাড়াই দীর্ঘ ভ্রমণে যান তাহলে তাকে বোকা হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি তাদের আখেরাতের দীর্ঘ সফরের জন্য তাদের ধন-সম্পদ আগে থেকে পাঠায় না সেও মূর্খ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে একজন মানুষ মৃত্যুর সময় সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করে যখন তারা বুঝতে পারে যে তারা তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ পিছনে ফেলে খালি হাতে পরকালের দিকে যাত্রা করছে। একজন মুসলমানের উচিত যে কোনো মূল্যে এই পরিণতি এড়ানো।

সৎ কাজ করাই একমাত্র উপায় যা একজনের কবরের জন্য প্রস্তুত করা হয় কারণ সেখানে আর কোন সান্ত্বনা পাওয়া যাবে না। এটা আসলে পরকালে একজনের চিরস্থায়ী আবাস প্রস্তুত করার মাধ্যম। অতএব, এই প্রস্তুতিকে সাময়িক বস্তুগত জগতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তার দুটি ঘর থাকে এবং বাড়ির সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে যেটিতে তারা কম সময় ব্যয় করবে। একইভাবে, যদি একজন মুসলিম এই পৃথিবীতে তাদের অস্থায়ী বাড়িকে সুন্দর করার জন্য আরও বেশি সময় এবং প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে। পরকালের চিরস্থায়ী বাসস্থান তারাও নিছক নির্বোধ। এটা কারো কারো মনোভাব যদিও তারা স্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান সংক্ষিপ্ত এবং একটি অজানা দৈর্ঘ্যের জন্য যেখানে তাদের আখেরাতে থাকবে চিরস্থায়ী।

এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাসের নিশ্চিততার অভাবকে নির্দেশ করে এবং তাই যে কেউ এই মানসিকতাকে ভাগ করে তার জন্য ইসলামের জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা অত্যাবশ্যকীয় যাতে তারা আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ ছাড়াই তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের সাথে তাদের কবরের জন্য প্রস্তুত করে, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে সে পাবে যে তাদের ভাল কাজগুলি তাদের জন্য স্বস্তি দেয় যেখানে তাদের পুঞ্জীভূত গুনাহগুলি কেবল তাদেরই হবে। অন্ধকার কবরে তাদের অবস্থান আরও খারাপ। তাই একজন মুসলিমের উচিত দুর্বলতার সময় আসার আগেই তাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নেক আমল করা। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত মূল হাদীসে নির্দেশিত বাস্তবতাকে চিনতে হবে এবং এমন সময়ে পৌঁছানোর আগেই তাদের সম্পদের সাথে সঠিকভাবে কাজ করা উচিত যখন তাদের সৎকাজ করার জন্য আরও সময় দেওয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

“আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" কিন্তু আল্লাহ কখনই কোন আত্মাকে বিলম্ব করবেন না যখন তার সময় এসে যাবে..."

তাদের এখনই তাদের কাজের প্রতি চিন্তা করা উচিত যাতে তারা আন্তরিকভাবে পাপ থেকে অনুতপ্ত হতে পারে এবং এমন একটি দিন আসার আগে সৎ কাজ

করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে পারে যখন চিন্তা করা তাদের উপকারে আসবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সেই দিন, মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, কী উপকার হবে] স্মরণ হবে?"

প্রত্যেকে তাদের আগে যারা মারা গেছে এবং তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আরও সৎ কাজ করতে তাদের অক্ষমতা নিয়ে চিন্তা করা যাক। এই সময় আসার আগে তাড়াতাড়ি করুন এবং অনিবার্য জন্য প্রস্তুত করুন। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 99:

"আর তোমার প্রভুর ইবাদত কর যতক্ষণ না তোমার কাছে নিশ্চিত মৃত্যু আসে।"

একটি চূড়ান্ত পরামর্শ

তার চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, আবু বক্কর উমর ইবনে খাত্তাবকে ডেকে পাঠান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে কিছু চূড়ান্ত পরামর্শ দেন, যা ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 59 নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সর্বাবস্থায় সর্বপ্রথম মহান আল্লাহকে ভয় করার পরামর্শ দেন।

মহান আল্লাহকে ভয় করা, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা ছাড়া অর্জন করা যায় না যাতে কেউ মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যা ক্ষতিকর।

অতএব, তাকওয়ার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক নয় শুধু হারাম। এর কারণ হল সন্দেহজনক জিনিস একজন মুসলিমকে হারামের এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যায় এবং যেটি হারামের কাছাকাছি যায় তার মধ্যে পড়া তত সহজ হয়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করবে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে। সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে এমনটি ঘটেনি ধীরে ধীরে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অনর্থক এবং অনর্থক কথাবার্তা যা ইসলামের দ্বারা পাপী শ্রেণীভুক্ত নয়, তা প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত, মিথ্যা এবং অপবাদ। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথা না বলে প্রথম ধাপ এড়িয়ে চলে তাহলে সে নিঃসন্দেহে মন্দ কথা পরিহার করবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা এমন বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করেছেন যা দিনে করতে হবে, যা রাতে সম্পন্ন হলে তিনি তা গ্রহণ করবেন না। এবং তিনি এমন বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করেছিলেন যা অবশ্যই রাতে করা উচিত, যা দিনে করা হলে তিনি তা গ্রহণ করবেন না। আর তিনি স্বেচ্ছাকৃত কাজ কবুল করেন না যতক্ষণ না ফরয কাজগুলো আগে করা হয়।

এই উপদেশটি ইসলামের শিক্ষাগুলো মেনে চলার এবং নিজের জীবনের গতিপথ এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলিম তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার এই দুটি সূত্রের ভিত্তি নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে এই দুটি দিকনির্দেশনার উত্স শিখতে এবং কাজ করতে মুসলিমদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই দুটি পথ নির্দেশনা শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে এবং শুধুমাত্র তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকাজের উপর কাজ করতে হবে যদি তাদের সময় ও শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে বিচার দিবসে একজন ব্যক্তির পাল্লা তাদের পক্ষে ভারী হবে যখন তারা এই পৃথিবীতে সত্য অনুসরণ করবে, যদিও এটি করা তাদের পক্ষে ভারী ছিল। এবং একজন ব্যক্তির বিচারের স্কেল তাদের পক্ষে হালকা হবে যখন তারা এই পৃথিবীতে মিথ্যার অনুসরণ করবে।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। অধিকাংশ মৌখিক পাপ সংঘটিত হয় কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ

তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

আবু বক্কর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তাকেও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে একজন বান্দাকে অবশ্যই ভয় এবং আশার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে: জাহান্নামের ভয় এবং জান্নাত লাভের আশা। বান্দার তাদের ভক্তিকে মূল্যবান মনে করা উচিত নয় এবং মহান আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ ঐশী হাদীসে, মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি তাঁর বান্দাদের তাঁর উপলব্ধি অনুসারে কাজ করেন এবং আচরণ করেন। এর অর্থ হল যদি একজন মুসলমানের ভাল চিন্তা থাকে এবং মহান আল্লাহর কাছে ভাল আশা করে, তবে তিনি তাদের নিরাশ করবেন না। একইভাবে, কেউ যদি মহান আল্লাহ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে, যেমন বিশ্বাস করা যে তাকে ক্ষমা করা হবে না, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, যা এই হাদিসটি নির্দেশ করে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষমা করার প্রত্যাশা করে। এটা সত্য আশা নয় এটা নিছক ইচ্ছাপূরণ চিন্তা। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি কোনো বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হন, তাদের ফসলে জল দিতে ব্যর্থ হন এবং এখনও একটি বড় ফসল কাটার আশা করেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে এবং যখনই তারা পিছলে যায় তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করে। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি বীজ রোপণ করেন, তাদের ফসলে জল দেন, ফসলকে সুস্থ রাখার জন্য প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেন এবং তারপরে একটি বড় ফসলের আশা করেন। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাখ্যাটি সংক্ষিপ্ত করেছেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের জীবনে মহান আল্লাহকে আরও বেশি ভয় করা, কারণ এটি এমন পাপগুলিকে বাধা দেয় যা আশার চেয়ে উচ্চতর যা একজনকে সৎ কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী ধরনের। কিন্তু অসুস্থতা ও অসুবিধার সময় এবং বিশেষ করে মৃত্যুর সময় একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়া আর কিছুই থাকা উচিত নয়, এমনকি যদি তারা তাদের জীবন তাঁর অবাধ্য হয়ে অতিবাহিত করে থাকে, যেমনটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) দ্বারা বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমের ২৮৭৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় শান্তি ও বরকত।

চূড়ান্ত শব্দ

মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পাশে সমাধিস্থ করার অনুরোধ করার পর, তাঁর শেষ কথাটি ছিল পবিত্র কুরআন থেকে একটি প্রার্থনা, যা আবারও মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাঁর মহান সংযুক্তির কথা তুলে ধরে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 101:

"...আমাকে মুসলমানের মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে যুক্ত করো।"

অতঃপর তিনি ৬৩ বছর বয়সে এই জড়জগত থেকে বিদায় নেন, একই বয়সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৭৩৫-৭৩৮ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক মুসলমান খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে, তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যান্য নবী-রাসূলগণ, তাঁদের এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি উদ্ধৃত করে, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি পরকালে তাদের সাথে থাকবে যাদের তারা ভালবাসে। আর এর কারণে তারা মহান আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে তারা এই ফলাফল কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসার দাবি করে, তবুও তারা তাকে খুব কমই চেনে কারণ তারা তাঁর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করতে

ব্যস্ত। এটা বোকামি যে কিভাবে একজন সত্যিকারের ভালোবাসতে পারে যাকে তারা জানে না?

উপরন্তু, যখন এই লোকদের কাছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের ভালবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, হাশরের দিনে তারা কি বলবে? তারা কি উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ হচ্ছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন, চরিত্র ও শিক্ষার উপর অধ্যয়ন ও আমল করা। এই প্রমাণ ছাড়া একটি ঘোষণা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। এটা খুবই সুস্পষ্ট কারণ সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে ভালো ইসলামকে কেউ বুঝতে পারেনি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেন। এই কারণেই তারা পরকালে তার সাথে থাকবে।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালবাসা হৃদয়ে রয়েছে এবং এটিকে কাজের মাধ্যমে দেখানোর প্রয়োজন হয় না তারা সেই ছাত্রের মতো বোকা যে ছাত্রটি তাদের শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে জ্ঞান তাদের মনে রয়েছে তাই তাদের কার্যত লিখতে হবে না। কাগজে নিচে এবং তারপর এখনও পাস করার আশা.

যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, সে মহান আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

পরিশেষে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালবাসা দাবি করে, তাদের উপর শান্তি। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা অবশ্যই বিচারের দিন তাদের সাথে থাকবে না। এক মুহুর্তের জন্য যদি কেউ এই সত্যটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

একটি সত্যবাদী প্রশংসা

হযরত আবু বক্কর (রাঃ) এর ইন্তেকালের পর, মদিনা শোকে ডুবে গিয়েছিল, যেমনটি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর সময় দুঃখের সম্মুখীন হয়েছিল। আলী ইবনে আবু তালিব আবু বক্করের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং নিম্নলিখিত প্রশংসা করেন: "হে আবু বকর, আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হন। আপনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গী এবং বন্ধু ছিলেন। আপনি তার জন্য একটি সান্ত্বনা ছিলেন এবং যাকে তিনি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিলেন। যদি তার কোন গোপন কথা থাকত, তবে সে তা তোমাকে বলত; এবং যদি তার কোন বিষয়ে কারো সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন হয় তবে সে আপনার সাথে পরামর্শ করবে। আপনি আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আপনি তাদের মধ্যে ঈমানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আন্তরিক ছিলেন। আপনার ঈমান অন্য যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে শক্তিশালী ছিল, যেমন আপনি মহান আল্লাহকে ভয় করতেন। আর আপনি দ্বীনি জ্ঞানে অন্য সবার চেয়ে বেশি সম্পদশালী ছিলেন। আপনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলাম উভয়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি যত্নবান ছিলেন। সকল মানুষের মধ্যে আপনি ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠ সাহাবী; আপনি সর্বোত্তম গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন; আপনার সেরা অতীত ছিল; আপনি সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছেন; এবং আপনি তার সবচেয়ে কাছের ছিলেন। এবং সমস্ত লোকের মধ্যে আপনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন, তাঁর দিকনির্দেশনা ও আচরণের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি। আপনার পদমর্যাদা অন্য সবার চেয়ে উচ্চতর ছিল এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সম্মান করতেন এবং আপনাকে অন্য সবার চেয়ে উচ্চ মর্যাদায় রাখতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং ইসলামের পক্ষ থেকে, আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। লোকেরা যখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করেছিল, তখন তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলে। সারা জীবন তুমিই ছিলে

তার চোখ যা দিয়ে সে দেখেছে আর কান দিয়ে শুনেছে। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে আপনাকে সত্যবাদী নাম দিয়েছেন যখন তিনি বলেছেন:

"এবং যিনি সত্য নিয়ে এসেছেন [হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং [যারা] তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন [আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু] - তারাই সৎকর্মশীল।" অধ্যায় 39 আজ যুমার, আয়াত 33।

মানুষ যখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের সমর্থনে কৃপণ ছিল, তখন আপনি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। এবং যখন লোকেরা স্থির হয়ে বসেছিল, তখন আপনি তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি যে কষ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন। কঠিন সময়ে, আপনি সত্যিই তার একজন ভাল এবং মহৎ সঙ্গী ছিলেন। তুমি দুজনের মধ্যে দ্বিতীয়, গুহায় তার সঙ্গী; এবং যার উপর প্রশান্তি নেমে এসেছে:

“যদি আপনি তাকে [নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] সাহায্য না করেন - আল্লাহ ইতিমধ্যেই তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে [মক্কা থেকে] দু জনের একজন হিসাবে বের করে দিয়েছিল, যখন তারা গুহায় ছিল এবং সে [মক্কা থেকে] নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সঙ্গী [আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু]কে বললেন, "দুঃখ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" এবং আল্লাহ তার উপর তার প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং তাকে সৈন্যদের দ্বারা সমর্থন করেছেন [অর্থাৎ, ফেরেশতাদের] যাদের আপনি দেখেননি..." তওবাহের অধ্যায় 9, আয়াত 40।

আপনি হিজরতের সময় (মদিনায়) তাঁর সঙ্গী ছিলেন এবং মহান আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর জাতির ব্যাপারে তাঁর উত্তরসূরি ছিলেন। এবং আপনি সত্যই একজন উত্তম উত্তরসূরি প্রমাণিত হয়েছিলেন যখন লোকেরা ধর্মত্যাগ করেছিল। আপনি যা করেছেন তা আপনার পূর্বে অন্য কোন নবী (সাঃ) এর খলিফা করেননি। আপনি দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে দাঁড়ালেন যখন তাঁর অন্যান্য সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাদের সংকল্প হারিয়েছিলেন এবং নরম হয়েছিলেন। আর যখন তারা দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন আপনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতিনীতি মেনে চললেন । আপনি সত্যই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আপনার শরীরে দুর্বল, কিন্তু মহান আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে শক্তিশালী; নিজের মধ্যে নম্র, কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে আপনার মর্যাদা উচ্চতর; মানুষের চোখে সম্মানিত, তাদের অন্তরে সম্মানিত এবং মহান। তাদের একজনেরও আপনাকে অপছন্দ করার, আপনাকে সন্দেহ করার বা আপনাকে অবজ্ঞা করার কোনো কারণ ছিল না। আপনি সর্বদা দুর্বল এবং নম্রদেরকে শক্তিশালী এবং সম্মানজনক হিসাবে বিবেচনা করেছেন, নিশ্চিত করেছেন যে আপনি তাদের যা সঠিকভাবে তাদের দিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে আপনি আত্মীয়-স্বজন ও অপরিচিতদের সাথে সমান আচরণ করতেন। সমস্ত মানুষের মধ্যে, আপনি তাদেরকে সম্মান করতেন যারা মহান আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি আনুগত্য করতেন এবং যারা তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। আপনার সামগ্রিক চরিত্রে, আপনি সত্য এবং সহানুভূতি মূর্ত করেছেন। আপনার বক্তৃতা সর্বদা প্রজ্ঞা এবং সিদ্ধান্তের গুণাবলী দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। এবং আপনি সর্বদা ভদ্রতা এবং দৃঢ়তার মধ্যে একটি মহৎ ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। আপনি সর্বদা জ্ঞানের উপর আপনার সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে এবং একবার আপনি আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে, আপনি সর্বদা সেগুলি কার্যকর করার জন্য দৃঢ় সংকল্প রেখেছিলেন। নিঃসন্দেহে আমরা মহান আল্লাহর কাছে এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। আমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁর আদেশের কাছে নতি স্বীকার করি। আর মহান আল্লাহর কসম, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকাল ব্যতীত, মুসলমানরা আপনার মৃত্যুর বিপর্যয়ের চেয়ে বড় বিপদে আর কখনও পড়েনি। আপনি সর্বদা এই ধর্মের রক্ষাকর্তা, একটি অভয়ারণ্য এবং সম্মানের উত্স ছিলেন। মহান আল্লাহ আপনাকে তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যে যোগদান করুন এবং তিনি যেন আমাদেরকে আপনার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত না

করেন এবং আপনার পরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করেন।” তাঁর প্রশংসা শুনে লোকেরা সাড়া দিয়ে ঘোষণা করে যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্য বলেছেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৭৩৬-৭৩৮ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বরকতময় জীবন অধ্যয়ন করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, তিনি তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি কার্যত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে মেনে চলা এবং অনুসরণ করে তার মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি তার ইচ্ছার উপযোগী আদেশ বাছাই করেননি, বরং তিনি মহান আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহর প্রতিটি আদেশকে আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত ছিলেন। তাঁর একক লক্ষ্য ছিল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর সমস্ত কথা ও কাজ এই মহৎ লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এই মনোভাব তাকে আধ্যাত্মিকভাবে জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে উৎসাহিত করেছিল, যার মধ্যে রয়েছে নিজের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এবং তিনি আধ্যাত্মিকভাবে পরকালের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এর জন্য কার্যত প্রস্তুতির জন্য তার প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে। এই বৈশিষ্ট্যই তাকে এবং অন্যান্য সাহাবীগণকে, মহানবী (সা.)-এর পর সর্বোত্তম দলে পরিণত করেছিল। এই সত্যটি ইমাম আবু নাঈম আল-আসফাহানীর, হিলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাত আল আসফিয়া, বর্ণনা 278-এ আলোচনা করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। , তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক, যাতে তারাও উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করে।

উপরন্তু, তার জীবন অধ্যয়ন করলে, এটি স্পষ্ট যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে সহজে পৌঁছেনি।

সাহাবায়ে কেরামের রক্ত, অশ্রু, ঘাম এবং ত্যাগের মাধ্যমে তারা তাদের কাছে পৌঁছেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। দুর্ভাগ্যবশত, এই সত্যটি আজ প্রায়ই মুসলমানদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয় , কারণ ইসলামের শিক্ষাগুলি আজকাল এত সহজলভ্য। কেউ কল্পনা করতে পারেন যে আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, কতটা হতাশ হবেন যদি তিনি দেখতে পান যে কিভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা ইসলামের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ইসলাম পৌঁছে দিতে পারে। নিঃসন্দেহে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের ত্যাগের জন্য তাদের পুরস্কার পাবেন কিন্তু মুসলমানদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তারা তাদের কাছে ঋণী। এই স্বীকৃতি কেবল কথায় নয় কর্মে দেখাতে হবে। এর সাথে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে আন্তরিকভাবে শেখা ও আমল করা জড়িত। এটিই একমাত্র উপায় যা একজন সাহাবায়ে কেরামকে স্বীকৃতি, সম্মান এবং ভালবাসেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। কাজ ছাড়া কথা ভালোবাসার চেয়ে ভন্ডামীর কাছাকাছি।

পরিশেষে, প্রত্যেক মুসলমান খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে, তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যান্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি উদ্‌ধৃত করে, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি পরকালে তাদের সাথে থাকবে যাদের তারা ভালবাসে। আর এর কারণে তারা মহান আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে তারা এই ফলাফল কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি ভালবাসার দাবি করে, তবুও তারা তাদের জীবন অধ্যয়ন করতে খুব ব্যস্ত বলে তাদের খুব কমই চেনেন। , অক্ষর এবং শিক্ষা. কীভাবে একজন সত্যিকারের মানুষকে ভালবাসতে পারে যাকে তারা জানে না?

উপরন্তু, যখন এই লোকদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি তাদের ভালবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, তখন তারা বিচারের দিন কি বলবে? তারা কি উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ তাদের জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষার উপর অধ্যয়ন এবং অভিনয়। এই প্রমাণ ছাড়া একটি ঘোষণা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। এটা খুবই সুস্পষ্ট কারণ সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে ভালো ইসলামকে কেউ বুঝতে পারেনি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেন। এই কারণেই তারা পরকালে তার সাথে থাকবে।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালবাসা হৃদয়ে রয়েছে এবং এটিকে কাজের মাধ্যমে দেখানোর প্রয়োজন হয় না তারা সেই ছাত্রের মতো বোকা যে ছাত্রটি তাদের শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে জ্ঞান তাদের মনে রয়েছে তাই তাদের কার্যত লিখতে হবে না। কাগজে নিচে এবং তারপর এখনও পাস করার আশা.

যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, সে মহান আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

পরিশেষে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালবাসা দাবি করে, তাদের উপর শান্তি। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা অবশ্যই বিচারের দিন তাদের সাথে থাকবে না। এক মুহুর্তের জন্য যদি কেউ এই সত্যটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

সম্পূর্ণ অডিওবুক - নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীদের (রাঃ) জীবনী:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1Vizm7rRKaK5Vk9IdVBnpLLolh0dhYG

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
eBooks/AudioBooks-এর জন্য ব্যাকআপ সাইট:
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক: https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe